ভারতবর্ষ

মাঘ, ১৩৩১

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বাদশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

বিদ্যার গৌরব

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

(আধুনিক ও প্রাচীন)

বিদ্যালাভ জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। ইহা উপায় মাত্র। যিনি অর্থ সঞ্চয় করিতে চাহেন, তিনি অর্থনীতি-শাস্ত্র পাঠ করিয়া জানিতে পারেন, কি উপায়ে প্রভূত অর্থাগম হইতে পারে। যিনি পুণ্য সঞ্চয় করিতে চাহেন, তিনি বেদের কর্মকাণ্ড হইতে জানিতে পারিবেন, কি ভাবে যজ্ঞাদি করিলে পুণ্য সঞ্চয় হইবে। এই ভাবে সকল বিদ্যাই কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লাভের সহায়ক বলিয়াই প্রয়োজনীয়।

উপায়ের গৌরব উদ্দেশ্যের গৌরব অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। এজন্য কোন বিদ্যার গৌরব, সেই বিদ্যা যাহার সাধন, তাহার গৌরব অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। যেমন অর্থনীতিবিদ্যার গৌরব অর্থগৌরব অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। আবার সকল বিদ্যার গৌরব সমান নহে। যে বিদ্যার উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ, তাহা স্বভাবতঃই, যে বিদ্যার উদ্দেশ্য অর্থলাভ, তদপেক্ষা অধিক গৌরবের বিষয়। এই ভাবে উদ্দেশ্যের প্রভেদ অনুসারে বিদ্যার গৌরবের তারতম্য হইবে।

কথাগুলি সহজ। কিন্তু এ সকল কথা অনেক সময় সকলের মনে থাকে না। আজকাল বিদ্যার গৌরবের কথা প্রায়ই শোনা যায়,—যেন বিদ্যা মাত্রই আদরণীয়, যেন বিদ্যালাভই জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে—সকল বিদ্যার সমান আদর হওয়া উচিত নহে,—কোন বিদ্যার আদর বেশী হইবে, কোন বিদ্যার আদর কম হইবে। আবার অবস্থা বিশেষে কোন বিদ্যার আদর না করিয়া অনাদর করা উচিত। বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, কোন বিদ্যা লাভ করিয়া কিরূপ ফল হওয়া সম্ভব,

এবং কিরূপ ফল হইতেছে। বিদ্যা চর্চ্চা করিলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু জ্ঞানমাত্রই যে বাঞ্ছনীয় নহে, একটা দৃষ্টান্ত হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। যে ব্যক্তির আত্মসংযম নাই, তাহার পক্ষে সুরা প্রস্তুত করিবার প্রণালীর জ্ঞান বাঞ্ছনীয় নহে। আবার একটি জ্ঞান এক ব্যক্তির পক্ষে অশুভজনক হইলেও অপর ব্যক্তির পক্ষে শুভজনক হইতে পারে। যিনি চিকিৎসক,—অল্প মাত্রায় সুরা প্রয়োগ করিয়া ব্যাধি নিবারণ করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে সুরা প্রস্তুত করিবার জ্ঞান বা বিদ্যা শুভজনক হইবে। ইহাই বিদ্যার অধিকার-ভেদ। একই বিদ্যা অধিকার ভেদে কাহারও পক্ষে শুভ, কাহারও পক্ষে অশুভ হইতে পারে। অধিকারী বিশেষে শুভাশুভ বিদ্যার দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে। যেমন, চোরের পক্ষে, কোন্ গৃহস্থের ঘরে কত অর্থ সঞ্চিত আছে, কিরূপে এমন যন্ত্র নির্মাণ করা যায় যাহার দ্বারা দরজায় বা দেয়ালে নিঃশব্দে বৃহৎ ছিদ্র করা যায়, কিংবা লৌহ সিন্দুক ভাঙ্গিতে পারা যায়—এ সকল বিদ্যা অশুভজনক। বিলাসী এবং শক্তিশালী "সভ্য" জাতির পক্ষে, কোথায় কোন দুর্বল জাতি আছে, তাহাদের কি দোষ আছে যাহার ছল ধরিয়া তাহাদের দেশ অধিকার করা যায় এবং বাণিজ্য বিস্তার করিবার সুবিধা পাওয়া যায়,—এই সব বিদ্যা অশুভজনক। চক্রান্তী জমিদারের পক্ষে আইনের জ্ঞান অশুভজনক, যদি সেই আইন-জ্ঞানের সাহায্যে তিনি প্রজার স্বত্ব অন্যায় ভাবে দখল করেন।

মনে হইতে পারে যে, অশুভ বিদ্যার অশুভত্ব অতি সুস্পষ্ট,—দুষ্ট লোক ব্যতীত কেহ অশুভ বিদ্যার চর্চ্চা করিবে না; অতএব এ বিষয়ে সাবধান করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু স্থির ভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সকল অশুভ বিদ্যার অশুভত্ব সুস্পষ্ট নহে। স্বার্থপরতা, দীর্ঘকালের সংস্কার বা বিদ্যার আপাতরমণীয় নামের প্রভাবে অনেক সময় আমাদের বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়, তাহার ফলে অনেক সময় অশুভ বস্তুকে অশুভ বলিয়া বোধ হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আজকাল পাশ্চাত্য দেশসমূহে Patriotism বা স্বজাতিপ্রীতি অত্যন্ত আদরণীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু এই স্বজাতিপ্রীতি অনেক সময় পরজাতি বিদ্বেষে পরিণত এবং সেইরূপে অভিব্যক্ত হয়। Patriotism এই আপাতরমণীয় নামের প্রভাবে অনেকে ভুলিয়া যান যে, ইহা সংঘবদ্ধ স্বার্থপরতা মাত্র।(১) দল বদ্ধ স্বার্থপরতার একটা বিপদ আছে, যে বিপদ ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার মধ্যে নাই। কোন ব্যক্তি একা কোন স্বার্থপরতামূলক কার্য্যে লিপ্ত হইলে, সাধারণতঃ তাঁহার এরূপ ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকে না যে, তিনি অতি মহৎ কার্য্য করিতেছেন। কারণ, তাঁহার প্রতিবেশীগণ তাঁহার সম্বন্ধে যে মত পোষণ করিবে, তাহার দ্বারা, তাঁহার নিজের এরূপ ভ্রম হইলে, তাহা সংশোধিত হইবে। কিন্তু দেশের সকলে মিলিয়া যদি একটা স্বার্থপরতামূলক কার্য্যে রত হয়, তাহা হইলে সকলেই মনে করিতে পারে যে, তাহারা অতি মহৎ কার্য্য করিতেছে। এক্ষেত্রে কাহারও দ্বারা তাহাদের ভ্রম-সংশোধনের অবকাশ থাকে না। এই ভাবে সকলের পক্ষে আত্ম-প্রবঞ্চনা সম্ভবপর। তখন স্বজাতির স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং অন্য জাতির অনিষ্টসাধনের জন্য বিজ্ঞান (science), ভূগোল (geography), অর্থনীতি (political economy) এই সকল বিদ্যার অপব্যবহার হইতে পারে। তথাকথিত সভ্য জাতিরা দুর্বল জাতির মধ্যে আজকাল যে ভাবে বাণিজ্য বিস্তার করেন, তাহাতে এই সকল বিদ্যার অপব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন পণ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে এবং এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কলকারখানা, রেল, ষ্টীমার, মোটর প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। Banking, Exchange, Large scale production প্রভৃতির বিষয়ে অর্থনীতির বহু সিদ্ধান্ত এই বাণিজ্য-বিস্তার-ব্যাপারে আবশ্যক হয়। কিন্তু ইহার ফল কি হয়? দুর্বল জাতি প্রাচীন উপায়ে যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছিল, সভ্য জাতি

(১) টলষ্টয় বলিয়াছেন—I have several times expressed the thought that in our day the feeling of patriotism is an unnatural, irrational and harmful feeling and a cause of the great part of the ills from which mankind is suffering.

"আমি বহুবার বলিয়াছি যে আজকাল স্বজাতি-প্রীতি সম্বন্ধে সাধারণের মনোভাব অস্বাভাবিক, যুক্তিবিরুদ্ধ এবং অনিষ্ট-জনক। মনুষ্যজাতির অনেক দুঃখকষ্টের কারণ এই স্বজাতিপ্রীতি।"

তদপেক্ষা বহু সুলভে সেই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করেন। এ কারণে দুর্বল জাতির শিল্পিগণ যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করে, তাহা বিক্রীত হয় না,—জীবিকার অভাবে তাহারা নিরতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত হয়। অনেক স্থলে সভ্য জাতি তাহাদের পণ্য যে দরে বিক্রয় করে, তাহাতে নিজেদেরও লাভ থাকে না। তাহাদের উদ্দেশ্য থাকে যে, কিছু দিন যদি ক্ষতি সহ্য করিয়াও দুর্বল জাতির শিল্প নষ্ট করিতে পারা যায়, তাহা হইলে পরে বিদেশী দ্রব্য না হইলে যখন তাহাদের চলিবে না, তখন মূল্য বাড়াইয়া প্রচুর লাভ করিতে পারা যাইবে। ফলতঃ এইরূপে সভ্য জাতির বাণিজ্য বিস্তারে দুর্বল জাতির সমূহ ক্ষতি হয়। ইহাতে যে বিজ্ঞান এবং অর্থনীতি বিদ্যার প্রয়োগ হয়, তাহা অশুভজনক। সভ্য জাতির যে সকল ব্যক্তি এই সকল বিদ্যার চর্চ্চা করেন, তাঁহারা একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন যে, তাঁহারা জ্ঞানরাজ্যের সীমা বিস্তার করিতেছেন। দেশের লোকেও তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতে পারে, কিন্তু এই বিদ্যা চর্চ্চার ফলে জগতে অশান্তি এবং অসুখের মাত্রাই বেশী হয়।

আজকাল বিদ্যাবলে মানুষ রেল, ষ্টীমার, মোটর, এরোপ্লেন তৈয়ার করিয়াছে, ফটোগ্রাফ, বায়স্কোপ, গ্রামোফোন প্রভৃতি কত নূতন কল প্রস্তুত হইতেছে। সত্য। কিন্তু ইহাতে মানুষের হৃদয়ের উন্নতি হইয়াছে কতটুকু? উন্নতি বোধ হয় কিছুই হয় নাই; বরং অবনতি হইয়াছে। একটা বড় কুফল হইয়াছে—আজকাল সভ্যসমাজে লোকে টাকাকে খুব বড় করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে। কারণ, টাকা না হইলে এ সকল কিছুই হয় না; আর এ সকল না হইলে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ হয় না। অতএব টাকা চাই। ব্যয়বহুল বিলাসিতা সভ্যজীবনে এত বেশী পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে যে, ইহাতে যে কিছু অন্যায় থাকিতে পারে, অনেকের তাহা মনেই হয় না। মোট কথা আজকাল বিজ্ঞানের যেরূপ চর্চ্চা হইতেছে, তাহাতে সমাজে ভোগ-বিলাসের প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়াই মনে হয়। আমার বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, আধুনিক বিজ্ঞানচর্চ্চার ফলে মানবসমাজের কোন উপকার হয় নাই। কিন্তু মোটের উপর উপকার অপেক্ষা অপকারই যেন বেশী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ডাক্তারকে রোগীর নিকট লইয়া যাইতে যতগুলি মোটরের ব্যবহার হয়, তদপেক্ষা অনেক বেশী মোটরের ব্যবহার হয় জুয়াড়ীদিগকে ঘোড়-দৌড়ের মাঠে লইয়া যাইতে, থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখিতে, অথবা শুদ্ধ বাবুগিরি করিয়া বেড়াইবার জন্য। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট স্থানে শস্য যোগাইয়া রেলগাড়ী সমাজের যে উপকার করে, তাহার চেয়ে অনেক বেশী অপকার করে কলের তৈয়ারি সস্তা কাপড় গ্রামে গ্রামে বিলাইয়া দরিদ্রের জীবিকা স্বরূপ চরকা এবং তাঁত বন্ধ করিয়া, এবং অনশনক্লিষ্ট দেশ হইতে খাদ্য শস্য রপ্তানি করিবার সুবিধা করিয়া দিয়া। এমন কি, কলের ছাপাখানাতেও যে অপকার অপেক্ষা উপকার বেশী হইয়াছে তাহা বলা যায় না। ছাপাখানায় যে সকল পুস্তক ছাপা হয়, তাহার মধ্যে কতগুলিতে ধর্ম্ম এবং মানবহৃদয়ের উন্নতিবিধায়ক বিষয় আলোচিত হয়, এবং কতগুলিতে মানবের পশুবৃত্তির উত্তেজক বিষয় থাকে, তাহার সংখ্যা লইলে এ বিষয়ে সত্যনির্ণয় করা যাইবে। (২) বিজ্ঞানের সাহায্যে নানা বিলাসের উপকরণ প্রচলিত হইবার ফলে জমিদারগণ নিজ গ্রাম ছাড়িয়া বড় সহরে আসিয়া বাস করেন, এবং নানাবিধ বিলাসের জন্য প্রজার শোণিততুল্য অর্থ অজস্র পরিমাণে ব্যয় করেন। এদিকে কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতির অভাবে গ্রামবাসিগণ পরিষ্কার জল পান করিতে পারে না। জলের অভাবে কৃষিকার্য্যের ক্ষতি হয় এবং গ্রামে নানাবিধ কঠিন পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয়। আধুনিক বিজ্ঞান যেন ধনীর বন্ধু, দরিদ্রের শত্রু। ধনীর বন্ধু এইজন্য যে বিজ্ঞান নানাবিধ কলকারখানার সৃষ্টি করিয়া ধনীর প্রভূত অর্থাগমের বহু নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়াছে, নানাবিধ বিলাসের সরঞ্জাম যোগাইতেছে; ব্যাধি প্রতিকারের অনেক

(২) মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন;—Formerly the fewest men wrote books that were most valuable. Now any body writes and prints anything he likes and poisons people's minds. (Indian Home Rule)

"পূর্ব্বে অতি অল্প সংখ্যক লোক গ্রন্থরচনা করিতেন এবং সে সকল গ্রন্থ অতি মূল্যবান হইত। আজকাল যে কেহ যাহা ইচ্ছা লিখিয়া ছাপায় এবং লোকের মন বিষাক্ত করে।"

এ বিষয়ে বিখ্যাত লেখক Frederic Harrison এর On the Choice of Books প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। তিনি বলিয়াছেন যে, আজকাল বাজে পুস্তকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। কোন্ পুস্তক পাঠ করিতে হইবে তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করিয়া পশ্চাৎ পাঠ করা উচিত। নির্ব্বিচারে যে কোন পুস্তক পাঠ করা অতি কু-অভ্যাস।

বহুমূল্য চিকিৎসার প্রবর্ত্তন করিতেছে ; সে সকল চিকিৎসা এত ব্যয়সাধ্য যে দরিদ্রের আয়ত্তের বহির্ভূত। অপর পক্ষে কলের প্রচলন হওয়াতে দরিদ্রের জীবিকার উপায় বন্ধ হইয়াছে, কিংবা জীবিকার জন্য তাহাকে সম্পূর্ণভাবে ধনীর দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইতেছে—ধনীর কলে কাজ না করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের উপায়ান্তর নাই। আধুনিক বিজ্ঞান যুদ্ধ-বিগ্রহের যে সকল মারাত্মক সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়াছে, তাহার ফলে কেবল যে ভীষণ লোকক্ষয় হইতেছে তাহা নহে, তাহার ফলে ধনী জাতি কর্ত্তৃক দরিদ্র জাতির উপর অত্যাচার করিবার অধিকতর সুযোগও হইয়াছে। এই সকল কারণে বোধ হয় যে, আধুনিক বিজ্ঞান মানব সমাজের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর হয় নাই ; এবং যাঁহারা বিজ্ঞান-চর্চ্চায় জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহারা যদি মনে করেন যে, তাঁহারা কোন মহৎ কার্য্য করিতেছেন তাহা হইলে তাহা তাঁহাদের বুঝিবার ভ্রম। প্রকৃত কথা বোধ হয় তাহার বিপরীত।

আবার কতকগুলি বিদ্যা আছে, যেগুলিকে নিষ্ফলা বিদ্যা বলা যায়। আজকাল অনেক নিষ্ফলা বিদ্যারও যথেষ্ট আদর দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, পূর্বে বলিয়াছি, আজকাল বিদ্যার ফলাফল বিচার করা হয় না। বিদ্যা হইলেই তাহার আদর হয়, সে বিদ্যাটি পরাবিদ্যা, অবিদ্যা বা কুবিদ্যা তাহা কেহ দেখে না। একটি নিষ্ফলা বিদ্যার উদাহরণ Pure Mathematics (বিশুদ্ধ গণিত)। অনেক পণ্ডিত সারা জীবন ধরিয়া কেবল অঙ্কই কসিতেছেন। সে অঙ্কে কাহারও কোন উপকার নাই, তাহাতে কাহারও প্রকৃত জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হয় না। Science for science's sake, knowledge for knowledge's sake (বিদ্যার জন্যই বিদ্যা চর্চ্চা) এইরূপ নিষ্ফলা বিদ্যার উদাহরণ। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি জীবনের কি উদ্দেশ্য তাহা ভুলিয়া গিয়া মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে উপায়কে উদ্দেশ্য বলিয়া ভ্রম করেন, পন্থাকেই গন্তব্যস্থান বলিয়া মনে করেন। এইরূপ নিষ্ফলা বিদ্যাকে লক্ষ্য করিয়া টলষ্টয় বলিয়াছেন :—

It (Science) triumphantly tells him : how many million miles it is from the earth to the sun ; at what rate light travels through space ; how many million vibrations of ether per second are caused by light and how many vibrations of air by sound ; etc.

"বিজ্ঞান বহু আড়ম্বরের সহিত প্রচার করে, পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব কত লক্ষ ক্রোশ, আলোক আকাশের মধ্যে কিরূপ বেগে ধাবিত হয়, আলোক আকাশে যে তরঙ্গ উৎপাদন করে তাহা প্রতি সেকেণ্ডে কয় লক্ষ বার কম্পন করে, শব্দ বাতাসে যে তরঙ্গ তুলে তাহাই বা কতবার কম্পন করে ইত্যাদি।"

পাশ্চাত্য দেশে যে চিরকাল ফলাফল বিচার না করিয়া বিদ্যামাত্রেরই প্রশংসা করা হইত তাহা নহে। খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রন্থে আছে যে, আদি মানব জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়া স্বর্গ-ভ্রষ্ট হইয়াছিল। মনে হইতে পারে, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইলে আদি মানবকে কেন স্বর্গভ্রষ্ট হইতে হইবে? কিন্তু সকল জ্ঞান ত শুভজনক নহে। যে জ্ঞান শুভজনক, এখানে তাহাকে লক্ষ্য করা হয় নাই। যে জ্ঞান অশুভজনক, এখানে সেরূপ জ্ঞানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য ইতিহাসে যাহা মধ্যযুগ (Mediaeval age) নামে পরিচিত, সে সময় পণ্ডিতগণ ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনাতেই সময় অতিবাহিত করিতেন। এই সময়কার Imitation of Christ নামক উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে যে, উচ্চ ধর্ম্মজীবন যাপনের জন্য যে বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া আবশ্যক তাহা নহে, বরং বিবিধ বিদ্যার অত্যধিক চর্চ্চাতে চিত্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে পারে, —তাহা আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে বাধাজনক। পাশ্চাত্য দেশে আধুনিক যুগে বিদ্যামাত্রেরই নির্বিচারে প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। টলষ্টয়-প্রমুখ দূরদর্শী মহাত্মগণ ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বুদ্ধিমান পাশ্চাত্য সমালোচকগণ টলষ্টয়কে এক প্রকার প্রতিভাশালী উন্মাদ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে বিবিধ বিদ্যার চর্চ্চা হইয়াছে সত্য। কিন্তু কখনও যে নির্বিচারে বিদ্যামাত্রেরই আদর করা হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। প্রাচীন ভারতে সকল বিদ্যার মধ্যে চিরকাল ব্রহ্মবিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হইয়াছে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,

অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং

অর্থাৎ, সকল বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যাই শ্রেষ্ঠ এবং তাহাতেই ভগবানের প্রকাশ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,

বিদ্যাহিকা ? ব্রহ্মগতিপ্রদা যা

যে বিদ্যার ফলে ব্রহ্মলাভ হয়, তাহাই বিদ্যা নামের যোগ্য। অন্য বিদ্যা বিদ্যা নামের যোগ্যই নহে।

এ বিষয়ে নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রসিদ্ধ—

তৎকর্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।
আয়াসায়াপরং কর্ম বিদ্যান্যা শিল্প নৈপুণং॥

যাহাকেই কর্ম বলা যায় যাহা কর্ম্মফলরূপ বন্ধন সৃষ্টি করে না ; তাহাকেই বিদ্যা বলা যায় যাহা মুক্তি বা মোক্ষলাভের সহায়। অপর কর্ম কেবলমাত্র ক্লেশই উৎপন্ন করে। অন্য বিদ্যা শিল্পনৈপুণ্য ব্যতীত আর কিছু নহে। শিল্প কার্য্যে যেরূপ বুদ্ধি ও কৌশলের প্রয়োগ আছে—এই সকল বিদ্যাচর্চ্চাতে সেইরূপ কেবলমাত্র বুদ্ধি ও কৌশলের ক্রীড়া আছে। তাহারা যখন মানব-মনকে ঈশ্বরাভিমুখে লইয়া যায় না, তখন সে বুদ্ধি ও কৌশল ব্যর্থ বলিতে হইবে।

বিদ্যা শুভ ও অশুভ দুই রকমই আছে, সেই কথাই এতক্ষণ হইল। কিন্তু শুভ বিদ্যারও ঠিকমত চর্চ্চা না করিলে, তাহাতে শুভ ফল না হইয়া অশুভ ফল হইতে পারে। কারণ, বিদ্যাচর্চ্চা এক প্রকার কর্ম। ভাল কর্মও খারাপ করিয়া করিলে তাহাতে মন্দ ফল উৎপন্ন হয়। আসক্তিপূর্বক, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য কোন বিদ্যার চর্চ্চা করিলে, তাহার ফলে একটা মোহ উৎপন্ন হইবে। তাহাতে মনের উন্নতি না হইয়া অবনতি হইতে পারে। যদি মনে অহঙ্কার উৎপন্ন হয় বা মন বিলাসোন্মুখ হয়, যদি পরের দুঃখ দেখিয়া হৃদয় বিগলিত না হয়,—তাহা হইলে মনের অবনতি হইয়াছে বলিতে হইবে। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, কোন ব্যক্তি বিদ্বান বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উক্তরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এমন হইতে পারে যে, ঠিক ভাবে বিদ্যাচর্চ্চা হয় নাই বলিয়া এই সব কুফল হইয়াছে। কারণ ঠিকভাবে বিদ্যা চর্চ্চা করিলে বিনয়, উদারতা, সহানুভূতি এ সকল সদ্‌গুণাবলি অবশ্য বিকশিত হইবে। আমাদের প্রাচীন কালে, যাহাতে বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া দম্ভ অহঙ্কার প্রভৃতি কুফল উৎপন্ন না হয় এ বিষয়ে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা হইত। এজন্য হিন্দু শাস্ত্রে বিদ্যালাভ বিষয়ে অনেকগুলি বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, যেমন তেমন করিয়া কতকগুলি তথ্যলাভ করিলেই হইবে না। দেখিতে হইবে যে, বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও প্রকৃত উন্নতি লাভ হয়। শান্ত সংযত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে গুরুর নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। চিত্ত হইতে অহঙ্কার সম্পূর্ণ ভাবে বর্জন করিতে হইবে—বোধ হয় এজন্যই ব্রহ্মচারীকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হইত। গুরুকে নিরতিশয় ভক্তি করিতে হইবে। বিলাস ত্যাগ করিতে হইবে। শরীরকে কষ্টসহ করিতে হইবে। এ বিষয়ে মনুসংহিতার নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি প্রণিধানযোগ্য—

ব্রহ্মারম্ভেহবসানে চ পাদৌ গ্রাহ্যৌ গুরোঃ সদা।
সংহত্যহ স্তাবধ্যেয়ং সহি ব্রহ্মাঞ্জলিঃ স্মৃতঃ॥ মনু ২।৭১

বেদ পাঠের আরম্ভে এবং শেষে গুরুর পাদ বন্দন করিবে। উভয় কর একত্র করিয়া পাঠ করিবে। ইহাকে ব্রহ্মাঞ্জলি কহে।

অগ্নীন্ধনং ভৈক্ষচর্য্যাং অধঃ শয্যাং গুরোহিতং।
আ সমাবর্ত্তনাৎ কুর্য্যাৎ কৃতোপনয়নো দ্বিজঃ॥ ২।১০৮

ব্রাহ্মণের উপনয়ন হইলে গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত প্রভাতে ও সায়ংকালে হোম করিবে, ভিক্ষা করিবে, খাটের উপর শুইবে না এবং গুরুর সেবা করিবে।

লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিকমেব চ।
আদদীত যতো জ্ঞানং তং পূর্বমভিবাদয়েৎ॥ ২।১১৭

যাঁহার নিকট লৌকিক, বৈদিক বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিবে, তাঁহাকে প্রথমে অভিবাদন করিবে।

সাবিত্রীমাত্র সারোঽপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ।
না যন্ত্রিতস্ত্রি বেদোঽপি সর্বাশী সর্ববিক্রয়ী॥ ২।১১৮

যে ব্রাহ্মণের আচরণ শাস্ত্রানুযায়ী, তিনি যদি কেবলমাত্র গায়ত্রী মন্ত্র জানেন তাহাও ভাল, কিন্তু সকল বেদ পাঠ করিয়াও তিনি যদি নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজন বা বিক্রয় করেন, তাহা হইলে ভাল নহে।

বর্জয়েন্মধু মাংসং চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্বাণি প্রাণিনাং চৈব হিংসনং॥ ২।১৭৭

মদ্য, মাংস, গন্ধ, মাল্য, স্ত্রী—এই সকল ভোগ করিবে না।

মিষ্ট দ্রব্য টক হইয়া গেলে আহার করিবে না ; প্রাণিহিংসা করিবে না।

অভ্যঙ্গ সঞ্জনং চাক্ষ্ণোরুপানচ্ছত্রধারণং।
কামং ক্রোধং চ লোভং চ নর্ত্তনং গীতবাদনং॥ ২।১৭৮

তৈল মর্দন করিবে না, চক্ষুতে কজ্জলাদি দিবে না, পাদুকা এবং ছাতা ব্যবহার করিবে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, এবং নৃত্য-গীত-বাদ্য বর্জন করিবে।

একঃ শয়ীত সর্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎক্বচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥ ১৮০

সর্বত্র একাকী শয়ন করিবে, কোথাও শুক্র ফেলিবে না। ইচ্ছাপূর্বক শুক্রপাত করিলে ব্রত ভঙ্গ হয়।

উদকুম্ভং সুমনসো গোশকৃন্মৃত্তিকাকুশান্।
আহরেদ্যাবদর্থানি ভৈক্ষ্যং চাহরহশ্চরেৎ॥ ১৮২

গুরুর প্রয়োজন অনুসারে কলসে করিয়া জল আনিবে, এবং পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা এবং কুশ আহরণ করিবে। প্রত্যহ ভিক্ষা করিবে।

শরীরং চৈব বাচং চ বুদ্ধীন্দ্রিয় মনাংসি চ।
নিয়ম্য প্রাঞ্জলিস্তিষ্ঠেৎ বীক্ষমাণো গুরোর্মুখং॥ ১৯২

দেহ, বাক্য মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এই সকল নিয়মিত করিয়া গুরুর মুখের দিকে চাহিয়া করযোড় করিয়া বসিয়া থাকিবে।

হীনান্নবস্ত্রবেশঃ স্যাৎসর্বদা গুরু সন্নিধৌ।
উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমংচাস্য চরমং চৈব সংবিসেৎ॥ ২।১৯৪

গুরু সমীপে সর্বদা গুরু অপেক্ষা হীন অন্ন বস্ত্র এবং বেশ গ্রহণ করিবে। গুরুর পূর্বে উত্থান করিবে, পরে উপবেশন করিবে।

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যা মাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥ ২।২৩৮

শূদ্রের নিকট হইতেও শ্রদ্ধাপূর্বক শুভবিদ্যা গ্রহণ করিবে, চণ্ডালের নিকট হইতেও মোক্ষ লাভের উপায় শিক্ষা করিবে, নিকৃষ্ট কুল হইতেও উত্তম স্ত্রী গ্রহণ করিবে।

এ বিষয়ে মনুসংহিতাতে আরও অনেক শ্লোক আছে। তাহাতে শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে সুসংযত ভাবে বিলাস ত্যাগ করিয়া বিনীত চিত্তে অধ্যয়ন করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই সকল প্রাচীন আদর্শ আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় না। ছাত্রদের মধ্যে বিলাস এবং স্বেচ্ছাচার ভয়ানক বাড়িয়া গিয়াছে। বোধ হয় আজকাল শিক্ষার বিষয় এবং শিক্ষার প্রণালী উভয়েরই অবনতি হইয়াছে। এজন্য "উচ্চ" শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যেও ঔদ্ধত্য, অসংযম এবং স্বেচ্ছাচার অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্বেষণ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম-এ, বি-এল্

কোথায় পাব, কোথায় যাব, কোন পৃথিবীর শেষে গো,
কোন বিদেশীর দেশে ?
আমি খুঁজে মরি তাই ;
দিবস হল রাত্রি আমার, কোথা-ও যে নাই ও,
কোথা-ও যে নাই।

পুঞ্জ আলোর মধ্যখানে হল আত্মহারা যে,
অন্ধকারের তারা,
যেতে পথ হয়ে যায় ভুল।
ফুটতে গিয়ে হঠাৎ কেন ফুটলো না মুকুল রে,
মল্লিকা-মুকুল ?

দিনের পরে দিন আসে যায়, করে আসি আসি গো,
বাজে বাজে বাঁশী,
তার ফুরালো না সুর।
দিনের শেষে এসে দেখি, দূর হল সুদূর হায়,
দূর হল সুদূর।

যতই বয়ে চলি ব্যথা, বোঝা যে হয় ভারী এ,
বইতে কি আর পারি ?
তবু রইতে নারি, হায় !
পাতার ফাঁকে হয় ত ডাকে ঈষৎ ইসারার সে,
আকুল ইসারায়।

কোথায় যাব, কোথায় পাব, কোন জনমের শেষে গো
কোন জীবনের দেশে ?
আমি পথের পানে চাই,
কাছেই আছে ? কেই বা জানে ? হয় ত দূরেও নাই গো,
হয় ত কোথাও নাই।

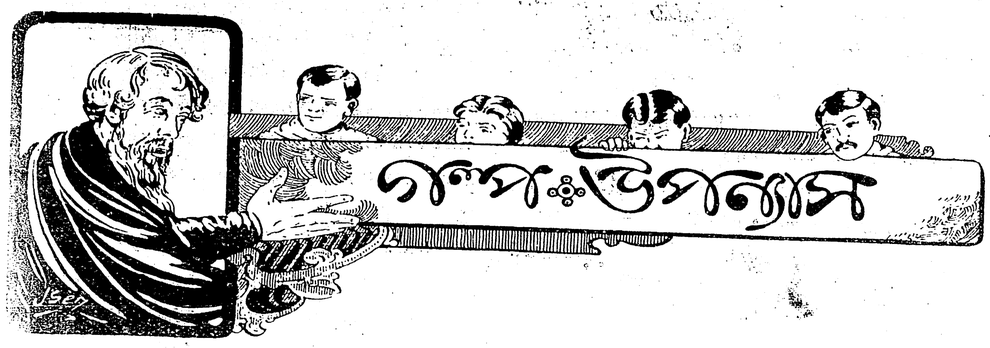

রাজর্ষী !

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল

নরেন্দ্রবাবুর কাছে উপদেশ লইয়া আমি আবার পড়াশুনা আরম্ভ করিলাম। আর কলেজে ভর্ত্তি হইলাম না। কেবল বই কিনিয়া বাড়ীতে পড়িতাম ; মাঝে মাঝে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে যাইতাম, আর রোজ একবার নরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে গিয়া আলাপ করিতাম।

আমার জীবনের একটা নূতন পরিচ্ছেদ খুলিয়া গেল। আমার পূর্ব্বের জ্ঞান পিপাসা আবার ফিরিয়া আসিল। জীবন খুঁজিবার মত এত বড় একটা জিনিসের সন্ধান পাইলাম যে, মনে হইল যে, ইহার অনুসন্ধানেই জীবন শেষ করিয়া দিব। আমার জ্ঞান ও বিদ্যা খুব দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিল।

প্রথমে মনে ভাবিয়াছিলাম, বুঝি আমার মুক্তি হইয়া গেল, বুঝি আমি আমার জীবন সত্য-সত্যই সার্থক করিয়া তুলিব জীবনব্যাপী জ্ঞানের সাধনার দ্বারা। কিন্তু যে বিষবৃক্ষ আমি নিজ হাতে বুকের ভিতর রোপণ করিয়াছিলাম, তাহা এত সহজে মরিবার নহে। মাঝে মাঝে তার শুকনো ডালপালার ভিতর নূতন জীবনের সঞ্চার দেখা যাইত। হঠাৎ মাঝে মাঝে সে বিষ আমার রক্তের ভিতর বিষম নেশা লাগাইয়া দিত।

আমি ঠিক যেন দুইটি স্বতন্ত্র মানুষ হইয়া গেলাম। এক আমি দিনের পর দিন রাতের পর রাত একাগ্র নিষ্ঠার সহিত বইয়ের পর বই পড়িয়া যাইতাম, গবেষণার নেশায় আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যাইতাম। আবার এক দিন হয় তো হঠাৎ সমস্ত বই বিস্বাদ হইয়া উঠিত, আমি উন্মনা হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতাম—তখন হয় তো মাসাবধিকাল মদ ও বেশ্যায় মগ্ন হইয়া কাটাইয়া দিতাম।

এমনি করিয়া আলো-ছায়ার ভিতর দিয়া আমার জীবনের দিনগুলি কাটিতে লাগিল। নিজের ভিতর এই যে দারুণ বিরোধ, ইহার সমন্বয় করিতে আমি পারিলাম না,—আমার আত্মাকে আমার দেহের অধিপতি করিতে পারিলাম না।

নরেন্দ্রবাবুর কাছে আমি সব কথা খুলিয়া না বলিলেও, তিনি বোধ হয় আমার গোপন গতিবিধির কথা টের পাইতেন। মাঝে মাঝে আমার গবেষণা মধ্যপথে ফেলিয়া রাখিয়া আমি যে কোথায় উধাও হইতাম, তাহা তিনি যে একেবারে আন্দাজ না করিতেন তাহা নয়।

এক দিন তিনি বলিলেন, "দ্বিজেশ, I envy you your opportunities."

আমি একটু ভাবিয়া বলিলাম, "হাঁ, opportunity for good and evil ! দাদা, আপনি আমার কি নিয়ে হিংসা ক'রবেন, আমার কি আছে। আমি যেতাম যদি আপনার আত্মা, তবে আমার সব সম্পদ বিলিয়ে দিতাম।"

"বেশ, তবে দাও না তাই।" দিব্য শান্ত ভাবে কথাটা বলিয়া তিনি মৃদু হাসিয়া আমার দিকে চাহিলেন।

কথাটা মোটেই ঠাট্টা করিয়া তিনি বলেন নাই, ওই কৌতুকের হাসির তলায় অনেকখানি দৃঢ়তা ছিল, ঐ দৃষ্টির ভিতর অনেকখানি আশা ছিল।

এত বড় একটা কথার আলোচনা করিতেও আমার ভয় করিতে লাগিল। কথাটায় আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। দাদার মুখের সব কথা যেন আমার কাছে বেদ-বাক্যের মত লাগিত; তাই আমি ভয় খাইয়া গেলাম। কিছু বলিলাম না।

দাদা বলিলেন, "আমার মনটা চাও, আমার আত্মা চাও, সে তোমার আছে। আমার চেয়ে বড় জিনিস তোমার ভিতর আছে। তোমার আত্মা কেবল পাষাণী অহল্যার মত আত্মবিস্মৃত হ'য়ে আছে। একে জাগিয়ে জিইয়ে তুলতে হ'লে, কেবল একটা প্রকাণ্ড moral explosion দরকার। তুমি যদি তোমার সমস্ত সম্পত্তি দেশকে বিলিয়ে দিয়ে আপনাকে ফকীর করে দিতে পার তবেই তোমার আত্মার রুদ্ধ স্রোতস্বতী প্রচণ্ড বেগে ছুটে বেরুবে, আর কিছুতেই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ছেলেবেলা থেকে তুমি ভোগের ভিতর মানুষ হ'য়েছ, ত্যাগ কাকে বলে জান না; চিরদিন সেবা পেয়ে এসেছ, সেবা ক'রতে কোনও দিন শেখনি; তাই তোমার আত্মার একদিককার জানালা একদম বন্ধ হ'য়ে র'য়েছে, সে জানালা খুলতে হ'লে চাই একটা মস্ত বড় ত্যাগ।"

আমার সমস্ত চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল দাদার এই কথায়। আমার ভিতর কে যেন আগুণ জ্বালিয়া দিল—আমার সমস্ত অন্তর আলোকে উজ্জ্বল হইয়া গেল, কিন্তু যেন পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল। আমার মনে হইল, আমি সত্যই বুঝি মহান, বৃহৎ আত্মা। মন আমাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল সেই বিরাট ত্যাগ করিতে, যাহাতে আমার সকল সত্তা সার্থক হইয়া পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিবে! আমার মনটা আবেগে এত ভরিয়া উঠিল যে, আমি কথা বলিতে পারিলাম না।

কিছুক্ষণ পরে আমি বলিলাম, "আপনি কি ব'লছেন দাদা? সম্পত্তি বিলিয়ে দেব কেমন করে? সম্পত্তিতে আমার কতটুকু অধিকার? আমার পিতৃ-পিতামহেরা সম্পত্তি করে' রেখে গেছেন, তাঁদের বংশের চিরদিনকার সংস্থানের জন্য। নৈতিক হিসাবে আমি সে সম্পত্তির সাময়িক ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী বই তো নয়? সমস্ত পরিবার, সমস্ত ভবিষ্যদ্বংশ এর উপর নির্ভর ক'রছে; আমি এটা দান ক'রলে কেবল তো আমার নিজের সম্পদ দেওয়া হবে না, সব বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কুটুম্বের সর্ব্বনাশ করা হবে।"

বাসুদেব শাস্ত্রী আমাকে সংস্কৃত পড়াইতেন। তিনি পাশেই বসিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, "ঠিক কথা, এই তো হিন্দুর ছেলের কথা! নরেন্দ্র বাবু, আপনাদের ইংরাজী আইন ব'লছে যে, দায়ভাগ মতে হিন্দু পৈতৃক সম্পত্তির যথেচ্ছ বিনিয়োগ করিতে পারে। হ'তে পারে এই এখন আইন, কিন্তু এ তো ধর্ম্ম নয়। আমাদের আইন ও ধর্ম্ম তো আলাদা নয়! আমাদের শাস্ত্রে বলে গেছে—

"যে জাতা যেঽপ্যজাতা যে চ গর্ভে ব্যবস্থিতা
বৃত্তিং তে অভিকাঙ্ক্ষন্তি ন দানং ন চ বিক্রয়ঃ॥

জীমূতবাহন কুত্রাপি বলেন নি যে, ধনী তার পৈতৃক ধন যথেচ্ছ বিনিয়োগ করে কুটুম্বের বৃত্তি ধ্বংস ক'রতে পারে।"

নরেশ বাবু বলিলেন, "ঠিক এমনি তত্ত্বকথা লোকে বলতো feudal times এ। মধ্য যুগে ইয়োরোপের সর্ব্বত্র এই বিশ্বাস অল্প-বিস্তর বদ্ধমূল ছিল; তাই ভূসম্পত্তির দান-বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এটা অতি পুরাতন হেত্বাভাষ, শাস্ত্রী ম'শায়। সমাজতত্ত্ব এখন ঠিক সেই পুরাতনের গণ্ডী ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আপনি শুনলে হয় তো অবাক হ'য়ে যাবেন যে, আপনি যে ভূসম্পত্তির ধর্ম্মের উপদেশ গাঁথছেন, সেই ভূসম্পত্তি জিনিসটাকেই লোকে এখন একটা প্রকাণ্ড অন্যায় ব'লে মনে করে। Proudhon ব'লেছেন, সম্পত্তি মাত্রই দস্যুতা। যা আমার আছে তার থেকে অপরে বঞ্চিত হ'বে, এই ধারণাটাই property, আর এটা সম্পূর্ণ অবৈধ ধারণা, এ কথা Proudhon বলেন। আমি সে কথা স্বীকার করি না, এখনকার অনেক পণ্ডিতও সে কথা স্বীকার করেন না। কিন্তু এ বিষয়ে আজকালকার উন্নতিশীল সমাজতত্ত্ববিৎ অনেকেই স্বীকার করেন যে, ভূসম্পত্তি জিনিসটা সমাজের

হিতবিরুদ্ধ। বাতাসে, সূর্য্যালোকে, গঙ্গার জলে যদি আপনার আমার স্বতন্ত্র property না থাকে, তবে মাটিতেই বা থাকবে কেন?"

শাস্ত্রী মহাশয় একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি ভীষণ তর্ক জুড়িয়া দিলেন। আমার এসব মতামত অনেকটা জানা ছিল, তাই আমি অবাকও হইলাম না, খুব বেশী তর্কও করিলাম না। কিন্তু কথাটা স্বীকারও করিলাম না।

পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে তর্ক হইতে নিবৃত্ত হইয়া নরেন বাবু আমাকে বলিলেন, "দেখতে পাচ্ছ না ভাই তুমি, যে, তোমার ভূসম্পত্তিটা কত বড় প্রকাণ্ড অন্যায় অত্যাচার। মাটি আছে, তা' তুমি তৈয়ার করনি, সে দিয়েছেন ভগবান। চাষা তাকে চাষ করে সোণার ফসল তুলছে। তোমার ভূসম্পত্তির মানে হ'চ্ছে এই যে, তুমি সেই দাবী নিয়ে চাষার কষ্টের ধনে ভাগ বসাতে যাবে। কেন? কি তুমি ক'রেছ তার? State সবার কাছে আয়ের একটা অংশ দাবী ক'রতে পারে, কেন না, গভর্ণমেণ্ট সে অর্থ সাধারণের হিতার্থ ব্যয় করবে,—শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে সেই ব্যবস্থা ক'রবে যাতে করে' প্রত্যেকে নিজ নিজ শ্রমের ফল ভোগ ক'রতে পারে। কিন্তু তুমি জমীদার, তোমার কিসের দাবী? তুমি তো কিছু কর না।"

অনেকক্ষণ তর্ক করিয়া আমি স্বীকার করিলাম যে, একটা অবস্থানিরপেক্ষ abstract সত্য হিসাবে এ কথা মানিতে হয়। সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িবার ভার যদি আমাদের থাকিত, তাহা হইলে হয় তো আমরা ভূমিকে সাধারণ সম্পত্তি করিয়া তাহার ভিত্তির উপর সমাজ গঠন করিতাম। কিন্তু আমি বলিলাম, "সমাজ তো প্লাষ্টিসিনের পুতুল নয় দাদা, যে, যখন-তখন ভেঙ্গে চুরে যেমন ক'রে ইচ্ছা তেমনি গড়ে ফেলতে পারি। আপনিই তো ব'লেছেন যে, ইতিহাস হ'চ্ছে সমাজের জীবন। সে ইতিহাস অস্বীকার করে, সমাজ ভাঙ্গতে গড়তে চেষ্টা করা পাগলামি। এই যে আমাদের land systemএর উপর আমাদের সমস্ত সমাজ গড়ে উঠেছে, ভয়ানক জটিল সব বন্ধন তৈরী হ'য়েছে,—একে এখন হঠাৎ অস্বীকার ক'রলে সমস্ত সমাজ যে চুরমার হ'য়ে প'ড়বে। এই ধরুন না কেন, আমাদের সমস্ত ভদ্রলোক, যাঁরা আমাদের intelligentia, যাঁদের অস্তিত্বের উপর সমাজের সব উন্নতি নির্ভর ক'রছে, তাঁদের পোনেরো আনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নির্ভর ক'রছে এই ভূসম্পত্তির উপর। ভূসম্পত্তির বৃত্তি দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিপালিত হ'চ্ছে।"

দাদা বলিলেন, "এর চেয়ে tragic আর কিছু ভাবতে পার কি দ্বিজেশ? এই যে লক্ষ লক্ষ ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা এঁরা দিনের পর দিন কেবল vegetate ক'রে দিন কাটাচ্ছেন, জৈব ক্রিয়া সম্পাদন ছাড়া সমাজের আর কিছু হিত সাধন ক'রছেন না। অথচ চাষা বারো মাস মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেই জমীদার, মহাজন, ব্যবসায়ী প্রভৃতির পেট ভরাবার জন্য আবাদ ক'রছে! আট দশ হাত জলের তলায় সারাদিন ডুব মেরে মেরে পাট কাটছে! এত বড় একটা প্রচণ্ড অন্যায়ের উপর আমাদের সমাজ চলছে!"

আমি বলিলাম, "হ'ক tragedy, হ'ক অন্যায়, কিন্তু আমাদের এই অন্যায়ের উপর বহু কাল থেকে সমাজ এমন ভাবে গড়ে উঠেছে যে, একে যদি ভাঙ্গতে চান তবে সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে পড়বে সমস্ত ভদ্রলোক-সমাজ, যারা সমাজের intellectuals, যারা থাকাতে সমাজের ক্রমোন্নতি হ'বে। প্রজারই কি তা'তে সুখ বৃদ্ধি হ'বে? রাজশক্তি ও প্রজার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে এই ভদ্রলোক-সমাজ। এটা ভেঙ্গে পড়লে রাজশক্তির সমস্ত প্রকোপ ও বন্ধন প্রজাকে পীড়িত নিষ্পেষিত ক'রবার সম্ভাবনা খুব বেশী নেই কি?"

"তোমার কথা ষোল আনা স্বীকার না ক'রলেও মোটামুটি আমি মানি। যত বড়ই অন্যায় হ'ক, যত প্রকাণ্ড tragedy হউক, এই ব্যাপারটা সত্য, এর পিছনে একটা লম্বা ইতিহাস আছে। এটা যদি আজ হঠাৎ ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া যায়, তবে সমস্ত সমাজে এমন একটা ওলট-পালট হ'য়ে যাবে, এত বড় একটা প্রকাণ্ড বিপ্লব ঘটে যাবে, যার ফল ভাল হ'বে কি মন্দ হবে বলা কঠিন। ভাল যে না হ'তে পারে তা' নয়, তবে মন্দও খুব হ'তে পারে। Revolution মাত্রই অল্প বিস্তর জুয়া খেলা। সমাজের সব ব্যাধিরই প্রায় এই দশা—অর্থাৎ কি না যেগুলো সমাজের ভিতর শিকড় গেড়ে বসে' গেছে। ধর না জাতিভেদ। আমার রসুয়ে বামুন যে

ভুপেন বোসের মাথায় পা তুলে দেবার যোগ্য নয়, এ কথা কে না স্বীকার ক'রবে। যদি জাতিভেদ মানে সুধু এইটুকু হ'ত তবে তাকে ভেঙ্গে চুরমার ক'রতে কিছুই ঠেকতো না। কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, এই ভেদটা আমাদের সমাজের সমস্ত জীবনকে এমন ভাবে জড়িয়ে ধরে র'য়েছে যে, হঠাৎ এটা ভাঙ্গতে গেলে সমাজ চুরমার হ'য়ে গিয়ে আবার তার নূতন করে গড়ে উঠতে হবে। জাতিভেদ মানবো না অথচ হিন্দু থাকবো, এ প্রায় হওয়াই অসম্ভব। আর কোথাও যদি না ঠেকি, তো বিয়ের বেলায় গিয়ে ঠেকতে হবে।

"তেমনি মহাজনি। মহাজনেরা সুদের উপলক্ষ করে' যে গরীবের সর্ব্বনাশ রোজ ক'রছে তা তো চক্ষের উপর দেখতে পাচ্ছি। তারা যে সমাজের একটা দুষ্ট ক্ষত, সে বিষয়ে তো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে যদি তাদের হঠাৎ আইন করে উঠিয়ে দেওয়া যায়, কিম্বা যদি এমন ব্যবস্থা করা যায় যাতে করে' হয় তো মহাজন আর সুদে টাকা লাগান লাভজনক মনে ক'রবে না, তবে কি সর্ব্বনাশ হ'বে ভেবে দেখ দেখি। যতই মন্দ ও অনিষ্টকর হোক না, এই মহাজনেরাই আমাদের দেশের সমাজে একমাত্র credit গড়ে রেখেছে। মহাজনের নিপাত মানে creditএর নিপাত। তাতে করে' সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি শিল্প সব ওলট পালট হ'য়ে যাবে। সমাজের ব্যাধি নির্ণয় করা সোজা, তার প্রতিকার করা ঠিক তত সোজা নয়।"

"আমিও তো তাই বলছিলাম। তা' ছাড়া আমাদের land systemকে আমি একটা নিছক ব্যাধি ব'লে স্বীকার ক'রতেও রাজী নই। সমাজের পক্ষে একটা স্বাধীন বুদ্ধিমান intellectual শ্রেণীর যদি প্রয়োজন থাকে, তবে যে ব্যবস্থার দ্বারা তাদের কষ্টসাধ্য পরিশ্রম থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের সমাজের অভিভাবক বা guardian স্বরূপ কাজ ক'রা সম্ভব হ'বে, সেটা নিশ্চয়ই দরকার। আমি আমাদের land systemকে সেই রকম intellectualদের একটা বৃত্তি স্বরূপ মনে করি।"

নরেনবাবু। বৃত্তিই যদি দিতে হয়, তবে সে বৃত্তিরূপে দেওয়াই ভাল। এ ব্যবস্থায় কেবল intellectualরাই বৃত্তি পায় না, কেবল সমাজের guardianরা পুষ্ট হয় না। যাদের পোষণ করবার দরকার আছে, তাদের এক-এক জনের সঙ্গে নিরানব্বইজন সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য অপদার্থ পরিপুষ্ট হয়। তা' ছাড়া, আমি এ কথা স্বীকার করি না যে, সমাজের হিতার্থ intellectual নামক একটা অকর্ম্মণ্য বংশ পুষতেই হ'বে। কোদাল দিয়ে মাটি কোপালে বা মাকু ঠেলে কাপড় বুনলে intellectuality নষ্ট হ'বে, আর grip dumb bell দিয়ে exercise ক'রলে তা' পুষ্ট হ'বে, এ আমার বিশ্বাস নয়। সমাজের আদর্শ ব্যবস্থায় intellectual ব'লে একটা স্বতন্ত্র জাতের কোনও প্রয়োজন আছে বলে স্বীকার করি না। তবে এখন বর্ত্তমান অবস্থায় আছে মানি।"

তার পর যেন অনেকটা আবিষ্ট ভাবে নরেনবাবু বলিয়া গেলেন, "এইটাই দেখি সমাজের কোনও সংস্কারের পক্ষে একটা মস্ত বালাই। কোনও একটা কিছু ধরতে গেলেই দেখতে পাই, সেটা আলাদা কিছু নয়,—সমস্ত সমাজের জীবন তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সেটাকে নাড়া দিতে গেলে, এতগুলো জিনিস নাড়া দিতে হ'বে, এত সব বিধি-ব্যবস্থা গড়তে হ'বে যে, তা' ভেবে ওঠা যায় না। এ একটা জটিল গোলকধাঁধা,—এর কোথায় যে আরম্ভ ক'রতে হ'বে, আর কোথায় গিয়ে শেষ ক'রতে হবে, তা' ঠিক করা একটা ভারি কঠিন সমস্যা। তাই এক এক সময় মনে হয় যে, সমাজের সংস্কার সেই দিনই হবে, যেদিন আলেকজাণ্ডারের মত কোনও বীর এসে এ জটিল গ্রন্থি কেটে সাফ করে দেবেন। সমস্ত ভেঙ্গে চুরে একেবারে নূতন করে না গড়তে পারলে বুঝি এর কোনও উপায় হ'বে না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তবু ত' আপনি, আমাদের সমাজের ভিত্তি-স্বরূপ যে ভূমির স্বত্ব, সেটা ভেঙ্গে দিতে চান।"

"কই না, আমি তো তা' তোমায় ভাঙ্গতে বলি নি। আমি তা' ভাঙ্গতে চাই, কিন্তু আস্তে আস্তে। এমন কোনও একটা প্রণালী চাই, যাতে ক'রে ভূম্যধিকারবাদ ক্রমশঃ উঠে যাবে,—যে ভূমির ব্যবহার ক'রবে, তারই তাতে অধিকার হ'বে। সেটা হওয়া দরকার এত আস্তে যে, সমাজের কেউ যেন সেটায় গুরুতর আঘাত না পায়। কিন্তু আমি তো তোমাকে সে system ভাঙ্গতে বলি নি; আমি ব'লেছি, তোমাকে ব্যক্তিগত ভাবে ত্যাগ ক'রতে। তোমার সম্পত্তি তুমি এমন ভাবে ব্যবস্থা করে' দেও, যাতে যে কৃষক তারই ভূমিতে সম্পূর্ণ অধিকার জন্মায়। সে অধিকার তোমার আছে, সে ত্যাগ তুমি ক'রতে পার। আর যদি তুমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে কর যে, এই systemটা খারাপ, শেষ পর্য্যন্ত এটা ধ্বংস হওয়া দরকার, তবে তুমি সে ধ্বংসের চেষ্টা না ক'রলেও, ব্যক্তিগত ভাবে এই অনিষ্টকারী পাপ ব্যবস্থার সুযোগ না নিয়েও তো থাকতে পার। এখানে আর কোনও প্রশ্ন নেই,—প্রশ্ন এই যে, তুমি একটা প্রকাণ্ড স্বার্থত্যাগ করে কেবল নিজের পরিশ্রমের উপর নিজের জীবিকার জন্য নির্ভর ক'রবে কি না?"

আমি। "না দাদা, কথাটা অত সোজা নয়। আমার একার কথা যদি হ'ত, তবে কোনও কথা ছিল না। কিন্তু আমার পোষ্য শ' খানেক লোক, তারা প্রত্যক্ষ ভাবে আমার সম্পত্তির দ্বারা পুষ্ট হ'চ্ছে। তা' ছাড়া, পরোক্ষ ভাবে অনেক লোক পুষ্ট হ'চ্ছে। তা ছাড়া, আমার সম্পত্তির আয় হ'তে সাত-আটটা স্কুল চলছে, একটা হাসপাতাল ও পাঁচটা ছোট ছোট ডিস্পেন্সারী চলে। লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবা-পূজা হয়, তাতে বৎসরে চারটা মহোৎসব হয়। সমস্ত দেশের দুঃখী কাঙ্গালী আমার কাছে ভিক্ষা পায়, বহু ব্রাহ্মণ বৃত্তি পায়। নবাবগঞ্জের রাজবাড়ী কেবল আমি নই দাদা, এর সঙ্গে ও অঞ্চলের সমস্ত জড়িত র'য়েছে। আজ যদি আমার রাজগী উড়ে যায়, তার ধাক্কা হাজার হাজার লোকের গায়ে লাগবে।"

নরেনবাবু মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন, "এ সব যুক্তি তোমার Brainএর। কিন্তু এর তলায় এ সবের আসল ভিত্তি যদি খোঁজ, সে হ'চ্ছে তোমার স্বার্থ! তুমি তোমার সুবিধা সুযোগ ছাড়তে রাজী নও। নইলে সম্পত্তির এমন ব্যবস্থা করা কিছু অসম্ভব নয়, যাতে লোক-হিতকর অনুষ্ঠানগুলি সব বজায় থাকতে পারে। অথচ তুমি একটা প্রকাণ্ড ত্যাগ করে' কেবল যে সমস্ত দেশের সম্মান লাভ ক'রতে পার তা নয়,—এক দিকে তোমার নিজের, আর এক দিকে তোমার দেশের একটা প্রকাণ্ড উপকার ক'রতে পার। তোমার নিজের উপকার হ'বে, কেন না, এই প্রকাণ্ড ত্যাগে তোমার আত্মার উপর জমাট-বাঁধা সাড়াশূন্যতার বাঁধা ভেঙ্গে গিয়ে, তোমার স্বাধীন সত্তা দুই কূল ছাপিয়ে বের হ'বে; তাতে তুমি এত বড়, এত মহান্ হ'য়ে যাবে যে, তখন আর তোমার এ ত্যাগকে ত্যাগ বলে মনে হবে না। দেশের তুমি একটা মস্ত উপকার করবে, কেন না, তোমার প্রকাণ্ড জমীদারীর ব্যবস্থায় একটা প্রকাণ্ড সামাজিক পরীক্ষা হ'য়ে যাবে। সে পরীক্ষায় আমাদের সব থিওরী কার্য্যকরী বলে প্রমাণ হ'য়ে যাবে। আর তার পর দেশের সমস্ত লোক আগ্রহের সঙ্গে এই পরিবর্ত্তন কামনা ক'রবে। যে সমস্যার সমাধান এখন অসম্ভব মনে হ'চ্ছে, তা' তখন সম্ভব হ'বে। তাই ব'লছিলাম, তোমার যে মস্ত সুযোগ আছে একটা প্রকাণ্ড কাজ ক'রবার, তার জন্য তোমাকে হিংসা ক'রতে ইচ্ছা করে।"

আমার মন টলমল করিয়া উঠিল। নরেনবাবুর কথা আমার উপর চিরদিনই একটা অলৌকিক শক্তি বিস্তার করে,—আজ যেন তাঁর এ স্বপ্ন আমাকে মুগ্ধ করিতে চাহিল। আমার মনের এমন অবস্থা হইল—যেন আমি একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের ধারে আসিয়া পড়িয়াছি, আর এক ধাক্কায় নীচে অতলস্পর্শ সাগরে পড়িয়া যাইব,—অথচ মনটা মত্তের মত সেই দিকেই ছুটিয়া চলিয়াছে। আমার বড় ভয় হইল। আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

নরেনবাবুও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের কথাবার্ত্তার মধ্য পথে গোটা দুই হাই তুলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। আমরা দুইজনে নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিলাম।

অনেকক্ষণ পরে নরেনবাবু বলিলেন, "তোমাকে দোষ দিতে পারি না দ্বিজেশ। আমি বলছিলাম, তোমার স্বার্থ তোমায় ঠেকিয়ে রাখছে। সেটা ভুল ব'লেছি, ঠিক স্বার্থ নয়, এ একটা ভাবগ্রন্থি—একটা complex; একে মনের নিশ্চলতা—mental inertia বলা যেতে পারে। ভেবে দেখতে গেলে, জিনিসটা মোটেই খারাপ নয়। এটা আছে ব'লেই মানুষ টিঁকে আছে। মনের এই স্থিতি-স্থাপকতা না থাকলে, আমি হয় তো আজ প্রফেসারী না করে' সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে প'ড়তাম। তাতে ভাল যে হ'তই, তা' জোর করে ব'লতে পারি না।"

নরেনবাবুর এ কথাটা ঠিক তাঁর যোগ্য। তাঁর মনটা এমন পরিষ্কার, সমস্ত সমস্যার সম্বন্ধে তিনি এমন আশ্চর্য্য ক্ষমতার সহিত আলোচনা করেন, তার সমস্ত দিক এমন তন্নতন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে ও দেখাইতে পারেন যে, এ বিষয়ে তাঁর তুল্য লোক আর নাই। কিন্তু তাঁর বুদ্ধি এত পরিষ্কার বলিয়াই তিনি কর্ম্মী কোনও দিন হইতে পারিলেন না। তাঁর চেয়ে যারা ঢের কম বোঝে, সৎকার্য্যে উৎসাহ তাঁর চেয়ে যাদের অনেক কম, এমন বহু বহু লোক কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া অনেক কাজ করিয়া গিয়াছে, দেশের সেবকবৃন্দের মধ্যে আপনাদের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখাইয়া গিয়াছে। তাদের চেয়ে নরেনবাবুর অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি অনেক বেশী ছিল, সব কাজের ভালর সঙ্গে মন্দটা এত বেশী স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইতেন বলিয়াই, তিনি তাদের মত একাগ্র চিত্তে কাজে নামিতে পারিতেন না, পদে পদে সন্দেহ আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিত। তাই বর্ত্তমান যুগের ভাবুক হইয়াও নরেন্দ্র বাবু কর্ম্মী হইতে পারিলেন না।

(১৬)

নরেনবাবু উঠিয়া গেলেন—তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। ঝড়ের মুখে নৌকার মত আমার মনটা ভীষণ দোল খাইতে লাগিল; আমি মাতালের মত অস্থির চিত্তে ভাবিতে লাগিলাম।

কি প্রকাণ্ড এ আদর্শ! কত মহৎ এ কাজ! এত বড় একটা কাজ করিতে ভয়ানক লোভ হইল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে একটা একটা করিয়া বাধা চিন্তার দুয়ারে আসিয়া ভয়ানক গোলযোগ বাধাইতে লাগিল। তাই দোল খাইতে লাগিল আমার চিত্ত। আবার মনে হইল সাবিত্রীর কথা, রাণীমার কথা। মনটা ক্ষেপিয়া উঠিল—কেন করিব না ত্যাগ? এদের জন্য? এদের পথে বসাইবার ভয়? এরা আমার জন্য কবে কি করিয়াছে? কবে কি ভাবিয়াছে? বরং এরাই তো আমার জীবনটাকে মরুভূমি করিয়া ফেলিয়াছে!

হাঁ, আমার জীবন মরুভূমি—তার জন্য সাবিত্রী দায়ী, রাণীমা দায়ী, নবাবগঞ্জের রাজবাড়ী দায়ী,—সবাই দায়ী। যদি আমি রাজপুত্র না হইতাম,—গরীবের ছেলে হইলে আমার এত অধঃপতন হইতে পারিত না। আমি হয় তো মানুষ হইতে পারিতাম। গরীব হইলে হয় তো স্ত্রী স্নেহময়ী হইত—বিধুর মত।

বিধুর কথায় চিন্তার ধারা আর এক দিকে গেল। তন্নতন্ন করিয়া আমার অতীত জীবন আমি সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম। আমার জীবনের প্রত্যেকটি অপরাধ জ্বালাময় অক্ষরে আমার অন্তরে ফুটিয়া উঠিল—কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছি, কত লোককে নষ্ট করিয়াছি, সতী নারীর ধর্ম্মনাশ করিয়াছি, দুর্ব্বল চিত্তকে কলঙ্কের পথে টানিয়া নামাইয়াছি—আমার অন্ধকারময় অতীতের সব কথা মনে হইল। বিধুর প্রতি কি নৃশংস কৃতঘ্নতা করিয়াছি, আমার নিজের পুত্রকে অনশনে বিনা চিকিৎসায় মরিতে দিয়াছি—ওঃ, আমার পাপের যে অন্ত নাই!

মাথার ভিতর আগুন জ্বলিতে লাগিল, দম—ফাটার মত হইল। আমি বেয়ারাকে পেগ দিতে বলিলাম। সে পেগ ঢালিয়া দিয়া হুইস্কীর বোতলটা হাতের গোড়ায় রাখিয়া গেল। আমি সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ভাবে পেগের পর পেগ নিঃশেষ করিতে লাগিলাম,—বেয়ারা সোডা ঢালিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে আমার এক পুরাতন মোসাহেব ও দালাল আসিয়া জুটিল। তার নাম অমৃত। সেও সঙ্গে সঙ্গে মদ খাইতে লাগিল। তখন আমার নেশাটা বেশ চাপিয়া আসিয়াছে,—আমি সম্পূর্ণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি। সে সংবাদ দিল, "সে বেটীকে হাত ক'রেছি।"

অনেক দিন হইল একটি ভদ্র ঘরের বধূর উপর আমার নজর পড়িয়াছিল। এই পাপিষ্ঠের কাছে এক দিন সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিয়াছিলাম। হতভাগ্য তার পর হইতে তাহার পিছনে লাগিয়া তাহাকে হস্তগত করিয়াছে।

আমি নাচিয়া উঠিলাম, বলিলাম, "কোথায় সে?"

"বোটে।"

"চল বোটে" বলিয়া আমি উঠিলাম। তার পর অমৃতের সঙ্গে ভাসিয়া পড়িলাম। এক মাসের মধ্যে আর বাড়ী-মুখো হইলাম না।

এক মাস পরে এক দিন হঠাৎ আমার নেশা কাটিয়া গেল। আমি বাড়ী আসিলাম, আসিবার সময় অমৃতকে গোপনে বলিয়া আসিলাম, "একে বিদায় ক'র।"

সে নারীর কোনও দোষ ছিল না। আমি তার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম; কেন না, হঠাৎ আমার আবার এই ঘৃণ্য জীবনের উপর বৈরাগ্য ধরিয়া গিয়াছিল।

পরে অমৃত আসিয়া খবর দিল, মেয়েটা ভয়ানক কান্নাকাটি করিতেছে, সে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়, মাথা খুঁড়িয়া ঘা করিয়াছে; কিছুতেই সে বোট হইতে নড়িবে না। টাকাকড়িতে কিছু হইবে মনে হয় না। আমি ভারি বিরক্ত হইলাম। মনে ভাবিলাম যে, বোটে গিয়া মাগীকে দু'কথা শুনাইয়া দিয়া আসি।

অমৃত একটা উপায় বলিল। সধবা নারী লইয়া এ রকম কারবারে ফৌজদারীর হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা। এ স্থলে যদি স্ত্রীটিকে স্বামীর কাছে ফিরাইয়া দেওয়া যায়, তবে হাজার পাঁচ সাত, বড় জোর দশ হাজার টাকা হইলে, হয় তো মিস্সেকে মানাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। তা করিলে কোনও গোল থাকে না। তা ছাড়া, এ মেয়েকে সোণাগাছিতে লওয়া যাইবে না। লইতে গেলে সেখে এমন একটা হাঙ্গামা বাধাইবে যে, তাহা হইতে ছাড়ান পাওয়া দায় হইবে।

আমি অমৃতের নামে একখানা সাদা চেক লিখিয়া দিয়া, সে যাহা ভাল বুঝে, তাহাকে তাই করিতে বলিলাম। সে চলিয়া গেল। দিন দুই পরে ব্যাঙ্ক হইতে পাশ বই আনিলে দেখিলাম, সে চেক বাবদ দশ হাজার টাকা ভাঙ্গান হইয়া গিয়াছে। আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলাম।

কিন্তু সাত দিন বাদে আমার বাড়ী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইনস্পেক্টার, কনষ্টেবলে ভরিয়া গেল। সেই মেয়েটার স্বামী আমার নামে ফৌজদারীতে নানা রকম অভিযোগ করিয়া নালিশ করিয়াছে, যার বারো আনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তার অনিচ্ছায় আমি জোর করিয়া তাহাকে লইয়া, এক মাস কাল অবৈধ ভাবে আটক করিয়া রাখিয়া, তার লজ্জাশীলতার হানি করিয়াছি; এবং আরও গুরুতর অপরাধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু পারিয়া উঠি নাই—এই রকম তার আরজীতে লেখা ছিল। শুনিলাম সে মেয়েটা সেই মর্ম্মে সাক্ষ্য দিয়াছে।

আমি অবাক হইয়া গেলাম। হাজার টাকার জামিন লইয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে ছাড়িয়া গেলেন; আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। মাথার ভিতর ঘূর্ণাবর্ত্তের মত নানা কথা আমার চিত্তকে নির্ম্মম ভাবে কাটিয়া ছিঁড়িয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিল।

বৈকাল বেলায় নরেন্দ্র বাবু আসিলেন। তাঁকে দূর হইতে দেখিয়া আমি পলাইলাম। চাকর বলিল, আমি বাড়ী নাই। তিনি চলিয়া গেলেন। আমার বন্ধুবান্ধবের অন্ত নাই; অনেকে দেখা করিতে আসিল, আমি লুকাইয়া রহিলাম। শেষে স্থির করিলাম, সত্য-সত্য বাড়ী না ছাড়িলে, এদের সঙ্গে দেখা-শুনা এড়াইতে পারিব না।

তাই বাড়ী ছাড়িয়া গেলাম—কোথায় আর যাইব? নিভৃত বেশ্যাপল্লীতে আশ্রয় লইলাম।

আমার টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে, দেওয়ানকে টেলিগ্রাম করিলাম। তিনি উত্তরে লিখিলেন, এখন আর টাকা পাঠাইতে পারিবেন না। আমি মনোহর সার গদী হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়া আসিতে বলিলাম। দেওয়ানজী মোকদ্দমা মামলার তদ্বিরে দক্ষ বলিয়া তাঁহাকে আসিতে বলিলাম।

অমৃত আসিয়া সেই বেশ্যাবাড়ীতে সংবাদ দিল যে, আপোষে মামলা মিটাইবার বন্দোবস্ত সে করিয়াছে।

তারা কলিকাতায় একখানা বাড়ী চায়। আমি ধমক দিয়া তাহাকে তাড়াইলাম। কিন্তু বড় ভয় হইল। পরের দিন তাহাকে আবার ডাকাইলাম। অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম যে, যদি আর হাজার দশেক টাকায় মেটে, তবে চেষ্টা দেখিতে পারি। সে চলিয়া গেল, আমি সুরা ও নারীর হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া মনের জ্বালা ও আতঙ্ক নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

দেওয়ানজী পরের দিন টেলিগ্রাফ যোগে আমাকে বিশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিলেন, এবং পরের দিন বাকী টাকা লইয়া রওনা হইবেন লিখিলেন। টাকা হাতে আসিবার পরই অমৃত আসিয়া বলিল, পোনেরো হাজার টাকার কম কিছুতেই মানে না।

আমি বলিলাম, "এ টাকা কিন্তু আর নষ্ট করা চলবে না। তুমি আমার উকীলের কাছে নিয়ে যাও। তাঁর হাত দিয়ে, যাতে মোকদ্দমা উঠিয়ে নেয় তার বন্দোবস্ত পাকা করে, তবে টাকা দেবে।"

অমৃত সম্মত হইল। আমি উকীলের নামে একখানা চিঠি দিয়া, অমৃতের হাতে পনেরো হাজার টাকা দিয়া

দিলাম। তাহার পর হইতে অমৃতকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

দুই দিন পরে দেওয়ানজী আসিলেন। তিনি সমস্ত অবস্থা বুঝিয়া লইয়া, মোকদ্দমার তদ্বির ও সঙ্গে সঙ্গে আপোষের কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। আমার পক্ষে বিচক্ষণ উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইলেন।

আপোষ হইল। বাদী ভদ্রলোকটি দেখিলাম, বিলক্ষণ ব্যবসায়ী। প্রকাশ হইল যে, অমৃত যে পঁচিশ হাজার টাকা আমার নিকট হইতে লইয়াছিল, তার এক পয়সাও তাঁর হাতে পৌঁছায় নাই। বাদী বলিলেন যে, যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার পর আর তিনি তাঁর স্ত্রীকে ঘরে লইতে পারেন না। সুতরাং তাঁর স্ত্রীর ভার আমায় লইতে হইবে। তাহা ছাড়া তাঁহাকে যে পঁচিশ হাজার টাকা আমি দিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা দিতে হইবে। অনেক দর-কষাকষির পর পনেরো হাজার টাকায় রফা হইল। তাঁর স্ত্রী তাঁর ঘরেই রহিল। পরে তার কি হইল, সে খবর জানি না।

মোকদ্দমার দায় হইতে উদ্ধার পাইলাম বটে, কিন্তু আর ভদ্রসমাজে মুখ দেখাইবার পথ রহিল না। এ মোকদ্দমাটা লইয়া সহরে এত সোরগোল হইয়া পড়িল যে, আমার আর কারও সম্মুখে দাঁড়াইবার সাহস রহিল না। আমি কেবল পলাইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন অনেক বড়লোককে আমি জানি, যাঁরা এমন দুই-চারটা অপকার্য্য করিয়াও দিব্য নিঃসঙ্কোচে সমাজে মিশিয়া যান। আমি অনেক অপকর্ম্ম করিয়াছি, কিন্তু এমন দু-কাণ কাটা এখনো হইতে পারি নাই।

তাই ভদ্রসমাজ হইতে আমি সম্পূর্ণ ডুব মারিলাম। উঠিলাম গিয়া সহরের নিভৃত কোণে সেই সমাজে, যেখানে এসব ব্যাপারে কারো কোনও লজ্জা নাই। সেখানে আমার অনেক সঙ্গী জুটিল। মোসাহেব দালাল প্রভৃতি ছাড়া জুটিল কতকগুলি আমারই মত বড়লোকের ছেলে। তাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া নেশায় ও হল্লা করিয়া কোনও মতে দিনটা কাটাইয়া দিতাম।

কিন্তু, কি মদ, কি বেশ্যা, কোনও কিছুতেই আর আমার সুখ ছিল না। আর এই আমার নূতন সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ ও ফুর্ত্তি করা, ইহার ভিতর আমার অন্তরাত্মা যেন হাহাকার করিয়া উঠিত। আমার শিক্ষা ছিল উচ্চ অঙ্গের, আমার অভ্যাস দাঁড়াইয়াছিল নরেন্দ্র বাবু ও তাঁর পণ্ডিত বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায়। তার পাশে এই সব লোকদের সারশূন্য ইতর ভাষার ভিতর দিয়া প্রবাহিত অত্যন্ত হাল্কা ও নীচ ব্যবহারে আমার প্রাণ কোনও তৃপ্তি-লাভ করিত না। যে ভদ্রসমাজ আমার পক্ষে এমন একেবারে বন্ধ, তার আবহাওয়ার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্ করিত।

রমণীর কটাক্ষ আমাকে মুগ্ধ করিতে পারিত না, তার বিলাস-লাস্যে আমি প্রায় সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমার প্রাণের জ্বালায় এসব রস নিঃশেষে শুকাইয়া গিয়াছিল।

সুখশূন্য, আশাশূন্য হৃদয়ে আমি কেবল বিস্মৃতির সাধনা করিতাম। দিনরাত মদ খাইতে আরম্ভ করিলাম, হল্লার পর হল্লা খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলাম,—কোনও হট্টগোলের মাঝখানে আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিবার আশায়।

রাজ্যশ্রী

(বাণভট্ট-রচিত 'হর্ষচরিত' হইতে)

অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম-এ

তের শত বৎসর আগেকার কথা। রাজা প্রভাকর-বর্দ্ধন স্থাণ্বীশ্বরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। অশ্বিনীকুমারদ্বয় সদৃশ তাঁহার দুই পুত্র রাজ্যবর্দ্ধন, ও হর্ষবর্দ্ধন এবং লক্ষ্মী-স্বরূপিণী কন্যা রাজ্যশ্রী।

অসামান্য রূপবতী নানা-শিল্প-কলাকুশলা রাজ্যশ্রীকে যৌবনসন্ধিগতা দেখিয়া বৃদ্ধ রাজা তাহার বিবাহ চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। এক দিন রাণী যশোবতীকে আহ্বান করিয়া তিনি বলিলেন, রাণি, আমাদের মেয়ে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। কন্যা বয়স্থা হইলেই পিতামাতার চিন্তার কারণ হয়। বিবাহ দিয়া তাহাকে এইবার

পরের হাতে সঁপিয়া দিতে হইবে। বিচ্ছেদের এই বেদনার জন্যই লোকে কন্যা কামনা করে না। যাহাকে এত দিন এত আদরে এত যত্নে লালনপালন করিলাম, হায়, তাহাকে এই রূপে বিদায় দেওয়াই বিধাতার নিয়ম, এবং গৃহী-মাত্রকেই ইহা পালন করিতে হয়। এখন সদ্বংশজাত সৎপাত্রে কন্যা সমর্পণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

রাণী ইহা শুনিয়া বলিলেন, রাজন্, কন্যার মাতা ত তাহার ধাত্রীমাত্র; কিন্তু তাহা হইলেও পুত্রাপেক্ষা কন্যাই মাতার স্নেহ অধিক আকর্ষণ করিয়া থাকে। যোগ্য বরে আপনি কন্যা দান করিবেন, ইহাতে আমি আর কি বলিব?

পূর্ব্ব হইতেই অনেক রাজা ও রাজকুমার রাজ্যশ্রীর রূপগুণের কথা শুনিয়া বিবাহ-মানসে থানেশ্বরে দূত প্রেরণ করিতেছিলেন। ইহাদের মধ্যে মুখরবংশপ্রদীপ, শৈব-ধর্ম্মাবলম্বী কান্যকুব্জরাজ অবন্তীবর্ম্মার পুত্র গ্রহবর্ম্মাকেই রাজা স্বীয় কন্যার উপযুক্ত পাত্র মনোনীত করিয়া, তাঁহাদের দূতের সেই বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। দূত সেই আনন্দ-সংবাদ পাইয়া কান্যকুব্জাভিমুখে গমন করিল।

ইতিমধ্যে স্থাণ্বীশ্বরে রাজকন্যার বিবাহোৎসবের বিপুল আয়োজন আরব্ধ হইল। অসংখ্য হস্তীর বৃংহনে ও অশ্বের হ্রেষায় প্রাসাদপ্রাঙ্গণ নিরন্তর ধ্বনিত হইতে লাগিল। এদিকে কন্যার যৌতুকস্বরূপ প্রদত্ত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র এবং আম্র ও অশোকের পল্লবে সজ্জিত হইয়া রাজপ্রাসাদ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। নানা দেশ হইতে রাজন্যবর্গ-প্রেরিত বহুমূল্য উপঢৌকন-সম্ভার আসিতে লাগিল। অনেক রাজা নিজেরাই এক একটি কাজের ভার লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাদের সধবা পুরন্ধ্রীগণও দলে দলে আসিয়া নিজেদের নানা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই সকল সুবেশা, সুন্দরী, রাজান্তঃপুরিকাগণ সীমন্তে সিন্দুর ও পদদ্বয়ে অলক্ত ধারণ করিয়া তাঁহাদের রূপের ও সঙ্গীতের হিল্লোল তুলিয়া মূর্ত্তিমতী উৎসব-শোভা রূপে বিরাজ করিতেছিলেন। জ্যোতিষিগণ গণনা দ্বারা শুভলগ্ন নিরূপণে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রাসাদের বাহিরে, নগর মধ্যেও উৎসব আয়োজনের অন্ত ছিল না। এক দিকে জাফ্‌রানরঞ্জিত জলস্রোতে নগর-বাসী সকলে পীতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছিল; অপর দিকে কুম্ভীরমুখাকৃতি নল-মুখ হইতে সুরভিত জল-প্রবাহ নির্গত হইয়া উপবনসমূহের পুষ্করিণীগুলি পূর্ণ করিতেছিল। গীতবাদ্যে রাজপথসমূহ সর্ব্বদা মুখরিত হইতেছিল।

ক্রমে বিবাহ-দিন সমাগত হইল। প্রাতে বরপক্ষ-প্রেরিত পারিজাতক নামক তাম্বূলবাহক আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজার নিকট তাহাকে লইয়া যাওয়া হইলে, তিনি ভাবী জামাতা গ্রহবর্ম্মার কুশল প্রশ্ন করিলেন। সে রাজাকে দেখিয়া দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া আভূমি প্রণত হইল। তার পরে উঠিয়া বলিল, 'মহারাজ, তিনি ভাল আছেন এবং মহারাজের নিকট শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন প্রেরণ করিয়াছেন।' অতঃপর তাহার যথোচিত সৎকারের ব্যবস্থা হইল।

দিবা অবসান হইল। পূর্ব্বাকাশে চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বরের আগমনবার্ত্তা ঘোষিত হইল। অসংখ্য গজবাজিসমন্বিত এক বিরাট শোভাযাত্রা প্রাসাদাভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। একটি সুসজ্জিত মুক্তাশোভিতশীর্ষ হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বর আসিতেছিলেন। তাঁহার চারিদিকে নৃত্য-গীত-বাদ্য হইতেছিল। সুগন্ধি তৈলের দীপমালা উজ্জ্বল আলোকে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিতেছিল।

স্বজন-বন্ধু-পরিবৃত হইয়া বর ক্রমে প্রাসাদ-দ্বার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহার পুত্রদ্বয় ও বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। বর হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন, এবং রাজাও তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। অতঃপর তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া রাজা তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন, এবং স্বীয় সিংহাসন-তুল্য এক স্বর্ণখচিত আসনে তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন।

অবিলম্বে গম্ভীর নামক জনৈক রাজানুরক্ত ব্রাহ্মণ গ্রহবর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিলেন। সেই সময়ে জ্যোতিষিগণ আসিয়া রাজাকে কহিল, 'মহারাজ, লগ্নকাল উপস্থিত, বরকে ভিতরে আসিতে অনুমতি করুন।' রাজা অনুমতি প্রদান করিলে, গ্রহবর্ম্মা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে শত শত রমণীর ফুল্লোৎপলসদৃশ নয়ন হইতে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইতে লাগিল।

বিবাহ স্থলে নীত হইয়া তিনি বিবাহবেশে সজ্জিতা,

সখীজনপরিবৃতা, চন্দনচর্চ্চিতা, লজ্জারুণরাগরঞ্জিতা রাজ্যশ্রীকে দেখিতে পাইলেন। মৃদু মৃদু দীর্ঘশ্বাসে তাঁহার বক্ষ ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছিল, ভয়ে ও লজ্জায় তাঁহার দেহযষ্টি অল্প কাঁপিতেছিল। পুষ্প গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইতেছিল; মনে হইতেছিল যেন কুসুমভূষণা বসন্তরাণী আসিয়া সেখানে আবির্ভূতা হইয়াছেন।

স্ত্রী-আচার আরম্ভ হইল। রমণীগণ যাহা বলিতেছিলেন, বরকে তাহাই করিতে হইতেছিল। এই সময়ে তাঁহার বদনমণ্ডলে এক কৌতুকমিশ্রিত মৃদু হাস্যের তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছিল। তার পরে তিনি কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া অভ্যাগত রাজন্যবর্গবেষ্টিত, শ্বেতপুষ্পাস্তৃত বিবাহবেদিকার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার চারিদিকে অনেকগুলি মৃন্ময় মূর্ত্তি বিবিধ মাঙ্গলিক ফল ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান ছিল; একটির হস্তে পঞ্চপাত্র ছিল।

ব্রাহ্মণেরা হোমাগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিলেন। তৎসন্নিকটে কুশ, মৃগচর্ম্ম, ঘৃত, মাল্য ও সমিধ্ সজ্জিত ছিল, এবং অপর এক পার্শ্বে একটি ডালায় শমীপত্র মিশ্রিত আচার-লাজ রক্ষিত ছিল। বর কন্যা সহ অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন। সেই সময়ে অগ্নিতে লাজাঞ্জলি প্রদত্ত হইল। অগ্নি যেন কন্যার অনিন্দ্য মুখ দেখিবার আগ্রহে দক্ষিণাবর্ত্ত হইল। কন্যার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। পুরস্ত্রীগণও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

বিবাহ শেষ হইল। বরকন্যা গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া নির্দ্দিষ্ট শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

(২)

ইহার পর কয়েক বৎসর অতীত হইয়াছে। রাজা প্রভাকরবর্দ্ধন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, রাণী যশোবতীও সরস্বতী তীরে স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্দ্ধন তখন দূরে হূণদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত। এই নিদারুণ সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগে তাঁহার শোকাবেগ এত বেশী প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি কনিষ্ঠ হর্ষবর্দ্ধনের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া নিজে সন্ন্যাস গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কাহারও অনুনয় বিনয় তাঁহাকে এই সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিতে পারিল না। রাজপুরী মধ্যে আবার নূতন করিয়া বিষাদের ছায়া পতিত হইল। কিন্তু ঠিক এই সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল না।

যেদিন তিনি গৈরিক ধারণ করিয়া পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবেন, সেই দিন সম্বাদক নামে রাজকুমারী রাজ্যশ্রীর এক পুরাতন ভৃত্য উন্মত্তবৎ অবস্থায় রোদন করিতে করিতে প্রাসাদ মধ্যে, যেখানে রাজ্যবর্দ্ধন পরিজন-পরিবৃত হইয়া বেশ পরিবর্ত্তনের উদ্যোগ করিতেছিলেন, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য সকলে অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সে তখন বলিল যে, মহারাজের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র, পাপিষ্ঠ মালবরাজ রাজজামাতা গ্রহবর্ম্মাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিয়াছে, এবং রাজ্যশ্রীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কান্যকুব্জের কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অতঃপর সে না কি থানেশ্বর আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে।

এই নূতন আকস্মিক বিপদের প্রথম আঘাত সকলকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ভ্রাতৃদ্বয় অদম্য দুঃখে ও ক্রোধে যুগপৎ অধীর হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজ্যবর্দ্ধন ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিতে লাগিলেন,— নরাধম মালবের রাজ্য ছারখার করিয়া তার এই অত্যাচারের শাস্তি দেওয়াই আমার এখন প্রকৃত সন্ন্যাস গ্রহণ হইবে। কি! হরিণ হইয়া সিংহের সঙ্গে বিবাদ, ভেক হইয়া সর্পকে আঘাত, গো-বৎসের ব্যাঘ্রকে বন্দী করিতে সাহস, নির্ব্বিষ জলসর্পের কি না গরুড়ের কণ্ঠরোধে মানস! পিতার জন্য সকল শোক এখন আমার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়াছে। প্রতিহিংসার প্রবল বহ্নি আমার হৃদয়ে জ্বলিতে আরম্ভ হইয়াছে। কোন সামন্ত-রাজকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে না। একটিও হস্তী আমি চাই না। কেবল ভণ্ডী দশ সহস্র অশ্বারোহী সেনা লইয়া আমার সহগামী হইবে।' এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ যুদ্ধযাত্রার আদেশ দিলেন। তাঁহার মাতুলপুত্র এবং অন্যতম সেনাপতি ভণ্ডী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। হর্ষবর্দ্ধনও অগ্রজের পদতলে পতিত হইয়া তাঁহার সাথী হইতে প্রার্থনা করিলে,

রাজ্যবর্দ্ধন বলিলেন, 'এই ক্ষুদ্র শত্রুকে শাস্তি দিতে যদি তুমিও আমার সঙ্গে যোগ দাও, তাহা হইলে তাহাকে বড় বাড়াইয়া তোলা হইবে। মৃগবধের জন্য কি একটি সিংহই যথেষ্ট নহে? তুমি থাক। যখন সময় হইবে, তখন তুমি একাই দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, সকল রাজাকে জয় করিতে পারিবে।'

রাজ্যবর্দ্ধন সসৈন্যে চলিয়া গেলেন। কনিষ্ঠ হর্ষ রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক দিকে যেমন দুঃখের গুরুভার তাঁর হৃদয়কে পীড়িত করিতে লাগিল, অপর দিকে তেমনই আবার প্রতি দিন নানা অশুভ লক্ষণ দেখিয়া তিনি নূতন অমঙ্গলাশঙ্কায় কাতর হইয়া পড়িলেন। রাত্রে তিনি দুঃস্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, অর্দ্ধনিশি তাঁর বামচক্ষু স্পন্দিত হইতে লাগিল, সপ্তর্ষিমণ্ডলী হইতে ধূমরাশি নির্গত হইয়া নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল, প্রতি রজনীতে উল্কাবৃষ্টি হইতে লাগিল। হর্ষের মন হইতে সমস্ত শান্তি তিরোহিত হইয়া গেল!

এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে, এক দিন হর্ষ যখন সভামধ্যে বসিয়া আছেন, তখন কুন্তল নামক রাজ্যবর্দ্ধনের জনৈক সেনাপতি কয়েকজন মাত্র অনুচর সহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দেহ ধূলি-ধূসরিত, বদন বিমর্ষ, চক্ষু ভূমিসন্নদ্ধ। তাঁহাকে এইরূপ অবস্থায় আসিতে দেখিয়া হর্ষ ভীত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। সেনাপতি কুন্তল যে সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছিলেন তাহা এই—রাজ্যবর্দ্ধন মালবরাজকে অতি সহজে পরাভূত করিয়া, যখন ভগিনীর উদ্ধারসাধনে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন গৌড়পতি বন্ধুত্বের ছল করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক নিরস্ত্র অবস্থায় তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। (১)

এই ভীষণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া হর্ষের অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর হইল। দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গকারী শিবের ন্যায় তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন; জনমেজয়ের ন্যায় অরাতি-সর্পকুল ভস্ম করিবার জন্য অস্থির হইলেন, বৃকোদরের ন্যায় শত্রু-শোণিত পান করিবার জন্য তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'পাষণ্ড গৌড়রাজ ব্যতীত এইরূপ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড আর কাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে! কিন্তু সে কি মনে করিয়াছে যে, সে নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে কালাতিপাত করিবে? সে কি জানে না, ইহার জন্য তাহাকে কিরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে? কে আমার সঙ্গে এই পাপিষ্ঠকে শাস্তি দিবার জন্য যাইতে প্রস্তুত আছে?'

তখন সিংহনাদ নামক প্রবীণ যুদ্ধবিশারদ সেনাপতি তাঁহাকে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে উপদেশ দিলেন। হর্ষ তখন প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যদি নির্দ্দিষ্ট দিবসের মধ্যে গৌড়রাজকে শমন সদনে প্রেরণ ও তাহার পক্ষাবলম্বী রাজগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে না পারেন, তাহা হইলে অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজদেহ বিসর্জ্জন দিবেন। অতঃপর তিনি অবন্তী নামক যুদ্ধ-সচিবকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'এই রাজাজ্ঞা ঘোষিত হউক যে, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে পশ্চিমে যত মিত্র রাজা আছেন, তাঁহারা যেন আমার এই অভিযানে যোগদান করিতে তৎপর হন।'

সভাভঙ্গ করিয়া তিনি শয়নগৃহে গমন করিলেন, এবং একাকী শয্যায় শয়ন করিয়া শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। এতক্ষণ ক্রোধে তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন, এখন ভ্রাতার জন্য অবিরলধারে অশ্রুরাশি তাঁহার গণ্ডদ্বয় প্লাবিত করিতে লাগিল। কোনরূপে রজনী অতিবাহিত করিয়া তিনি ভোর হইতে না হইতেই হস্তিসেনানায়ক স্কন্দগুপ্তকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। এই ইন্দ্রতুল্য, মহাভুজ বীরপুরুষ অবিলম্বে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলে, হর্ষ তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনি ত আমার অগ্রজের হত্যা ও আমার প্রতিজ্ঞার কথা সমস্তই অবগত আছেন। সুতরাং হস্তিযূথসমূহ শীঘ্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করুন।' স্কন্দগুপ্ত সসম্ভ্রমে বলিলেন, 'রাজন্, সমস্তই আপনার আদেশ মত হইবে। আপনি যেভাবে শত্রুর দণ্ডবিধানে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা আপনার বংশেরই উপযুক্ত। আমি শুধু আপনাকে বলিতে চাই, আপনার অগ্রজের শোচনীয় পরিণাম হইতে এই শিক্ষা

(১) ইতিহাসে এই ব্যাপারটা ভিন্ন রূপ দেখিতে পাই। রাজ্যবর্দ্ধন যখন মালবরাজকে পরাজিত করিয়া কান্যকুব্জ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন মালবেশ্বরের মিত্র গৌড়াধিপ শশাঙ্ক বিপুল সৈন্য লইয়া তাঁহার গতিরোধ করেন। রাজ্যবর্দ্ধন তাঁহার হস্তে পরাস্ত ও বন্দী হইলেন। শশাঙ্ক তখন তাঁহাকে হত্যা করেন। ('গৌড়রাজমালা' দ্রষ্টব্য)। মতান্তরে, গৌড়রাজ একদা রাত্রিকালে অতর্কিতভাবে রাজ্যবর্দ্ধনের শিবিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন।

আপনি অবশ্যই লাভ করিয়াছেন যে, সকল বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক, নহিলে ঘোর অনর্থ উপস্থিত হয়।' এই বলিয়া তিনি ইতিহাস হইতে আরও অনেক উদাহরণ দিয়া তাঁহার উক্তির সত্যতা প্রতিপাদন করিলেন। তার পর তিনি রাজাদেশ পালন করিতে চলিয়া গেলেন।

অতঃপর জ্যোতিষিগণ-নির্দ্ধারিত শুভ দিনে রাজা হর্ষবর্দ্ধন স্নাত হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করিলেন, এবং প্রজ্বলিত অগ্নিতে ইন্ধন দিয়া আরাধনা করিলেন। অগ্নি দক্ষিণাবর্ত্ত হইয়া শুভ সূচনা করিল। ব্রাহ্মণদিগকে শত সহস্র স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র এবং অসংখ্য স্বর্ণভূষিত-শৃঙ্গ গাভী দান করিয়া তিনি ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত, শিরোদেশ শ্বেতপুষ্প-শোভিত, পরিধানে দুকূলবস্ত্র এবং দুকূলবস্ত্রেরই উত্তরীয় তাঁহার অঙ্গে শোভা পাইতেছিল। রাজপুরোহিত আসিয়া তাঁহার মস্তকে মাঙ্গলিক বারি সেচন করিলে, তাঁহার সহগামী রাজন্যবর্গকে নানা মণিমুক্তাদি অলঙ্কার বিতরণ করিয়া, এবং কারাবদ্ধ বন্দীদিগকে মুক্তি দিয়া তিনি প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন। তখন এক বিপুল জয়ধ্বনি আকাশ মার্গে উত্থিত হইল। সৈন্য সামন্তগণ পূর্ব্বেই অগ্রসর হইয়াছিল।

(৩)

রাজধানীর অনতিদূরে, সরস্বতীনদীর সন্নিকটে, একটি সুবৃহৎ শিবমন্দির ছিল। সেই মন্দির সম্মুখে বহু যোজন স্থান ব্যাপিয়া শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল। সেইখানে আসিয়া সকলে সমবেত হইল। সেই স্থান হইতে অভিযান শ্রেণী-বদ্ধ ভাবে অগ্রসর হইবে, স্থির হইয়াছিল। রাজা দিবাভাগ সেই স্থলে যাপন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে শত গ্রাম দান করিলেন। রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে তিনি যাত্রার আদেশ দিলেন। অমনি তূরী ভেরী পটহ নিনাদিত হইয়া উঠিল। লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ত্তিকা সেই স্থান দিনের ন্যায় আলোকিত করিয়া তুলিল। নিদ্রোত্থিত সেনানী ও সৈন্যগণ সুসজ্জিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে সমাসীন হইতে লাগিল। অতঃপর হস্ত্যশ্বরথসমন্বিত সেই বিশাল বাহিনী যাত্রা আরম্ভ করিল। ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল। কত গ্রাম, কত শস্যক্ষেত্র বিধ্বস্ত হইয়া যাইতে লাগিল।

যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া তিনি শিবির-সন্নিবেশ করিলেন। সেখানে অবস্থান কালে তিনি এক দিন শুনিলেন যে তাঁহার অগ্রজের সহগামী ভণ্ডী অদূরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এবং শীঘ্রই আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার ভ্রাতৃশোক আবার নূতন করিয়া উথলিয়া উঠিল। তার পরে যখন ভণ্ডী অতি দীনবেশে কয়েকজন মাত্র অনুচর সহিত তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলেন। শোকাবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে অশ্রু মুছিয়া রাজা ভণ্ডীকে ভ্রাতার মৃত্যুঘটিত ব্যাপার সবিশেষ বর্ণনা করিতে বলিলেন। ভণ্ডী অনু-পূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলে হর্ষবর্দ্ধন ভগিনী রাজ্যশ্রীর অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভণ্ডী কহিলেন, 'মহারাজ, আমি লোক-পরম্পরায় শ্রবণ করিলাম যে, মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধনের স্বর্গারোহণের পর যখন কান্যকুব্জ গুপ্ত নামক কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, তখন রাণী রাজ্যশ্রী কারাগার হইতে কোন রূপে নিজেকে মুক্ত করিয়া সানুচর বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। অনেক অনুসন্ধান হইতেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই।'

ইহা শুনিয়া হর্ষ কহিলেন, 'আমি নিজেই আমার ভগিনীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইব। এখন ইহাই আমার প্রথম কর্ত্তব্য। আপনি সৈন্য সামন্ত লইয়া গৌড়রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হউন।'

পরদিনই রাজা তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যগণ সহিত বিন্ধ্যাটবী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন, এবং অল্প দিনেই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অনুচরবর্গ চারিদিকে ছুটিল। বহুদিন ধরিয়া অন্বেষণ হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি ভগিনীর কোন সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে একজন ব্যাধের পরামর্শে তিনি দিবাকর মিত্র নামক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর আশ্রমে আসিয়া তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। যখন তিনি এই সন্ন্যাসীর নিকট রাজ্যশ্রীর নিরুদ্দেশ কাহিনী বিবৃত করিতেছিলেন, তখন দিবাকর মিত্রের জনৈক শিষ্য ব্যস্তসমস্ত ভাবে সেইখানে আসিয়া কহিলেন, 'আপনারা শীঘ্র একবার এদিকে আসুন। একজন রমণী অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন

দিতে যাইতেছেন। আপনারা তাঁহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করুন। তিনি উচ্চ কুলসম্ভূতা বলিয়া মনে হইতেছে। নানারূপ বিপৎপাতে তিনি শোকে-দুঃখে জ্ঞানশূন্য হইয়া মৃত্যু বরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার সখীগণ তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদেরই মধ্যে একজন আসিয়া আমাকে তাঁহাদের সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। আমি একা কিছু করিতে পারিব না মনে করিয়া আপনার কাছে আসিয়াছি।'

হর্ষবর্দ্ধন বুঝিতে পারিলেন, এই নারী তাঁহার ভগিনী রাজ্যশ্রী ব্যতীত আর কেহই নহে। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া সন্ন্যাসীদ্বয়ের সহিত যথাস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিছুদূর হইতেই তাঁহারা রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত বিলাপোক্তি শুনিতে পাইলেন। নিকটবর্ত্তী হইয়া হর্ষ-বর্দ্ধন অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভগিনীকে সম্বোধন করিলেন। রাজ্য-শ্রী তখন সখীকুটুম্বিনী-পরিবৃতা হইয়া প্রজ্বলিত চিতায় আত্মবিসর্জ্জন করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন, আর সকলে মিলিয়া বিলাপ করিতেছিলেন। ভ্রাতার আহ্বান তিনি শুনিতে পাইলেন না। তখন হর্ষবর্দ্ধন ভগিনীর হস্ত ধারণ করিয়া অগ্নির সান্নিধ্য হইতে তাঁহাকে অন্যত্র লইয়া গেলেন। তাঁহারা দুইজনে তখন এক বৃক্ষ-মূলে উপবিষ্ট হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে সন্ন্যাসিদ্বয়ও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী দিবাকর মিত্র এক অপূর্ব্ব মুক্তামালা রাজাকে উপহার দিলেন। তারার বিরহে কাতর হইয়া চন্দ্র যে সকল অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাই নাগরে পতিত হইয়া শুক্তি মধ্যে প্রবেশ করে এবং নাগরাজ বাসুকী সেই সকল মুক্তা সংগ্রহ করিয়া এই মুক্তামালা প্রস্তুত করেন। কালক্রমে নাগার্জ্জুন নামক সন্ন্যাসী কোন কারণে নাগগণ কর্ত্তৃক পাতালে নীত হন এবং বাসুকীর নিকট হইতে এই মুক্তামালাটি চাহিয়া লইয়া আসেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাঁহার বন্ধু সাতবাহনকে ইহা দান করেন। ক্রমে হস্তান্তরিত হইয়া ইহা দিবাকর মিত্রের নিকট আসিয়াছিল। ইহার গুণ এই যে, যে ইহা ধারণ করিবে, সে সকল দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া যাইবে। অতঃপর তিনি, মানব-জীবন যে কত দুঃখময়, তাহা তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া, তাঁহাদের এই দুঃখে সান্ত্বনার শান্তিবারি নিঃক্ষেপ করিলেন।

কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া রাজ্যশ্রী কহিলেন 'স্বামী ও পুত্রই নারীর অবলম্বন। আমার স্বামীও নাই, পুত্রও নাই, আমার জীবন ধারণ করা কেবল দুঃখের অনলে অহর্নিশি দগ্ধ হওয়া মাত্র। অতএব আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে অনুমতি দিন।' রাজা কহিলেন, 'আর কিছু দিন অপেক্ষা কর, আমরা দু'জনেই একসঙ্গে এই মহাজ্ঞানী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছি, তাহা আমাকে পালন করিতে হইবে গৌড়রাজকে পরাজিত করিয়া তাহার যথোচিত শাস্তি-বিধান করিতে হইবে। যত দিন না আমি এই কার্য্য সমাধা করিয়া ফিরিয়া আসি, তত দিন তুমি ইঁহার আশ্রমে অবস্থান কর।'

এই প্রস্তাবে সকলেই স্বীকৃত হইলে, তাঁহারা দিবাকর মিত্রের আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সূর্য্যদেব তখন অস্তাচলে গমন করিতেছিলেন।

* * * * * *

'হর্ষ চরিত' এইখানেই শেষ হইয়াছে। হর্ষবর্দ্ধনের চরিতাখ্যান হিসাবে ইহা অসম্পূর্ণ। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা এক অতি মূল্যবান্ গ্রন্থ। বাণভট্টের অপর পুস্তক কাদম্বরীর ন্যায় ইহা কাল্পনিক আখ্যায়িকা মাত্র নয়। ইহা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। শুধু তাহাই নয়। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা এই পুস্তক হইতে অতি সুন্দর রূপে জানিতে পারা যায়। সত্য বটে চীন পরিব্রাজক হুয়েন্ সাঙ্ও এই সময়ে ভারতে আসিয়াছিলেন এবং তিনি এই সময়কার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাহা বিদেশীর প্রদত্ত বিবরণ। বাণভট্ট হর্ষবর্দ্ধনের সভাসদ্ ও বন্ধু ছিলেন; সুতরাং তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি তাঁহার বর্ণনা হইতে আমরা তদানীন্তন ভারতের যথাযথ চিত্র চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাই। উপরে সঙ্কলিত রাজ্যশ্রীর বিবাহ-বর্ণনা ইহার উদাহরণ-স্থল।

দানের মর্য্যাদা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

সকাল বেলাই মনীশ ফিরিয়া আসিল। বেলা তখন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। বাড়ীর সকলকেই সে দেখিতে পাইল; দেখিল না কেবল উমাকে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, সে তখনও বিছানায় শুইয়া আছে।

উমা বগলাদেবীর গৃহে শয়ন করিত,—তাহার গৃহটা সে অন্য লোককে ছাড়িয়া দিয়াছিল। বগলাদেবী তখন মুহ্যমান ভাবে বারাণ্ডায় বসিয়া ছিলেন, কথাবার্ত্তা বলা তিনি প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। মনীশ তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিল, "উমা কি এখনও শুয়ে আছে ঠাকুর মা?"

বগলাদেবী শুধু ফেল ফেল করিয়া চাহিয়া রহিলেন, উত্তর দিলেন না। তাঁহাকে কথা বলা নিষ্ফল জানিয়া, মনীশ দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "উমা"—

"এস মনীশ-দা, দরজা ভেজানো আছে।"

দরজা ঠেলিয়া মনীশ গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, উমা বিছানায় পড়িয়া আছে, ছিন্ন লতাটীর মতই সে লুটাইয়া পড়িয়াছে।

মনীশ বলিল "এখনও ওঠনি যে উমা?"

উমা বলিল, "উঠতে পারলুম না মনীশদা, মাথা এত ভার হয়েছে যে তুলতে পারছিনে মোটে। বোধ হচ্ছে জ্বর হয়েছে, গাটাও তেমনি ব্যথা হয়েছে।"

মনীশ ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, উমার সুগৌর মুখখানা খুব লাল হইয়া উঠিয়াছে; তাহার চোখ দুইটাও যেন বড় ক্লান্তি ভরে মুদিয়া আসিতেছে। মনীশ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তা, তোমার জ্বর হওয়াটা বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা নয় তো উমা। শরীরকে তুমি বড় অবহেলা কর। এ শুধু আজ বলে নয়, বরাবর এমনি। এত দিন কাকা ছিলেন, তিনি নিজে তোমার ওপর দৃষ্টি রাখতেন, ঠাকুর মা আছেন, বটে, কিন্তু তিনি তো আর মানুষই নন, কি রকম হয়ে গেছেন, ডাকলেও আর সাড়া দেন না। তোমায় আর কে কি বলবে উমা?"

উমা শ্রান্ত চক্ষে চাহিয়া বলিল, "বলতে তুমি তো আছ মনীশদা।"

ব্যথার হাসি হাসিয়া মনীশ বলিল "আমি? আমি তোমায় কি বলছি উমা? আমি বাইরের তালে রয়েছি,—তোমার খাওয়া দাওয়ার কথাটা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করতে পারি নি আমি।"

উমা বলিল, "এবারে তো তোমার কাছেই যাব মনীশদা! আমায় তোমার কাছে গিয়েই থাকতে হবে। শ্রাদ্ধটা মিটে গেলেই আমি ভারি নিশ্চিন্ত হয়ে বেরুব। দেখো, তখন ঠিকমত শরীরটাকে যত্ন করতে পারি কি না। তখন তো দিনরাত তোমার চোখের ওপরেই থাকব,—দেখতে পাবে সব।"

বিস্মিত মনীশ বলিল, "আমার কাছে? কলকাতায় থাকতে যাবে তুমি উমা? কেন এখানে তুমি থাকবে না?"

যেন অশ্রু অতি কষ্টে সামলাইয়া উমা বলিল, "এখানে থাকবার অধিকার আমার আর কি আছে মনীশদা?"

মনীশ অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল, "নেই কি রকম? কাকা রীতিমত উইল করে তোমাকেই তো সব দিয়ে গেছেন, কাল পর্য্যন্ত তা শুনে গেছি, আজ আবার এ কি কথা বলছ উমা?"

উমা হাসিমুখে বলিল, "সত্যি কথা বলছি মনীশদা। আমি ঊষাদের সব দিয়ে দিলুম। আমি আজ ভিখারিণী, পরের দয়ার প্রত্যাশী। তবু—ওদের দেওয়া দানে আমি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইনে মনীশদা। আমি তোমার কাছে জোর করে তবু চাইতে পারি; কারণ, তোমার আমার মধ্যে আর কেউ এসে দাঁড়াতে পারে নি। আমরা যেমন ভাই-বোন, তেমনি ভাই-বোনই আছি। ছোটবেলায় আমরা যেমন ছিলুম—এখনও তেমনি আছি, বোধ হয় আজীবন কাল তেমনি থাকবও। কিন্তু ঊষা—মনীশদা, সেই কেবল আমার একেবারে পর হয়ে গেল। সে চিনলে কেবল অর্থকে,—তার দিদিকে সে চিনতে পারলে না।"

প্রবল দুঃখাবেগে উমার কণ্ঠ একেবারেই রুদ্ধ হইয়া গেল। মনীশ সন্দেহাকুল ভাবে বলিল, "তুমি কি করেছ উমা, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে।"

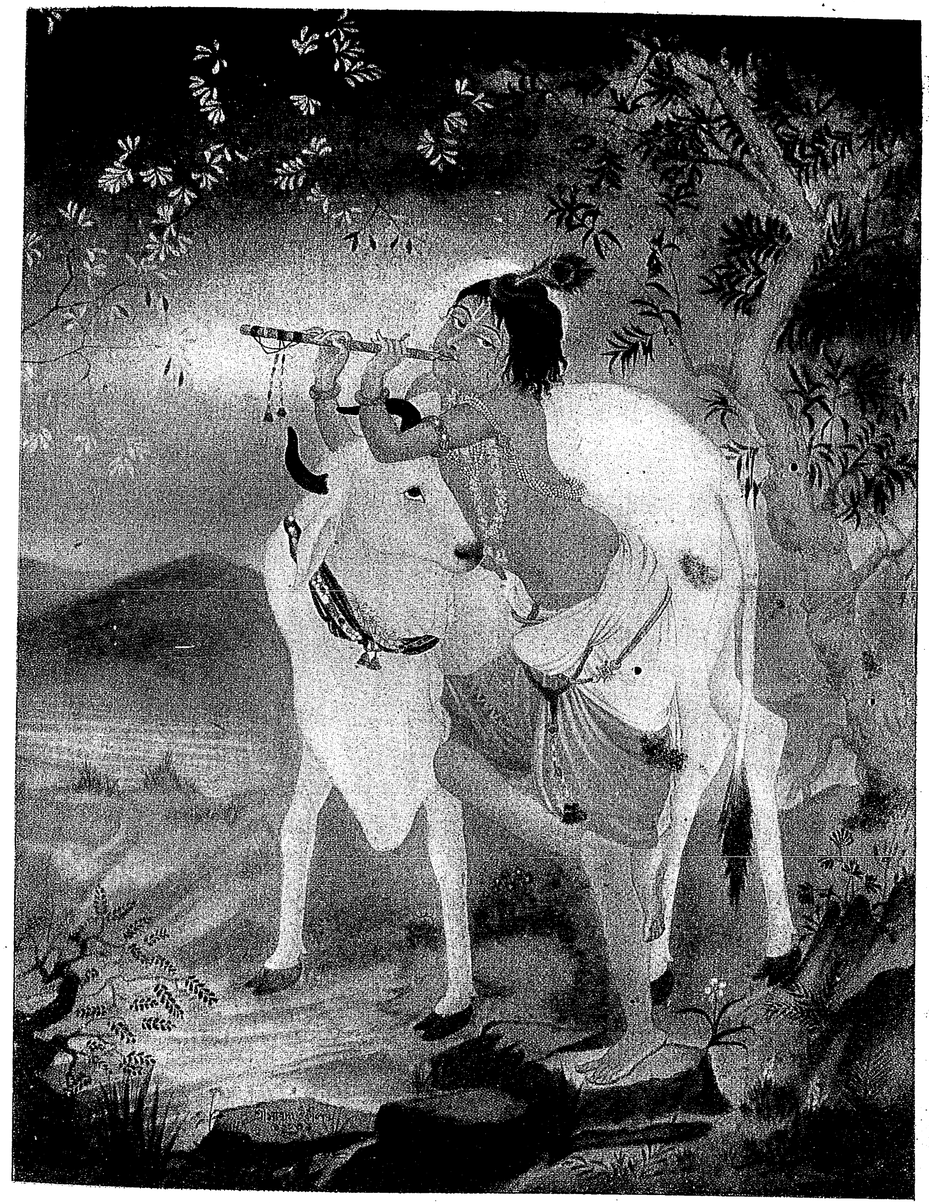

নীলকান্তমণি

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকীল

B. H. P. Works.

উমা বলিল, "আমি উইল ছিঁড়ে ফেলেছি মনীশদা, মৃন্ময়ের সামনেই তা দূর করেছি।"

"ছিঁড়ে ফেলেছ উমা! করলে কি! এমন করেও নিজের সর্ব্বনাশ করলে?" মনীশ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে উমার পানে চাহিল।

উমা শান্ত কণ্ঠে বলিল, "সর্ব্বনাশ কিসের মনীশদা? যার সর্ব্বস্ব গেল, তার আর বেশী কি সর্ব্বনাশ হতে পারে? যেদিন বাবা গেলেন—আমি জেনেছি, সেই দিনই আমার সব ফুরিয়ে গেল। আমার আর কিছুই তো নেই, মিথ্যে আমায় কেন জড়াতে চাচ্ছ মনীশদা? আমি আর কিছু চাই নে, আমায় আর তোমরা জড়িয়ো না, আমায় মুক্তি দাও, আমায় তোমার কাছে নিয়ে চল, এখানে—এদের দয়ার ওপরে আমায় ফেলে রেখে যেয়ো না।'

উমার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মনীশ বলিল "না উমা, তোমায় ফেলে যাব না। আমি যা পাব, তার অর্দ্ধেক তুমিও পাবে। যতক্ষণ আমি বেঁচে থাকব, ততক্ষণ তোমায় আমি কারও দয়ার ওপরে নির্ভর করতে দেব না। ভগবান যা ব্যবস্থা করেছেন, তা খণ্ডাতে কারুরই ক্ষমতা নেই, তা বেশ বুঝছি। একটা কথা আছে—মানুষ গড়ে, দেবতা ভাঙ্গে,—সেটা এখানে ঠিকই খেটে গেছে। এ বেশই হয়েছে উমা; তুমি সংসারে চির-অনাসক্তা, সংসারের ভাবনা তোমার মাথায় চাপানো ভগবানের অভিপ্রেত নয় বলেই, তিনি তোমার হাত হতে নিলেন। আমি তোমায় নিয়ে যাব, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

মৃন্ময়ের মুখখানা আজ বড় উজ্জ্বল, বড় দীপ্ত। মনীশ তাহার সেই আনন্দদীপ্ত মুখখানার পানে চাহিতেছিল, আর হৃদয়ের মধ্যে প্রবল জ্বালা অনুভব করিতেছিল।

এক সময়ে নির্জ্জনে পাইয়া সে মৃন্ময়কে ধরিল,—কথাটা বলিবার লোভ সম্বরণ করা তাহার পক্ষে বড় দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

"আচ্ছা মৃন্ময়, কাজটা তোমার ভাল হয়েছে বলে তুমি বিবেচনা করছ? এটা তোমার উচিত হয়েছে?"

চশমার মধ্য হইতে চক্ষু দুইটা কুঞ্চিত করিয়া, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মনীশের মুখের উপর ফেলিয়া মৃন্ময় বলিল, "কিসের কথা বলছ?"

মনীশ বলিল "মৃতের সম্মানটা যে তোমরা রাখলে না, এতে আমি বাস্তবিকই অত্যন্ত ব্যথা পেয়েছি মৃন্ময়। জীবিতের কথা ঠেলা যায়, কিন্তু মৃতের কথা অগ্রাহ্য করা যায় না বলেই আমার বিশ্বাস ছিল,—অন্ততঃ কোনও হৃদয়-বান লোক সেটা অগ্রাহ্য করতে পারে না। তুমি শিক্ষিত, সদ্বংশজাত,—কেমন করে সেটা অগ্রাহ্য করলে, তা আমি ভেবে পাচ্ছিনে। সংসারে স্বার্থটাই যে সবচেয়ে বেশী, তা আমি বেশ জানতে পেরেছি, নইলে কেউ এমন করে না।"

উদ্বেলিত ক্রোধ চাপিয়া মৃন্ময় বলিল, "অন্যায় আমি কিচ্ছু করি নি মনীশ, আমার যা ন্যায্য তাই আমি চেয়েছি। তোমার বোন যা করতেন, আমিও তাই কর্ব্ব, তবে এতে না ছেড়ে দেবার মানে কি? তিনি এখানে থাকুন, আমি রীতিমত তাঁর সব ভার নেব।"

বিদ্রূপের সুরে মনীশ বলিল, "তুমি, তোমার স্ত্রী কল-কাতায় থাকবে, আর উমা এখানে থাকবে দাসীর মত,—শুধু সে খেটে যাবে এই মাত্র। নিজের সংসারে নিজেই সে চোর হয়ে থাকবে,—একটা কাজ তোমাদের বিনানুমতিতে করতে পারবে না, একটা কথা পর্য্যন্ত বলতে পারবে না। এ রকম পরাধীনতার জীবন সংসারে কেউ যে প্রার্থনা করে না, তা তুমিও বেশ জানো মৃন্ময়।"

মৃন্ময় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "সত্য কথা বলছি আমি, শোন। উমা যুবতী, সুন্দরী, বিধবা,—হাতে থাকবে তার প্রচুর সম্পত্তি। সুতরাং তাকে বিপথগামিনী করবার লোকের অভাব হবে না। এত দিন বাপ ছিলেন, সে সদুপদেশই পেয়েছে। এখন সে সদুপদেশ পাবে না। চির দিন মানুষের মন কিছু পবিত্র থাকতে পারে না—বিশেষ এ রকম অবস্থায়। মাথার উপর একজন শক্ত অভিভাবক থাকবার দরকার, যে তাকে সম্পূর্ণ বশে রাখতে পারবে। উমার যা আছে—আর যা তার হাতে পড়ছিল—এর একটাও মানুষের চিত্ত স্থির রাখতে পারে না,—বিপথগামী করে ফেলে। আমি শুদ্ধ তাকে রক্ষা করবার জন্যে, তার প্রবল শত্রুকে নিজের কাছে রাখলুম।"

মনীশ তীব্র হাসিয়া বলিল, "ধন্যবাদ তোমায়! তোমার নিজের মনটাই কলুষিত; তাই তুমি এত সহজেই উমার পরিণামটা দেখতে পেয়েছ,—তাই নিজের হাতে তার পথটা

পরিষ্কার করে, তাকে সোজা পথে যাবার সাহায্য করলে। এটা বোধ হয় তোমার মনে নেই—শিশুকালেই মানুষের প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। সে ছোটবেলায় যে শিক্ষার ভিত্তি গড়ে তোলে, তার উপরে ভর দিয়েই তার সারাজীবনটা দাঁড়িয়ে থাকে। উমার শিক্ষা যে কি, তা তোমার মত বধির অন্ধের কাছে বলা নিষ্প্রয়োজন। উমার শুধু রূপই দেখে গেছ তুমি,—সে যে কি রূপ, তা তুমি যথার্থই অনুভব করতে পারবে না; কারণ বিশ্বজননীর মূর্ত্তি কখনও তুমি সরল চোখে দেখতে পাও নি। যদি সেই যথার্থ মাকে দেখতে, সে রূপ তোমার হৃদয়ে থাকত, তবেই তুমি, উমার রূপ যে কি, তা অনুভব করতে পারতে। তুমি অন্ধ—নইলে দেখতে পেলে না কেন? তোমার অন্তর জড়, নইলে তুমি ধারণা করতে পারলে না কেন? তুমি পশু, তাই তাকে স্বর্গীয় ভাবে দেখতে পাও নি, দেখেছ পার্থিব চোখে। যাই হোক, ধন্যবাদ তোমায়, তোমার দয়াকেও সহস্র ধন্যবাদ! যেহেতু, তার ভার তুমি নিতে চাচ্ছ। কিন্তু কে বলবে, তোমার এই দয়ার মূলে কোনও গোপনীয় উদ্দেশ্য জেগে নেই—তুমি তাকে নির্য্যাতন করতে পার না? আমি তোমার এ দয়া তোমাকেই ফিরিয়ে নিতে বলছি,—আমার আশ্রয় উমার জন্যে চির-উন্মুক্ত আছে,—আমার শ্রমলব্ধ উপার্জ্জনেই আমাদের বেশ চলে যাবে!"

মৃন্ময় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু সাহস করিয়া মনীশকে সে আর বিরক্ত করিতে পারিল না। মনীশের চেয়ে সে মনীশের কথাকে বড় ভয় করিত।

শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেল, মনীশ উমা ও বগলাদেবীকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

সজল-নয়না ঊষা আসিয়া উমার পায়ে প্রণতা হইয়া বলিল, "আমার ওপর রাগ করে চলে যাচ্ছ দিদি,—আর কখনও এখানে আসবে না?"

উমা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল "না ভাই, আর এখানে আসা হবে না। আর কি করতেই বা আসব ঊষা,—এ বাড়ী যে আমার কাছে শূন্য হয়ে গেছে। বাবা থাকতেন—তাই মনে হত, বাড়ী পূর্ণ হয়ে আছে। যেদিকে তাকাতুম—মনে হত সব সুন্দর, সব ভাল। আমার সবই স্বপ্ন হয়ে গেল ঊষা, এ স্বপ্নের দেশে এসে আর আমার কি হবে?"

আবেগে তাহার কণ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। ঊষার ছেলেকে কোলে টানিয়া লইয়া, তাহার ললাটে, গণ্ডে চুম্বন দিয়া উমা বলিল, "তোর ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি ঊষা—যেন যথার্থ এ মানুষ হতে পারে, যেন আমাদের ঠাকুর-বাড়ীতে আবার তেমনি জাঁকজমকের সঙ্গে পূজা হতে পারে। যদি তত দিন বেঁচে থাকি, আমার কাণে সে কথা গিয়ে পৌঁছাবামাত্র আসব, একবার এসে দেখে যাব, নইলে এই শেষ।"

ঠাকুরবাড়ী গিয়া সে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিল। দেবতা—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। এ যে তোমারই ইচ্ছা দয়াময়! তুমি করাইতেছ তবে তো আমরা করিতেছি; তোমার শক্তি না পাইলে আমরা কি করিয়া করিতাম? তুমি সামনে পথ দেখাইয়া চলিতেছ, আমরা চলিতেছি; নহিলে পথ যে দেখিতে পাই না। এখনও দীর্ঘ জীবন সম্মুখে পড়িয়া—পথ দেখাইয়ো ভগবান,—দেখিয়ো, যেন বিপথে না যাই।

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া উমা উঠিল।

সেই দিন সে বগলাদেবী ও মনীশের সহিত প্রসাদপুর ত্যাগ করিল।

(২৭)

গ্রীষ্মের ছুটিতে সতী বাড়ী আসিয়া ভাইয়ের কাছে সব কথাই শুনিতে পাইল। মৃন্ময় গর্ব্ব ভরে বলিল, "বুঝেছিস সতী, আমি বলে তাই আদায় করতে পেরেছি সব, অন্য কেউ হলে পারত না, সে কথা আমি খুব জোরের সঙ্গে বলতে পারি। মেয়েটার এত তেজ—সে আর কি বলব! কিছুতেই জমিদারী ছাড়ল না, বলে—আমার বাবা বলে গেছেন ঠাকুর-সেবা হবে না, তাঁর জমিদারীর উন্নতি হবে না। আঃ, কি জমিদারীর উন্নতি, আর কি ঠাকুর-সেবা! কতকগুলো ছোটলোক, ভদ্রলোক—এই তো প্রজা। এদের উন্নতি এরা নিজেরাই করুক। তাদের জন্যে টাকা ঢালতে যাই আমি! আর একটা মাটীর পুতুল—তার পূজোর জন্যে মাসে একশ হতে দুশো টাকা বন্দোবস্ত,—আবার তা ছাড়া বেশীও দিতে হয়। এই এতগুলো করে টাকা অনর্থক নষ্ট—সে আমার দ্বারা হবে না। আমি ও সব কিছু করব না। ঠাকুর অমনি থাকবে, সেই একটা পুতুল পূজোতে আমি অনর্থক এত টাকা নষ্ট করতে পারব না। আর প্রজার সঙ্গে জমিদারের সম্পর্ক খাজনা নিয়ে,—

দেখা শোনা করা যাবে সেই সময়ে, অন্য সময়ে আমি কারও নই।"

আগাগোড়া সব কথা শুনিয়া সতী হৃদয়ে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা পাইল—সংসারে এ কি উৎপীড়ন! পরস্পর পরস্পরকে জয় করিবার জন্য কেন বৃথা প্রয়াস করিতেছে? স্থায়ী যাহা নহে—তাহা পাইবার জন্য মানুষ কেন হাহাকার করিয়া মরে?

সতী ঊষার কাছে উমার কথা জিজ্ঞাসা করিল। ঊষা দারুণ অভিমানে বলিল, "দিদি এই এখানে মনীশদার বাড়ী এসে আছে। এই এক বছর হয়ে গেল,—একটী দিন আমাদের একটী খবর দেয় নি। মনীশদা আগে রোজই আসতেন, এই একটা বছর তিনিও আমাদের বাড়ী আসেন নি।"

আহা—উমা!

উমার মূর্ত্তিখানা সতীর চোখে স্পষ্ট রূপেই ফুটিয়া উঠিল। আহা, সে একসঙ্গেই সব হারাইল। সে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াছিল, স্বেচ্ছায় তাহা বিসর্জ্জন দিল। সংসারে তাহার কিছু ছিল না, তবু সবই তাহার ছিল। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার সব ঘুচিয়া গেল, সে নিজে আজ পরের দুয়ারে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়াছে!

সতী মনে মনে তাহাকে প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারিল না। সে তাহার হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ভগিনীপতি কিম্বা ভগিনীর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায় নাই,—সে মনীশের শরণাপন্ন হইয়াছে,—মনীশ তাহাকে আদরে নিজের গৃহে স্থান দিয়াছে। ধন্য মনীশ—সে যথার্থ মানুষের মতই কাজ করিয়াছে।

বাড়ীতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া সতী সে দিন সন্ধ্যার সময় গোপনে একেবারে মনীশের বাড়ী গিয়া উঠিল।

নীচে বাহিরের ঘরে মনীশ একখানা চেয়ারে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল। সতী ইতস্ততঃ না করিয়া সোজা সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

বিস্ময়ে কাগজ ফেলিয়া মনীশ বলিল, "এ কি, সতী?"

সতী তাহার পায়ের কাছে মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল, "হ্যাঁ, আমিই।"

মনীশ বিস্ময় প্রশমিত করিয়া বলিল, "আমি তো তোমায় ডাকি নি।"

সতী বলিল, "তুমি ডাক নি, কিন্তু আমি না ডাকতেই এসেছি; কারণ, এতে তোমার একারই কর্ত্তব্য নেই, আমারও কর্ত্তব্য আছে। দাদা যা করেছেন, তা আমি শুনেছি,—শুনে আমি তোমার কাছে এসেছি। তুমি একা ভার বইতে পারবে না, আমায় তার অংশ দাও।"

মনীশ নির্ব্বাক-প্রায় কণ্ঠে বলিল, "তুমি কি অংশ নেবে সতী?"

সতী নির্ভীক কণ্ঠে বলিল, "আমি উমাকে চাই, দেবে না কি?"

"তুমি উমাকে চাও?" মনীশ তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

সতী দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, আমি উমাকে চাই। দাদা তার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাকে পথের ভিখারিণী করেছে, আমি আমাকে দিয়ে তার সে অভাবটা পূর্ণ করব।"

মনিশ বলিল, "কিন্তু সতী—"

সে থামিয়া গেল। সতী বলিল, "থামলে কেন? আমায় সেই মৃন্ময়ের বোন বলে তুমি আমায় অবিশ্বাস করতে পার, কিন্তু তোমার বলে তুমি তো অবিশ্বাস করতে পার না। আমার এই বাহ্যিক দেহটা তাদের হতে পারে, কিন্তু অন্তরটা তো তোমারি। বাহ্যিক দেহ কারও অনিষ্ট করতে পারে না, যদি তার অন্তরটা না যোগ দেয়। অন্তরে তুমি রয়েছ,—তোমার যে প্রিয়, তার অনিষ্ট আমি করতে পারি, এই কি তুমি বিশ্বাস কর?"

মনীশ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না সতী, আমি অবিশ্বাস করছিনে। আমি বলছি, উমা তাদের দান নেবে না বলেই প্রতিজ্ঞা করেছে,—তোমায় সে গ্রহণ করবে কি? তোমাকেও সে তো তাদের জিনিস বলেই জানে,—আমার বলে তো জানে না।"

সতীর চোখ সজল হইয়া উঠিল, বলিল, "তুমি তা বলবে না?"

মনীশ বলিল, "কি করে বলব সতী,—আমার স্বর যে বন্ধ হয়ে যাবে!"

সতী তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, "না, তোমার তা বলতেই হবে,—না বললে কোন মতে চলবে না। আমার প্রকৃত পরিচয় তোমাকেই দিতে হবে। তাকে আমার চাই-ই, নইলে হবে না, আমি তোমার কাছে হতে

কখনই ফিরে যাব না। বল—বলবে তুমি, আমায় তাকে দেবে?"

মনীশ একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়াই চোখ নামাইল, "দেব, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। তুমি তোমার ত্যাগ দিয়ে আমায় জয় করেছ,—আমি তোমার কাছে অনেক দিন আগেই পরাজয় স্বীকার করেছি। উমাকে কোথাও রেখে আমার শান্তি নেই। আমার কাছে যে সে আছে, এতেও আমি শান্তি পাচ্ছি নে, দুর্ভাবনা আমায় শুষে রক্ত খাচ্ছে। কি জানি, যদিই সে সত্য কোনও ক্রমে বেরিয়ে পড়ে! তার সে আঘাতে উমা যে বিবর্ণ হয়ে যাবে,—সে ফুল শুকিয়ে ঝরে যাবে। যে উমা আমার এত প্রিয় ছিল, তাকেই আমি এখন সর্পের চেয়েও বেশী ভয় করি, তার সামনে যেতে আমার বুক কেঁপে ওঠে,—যদি প্রকাশ পায়,—যদি আমারই আঘাতে সে ঝরে যায়! আমি কোথাও তাকে নামাবার মত জায়গা পাচ্ছিনে,—যেখানে রেখে আমি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি।"

সতী গাঢ় স্বরে বলিল, "তাই তো আমিও এসেছি। তোমাকে আমি চিনি, তোমার কিছুই আমার কাছে গোপন নেই। পাছে তোমারই আঘাতে সে ঝরে যায়, তাই আমি এসেছি। তাকে আমি নিয়ে যাব, তোমায় রক্ষা করব, সংসারের আর একটা ভীষণ আঘাত হতে তাকেও রক্ষা করব। সে সংসারের সকলকেই চিনেছে, চেনেনি কেবল তোমায়। যদি তোমার বুকের এ গোপন কথা সে জানতে পারে,—সে ধরায় লুটিয়ে পড়বে, আর তাকে তোলা যাবে না।"

মনীশের মাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া রাজি করিয়া, সে উমাকে রাজি করিতে গেল।

কিন্তু উমা প্রবল বেগে মাথা নাড়িল, একটু হাসিয়া বলিল, "আর আমায় ও-সব ফেঁসাদে টেন না ভাই। লোকের মনের পরিচয় যত না পাওয়া যায় ততই ভাল। আমি মানুষ চিনবার প্রার্থনা করি নে, সংসার আমি যা দেখেছি, তাই আমার পক্ষে চরম দেখা হয়েছে। এখানে আমি বেশ শান্তিতে আছি, আমায় আর ও-সব ঝঞ্ঝাটে নিয়ে যেয়ো না। এ ভাই আমার আপনার লোক, তুমি তো ভাই—"

সে থামিয়া গেল, সতী হাসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "পর—কেমন? পর—কেন না আমি উমার ননদ, মৃন্ময়ের বোন। উমা, বাহির নিয়ে বিচার করতে যেয়ো না,—অন্তর নিয়ে বিচার করলে দেখতে পাবে, আমিও তোমার বড় আপনার। যেমন তোমার মনীশদা, আমিও তাই। মনীশদার কাছে থাকতে পার, আমার কাছে থাকতে পারবে না কেন? তাঁর অর্দ্ধেক শক্তি আমি পেয়েছি, তাঁর সেই শক্তির ওপরে নির্ভর করে আমি তোমায় রাখতে পারব,—সেই সাহসেই আমি এসেছি।"

অদূরে দণ্ডায়মান মনীশের পানে চাহিয়া সে হাসি-মুখে বলিল, "এস না তুমি, তুমি সাক্ষ্য না দিলে তোমার বোন যে মোটে বিশ্বাসই করতে চায় না আমাকে।"

বিস্ময়ে মনীশের পানে চোখ তুলিয়া চাহিয়া উমা বলিল, "মনীশদা—"

বিষণ্ণ কণ্ঠে মনীশ বলিল, "সত্য উমা।"

উমা মাথা নত করিল। যখন সে মাথা তুলিল, তখন তাহার মুখখানা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। সতীর গলা ধরিয়া সে বলিল, "আমি সব বুঝেছি সতী, আমায় আর কিছু বুঝাতে হবে না। আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি, কারণ, বাস্তবিকই তুমি মনীশদার শক্তি লাভ করেছ। আমি তোমার ওপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি; কারণ, তুমি তাদের নও, তুমি আমাদের। আমার আর কোন বাঁধন নেই, ঠাকুরমা ছিলেন, তিনিও চলে গেছেন। এখন আমায় যেখানে নিয়ে যাবে, আমি সেখানেই যাব।"

* * *

মনীশ ষ্টেশনে গিয়াছিল সতী ও উমাকে ট্রেণে উঠাইয়া দিতে। উমা তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর মনীশদা, আবার যখন ফিরব, তখন যেন তোমাদের এমনই দেখি।"

মনীশ হাসিল, আশীর্ব্বাদ করিল।

উমাকে উঠাইয়া দিয়া মনীশ সতীকে ডাকিল।

"জানে সতী, আমি আজ কি দিলুম তোমায়?"

তাহার কণ্ঠ তখন কম্পিত হইতেছিল।

সতী বলিল "জানি, আমায় এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার দানের মর্য্যাদা রাখতে পারি, হেলায় যেন এ রত্ন হারিয়ে ফেলি নে। আমার সর্ব্বস্ব তুমি, তোমার ধ্রুবতারা

উমা, সেই উমাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। তুমিও জানতে পারছ না—সে আমার কে? সে আমার উপাস্যের উপাস্য, আমার লক্ষের লক্ষ্য, আমার মহাসাধনার ধন। তুমি জানবে কি—আমি তাকে কতটা ভালবাসি, কতটা ভক্তি করি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি তাকে তোমার চেয়েও বেশী আদরে রাখব। তোমার গুপ্ত কথা প্রকাশের ভয় ছিল এখানে, আমার কাছে তা নেই। দাদার সঙ্গেও উমাকে নিয়ে কাল ঝগড়া হয়ে গেছে। দাদা আর এক দিন আমায় রেখে আমার প্রাপ্য এখানকার দুখানা বাড়ী আর তিন লাখ টাকা বুঝে নিতে বলেছিলেন,—আমি বলে এসেছি, আমি তাঁর এক পয়সাও চাই নে। আমার নিজের উপার্জ্জিত যা—আমি তাইতেই খুব খুসী হয়ে থাকব। আমি এই যাচ্ছি—কত কালে ফিরব, তার ঠিক নেই। যদি আমার বিশেষ দরকার পড়ে, তোমায় ডাকব, তুমি যাবে তো?"

রুদ্ধকণ্ঠে মনীশ বলিল, "যাব বৈকি সতী।"

"তবে যাই আমি।"

মনীশের পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া সতী উঠিয়া দাঁড়াইল, ধীরপদে গিয়া ট্রেণে উঠিল।

ধীরে ধীরে ট্রেণ চলিল। যতদূর দেখা যায়, সতী গবাক্ষ-পথে মুখ বাড়াইয়া ছিল,—তাহার পর আর দেখা গেল না।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মনীশ ক্লান্ত দেহে শ্রান্ত পদে বাড়ীর দিকে ফিরিল। তখন পথের ধারে একটা বাড়ীতে কে গাহিতেছিল—

চলিয়াছি গৃহপানে খেলাধূলা অবসান,
ডেকে লও, ডেকে লও, অতি শ্রান্ত মন প্রাণ॥

সমাপ্ত

দক্ষিণ জার্ম্মাণি

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ

(১)

ভারতকে পল্লীপ্রধান ও কৃষিপ্রধান দেশ বলা হইয়া থাকে। ভারতীয় পল্লীগুলা গুণতিতে সাত লাখ বিশ হাজার। ইয়োরোপের সকল দেশের পল্লী একত্র করিলে সংখ্যা সাত লাখ বিশ হাজারের কম হইবে কি না সন্দেহ।

জার্ম্মাণি বাংলা বিহারের চেয়ে কোনো মতেই কম পল্লী-প্রধান এবং কম কৃষি-প্রধান নয়। ব্যাভেরিয়া প্রদেশের লোক-সংখ্যা ষাট লাখ। এই জনপদের বড় শহর মিউনিকে মাত্র লাখ পাঁচেক লোক বাস করে,—আর লাণ্ড্‌সহুটের মতন শহরে পঁচিশ হাজারের বেশী নয়। ফ্রাইজিঙ্ শহরের লোক সংখ্যা হাজার দশেক মাত্র। এই সকল শহরকে বড় গোছের পল্লী বলা চলে,—বর্ত্তমান-জগৎসুলভ শহুরে মাপকাঠি অনুসারে।

লাণ্ড্‌সহুটের আশে-পাশে যে সকল পল্লী দেখিতেছি, তাহার কোনটায় একশ, কোনটায় দেড়শ বাসিন্দা। হাজার নরনারীর পল্লী, গঞ্জ, "মার্কট্" বা বাজার আঙুলে গুণা সম্ভব। অবশ্য ষ্টাটিষ্টিক্‌স্ করিয়া কথা বলিতেছি না। হাঁটিয়া চোখে দেখিয়া লোকজনের সঙ্গে আলোচনা করিয়া এইরূপই বুঝিতেছি।

প্রত্যেক পল্লীতেই আর কিছু থাক বা না থাক, একটা করিয়া গির্জ্জা আছেই আছে। আর পাঠশালাও কম-সে-কম একটা দেখিতে পাই। পাকা রাস্তা প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতেছি। তবে রোদে ধূলা আর জলে কাদা অনিবার্য্য। বস্তুতঃ বার্লিন, মিউনিক ইত্যাদি মহা-শহরগুলা ছাড়া অন্যত্র জার্ম্মাণরাও ধূলা কাদার সঙ্গে বসবাস করিতে অভ্যস্ত। লাণ্ড্‌সহুটে এই দুইয়ের উপদ্রব অত্যধিক।

(২)

ডোনডোফ পল্লীর "বুর্গারমাইষ্টার" (নগর-শাসক বা পল্লী-শাসক) অনেক পরিমাণ জমিজমার মালিক। ঢিঁপি সদৃশ পাহাড়ের পিঠে বেড়াইতে বেড়াইতে ইহাঁর ক্ষেতগুলা দেখিতেছি। ছেলেমেয়েরা সঙ্গে আছে।

কৃষাণ মহাশয় বলিতেছেনঃ—"আমি নেহাৎ আহাম্মুক। দেখিতেছেন এই পল্লীর প্রত্যেক কিষাণের ঘরই নয়া তাজা চক্‌চকে। একমাত্র আমার ঘরবাড়ী যন্ত্রপাতি সবই পুরানা ও সেকেলে। ইহারা বিগত মার্ক-পতনের যুগে

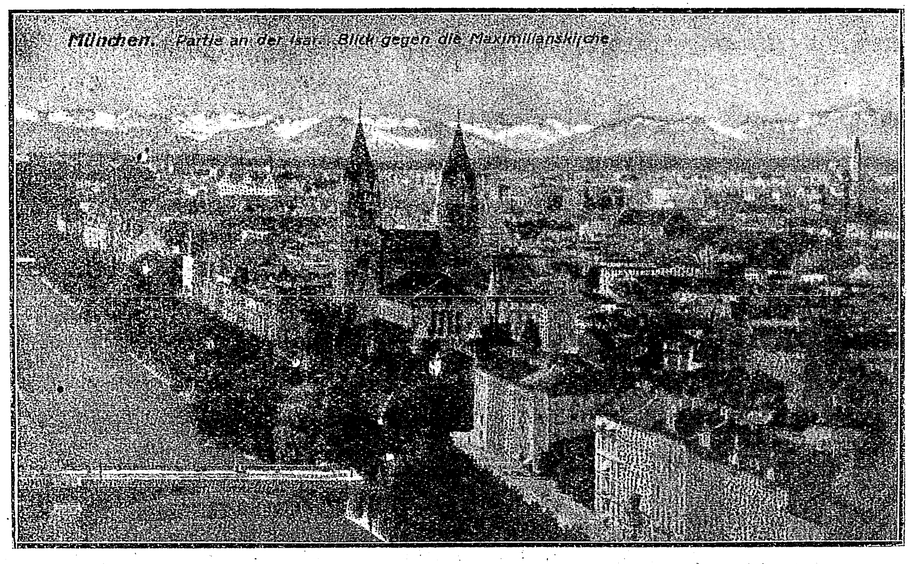

মিউনিকের এক দৃশ্য

টাকাগুলা এই সব নতুন বাস্তভিটায় ও আসবাব সরঞ্জামে খরচ করিয়া বাঁচিয়াছে। আমি বেকুবের মতন নগদ টাকা জমাইয়া 'ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ' হইয়াছি। টাকা-গুলা ত সবই পচিয়া গিয়াছে। বাড়ীঘরও আমার অতি কদর্য্য।"

এই পরিবারের সম্পত্তির পরিমাণ হইবে প্রায় ছয়শ' বিঘা। ইহার প্রায় এক চতুর্থ অংশ পড়ো। এখানে না চলে চাষ, না গোচারণ। অন্যান্য সমস্ত জমি চাষ করা হয় সপরিবারে, দশজনে মিলিয়া। দরকার হইলে কখনো কখনো একজন বা দুইজন মজুর নিয়োগ করা হয়।

(৩)

পঁচাত্তর আশী জন মাত্রের পল্লী। পুরুত ঠাকুর বলিলেনঃ—"স্বাস্থ্যের হিড়িকে পড়িয়া আমি পল্লীবাসী হইয়াছি। পূর্ব্বে আমার তাঁবে বড় বড় পল্লী বা মাঝারি গোছের শহরের গির্জ্জা শাসিত হইয়াছে।"

পুরুতঠাকুর মাত্রেই জার্ম্মাণিতে সরকারী চাকর। গবর্মেণ্টের দপ্তরখানা হইতে ইহাঁদের বেতন আসে। ডোনডোর্ফের পুরুত মহাশয় বলিলেনঃ—"আমার মন্দিরের দেবোত্তর আছে আঠার বিঘা জমি। এই জমির আয় আমার বেতনের এক অংশ।"

দেবোত্তরের জমিদারি জার্ম্মাণির কোথাও কোথাও এখনো কিছু কিছু আছে। তবে এই সবের প্রভাব আজকাল বড় একটা নাই। ১৭৯৯ সালের আইনে "সেকুলারিজাট্‌সিয়োন" ঘটিয়াছে। অর্থাৎ মোহন্তদের জমিজমা সরকারে বাজেআপ্ত হইয়াছে। তখন চলিতে-ছিল ইয়োরোপে ফরাসী-বিপ্লবের বোলশেহ্বিক তাণ্ডব।

পুরুতগিরি করা জার্ম্মাণিতে মুখের কথা নয়। কোনো মতে দু'একটা লাটিন মন্তর আওড়াইতে পারিলেই এই নকরি জুটে না। প্রথমতঃ প্রত্যেককে সাধারণ "গিমনাজিয়ুমে" নয় বৎসর পড়িয়া "বি-এ" পাশ করিতে হয়। আঠার উনিশ-বিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কেহ এই পরীক্ষায় পাশ হইতে পারে না। তাহার পর পাঁচ বৎসর ধরিয়া ধর্ম্ম-বিদ্যালয়ে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্ম-বিভাগে মামুলি ছাত্র-ছাত্রীদের মতন লেখাপড়া চালাইতে হয়। পঞ্চম বর্ষের শেষে পরীক্ষায় পাশ হইলে পুরুতগিরির কাজে "শাগ্‌রেতি" করিবার আইনতঃ অনুমতি জুটে।

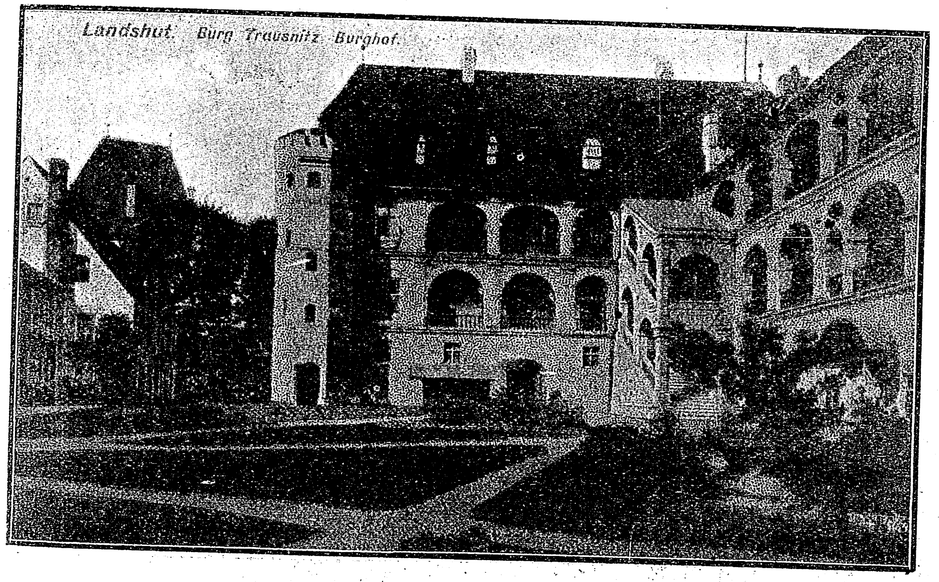

ট্রডিস্‌নিট্‌স দুর্গ (ল্যাণ্ডস্‌হুট)

কিন্তু কোনো গির্জ্জায় পূরাদস্তর পুরুতগিরি করা তাহার পরেও অনেক "সবুর-করা"র এবং ধৈর্য্য ধরার ফল।

ধর্ম্ম-বিদ্যালয়ে কি কি বিষয় পড়িতে হয়? পুরুত ঠাকুর বলিলেনঃ—"আমি ফ্রাইজিঙের গির্জ্জা বিদ্যালয়ে যেসব শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছি তাহার তালিকা দিতেছি। প্রথম বৎসর ধর্ম্ম সাহিত্যের গন্ধ মাত্র থাকে না। পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, আকরতত্ত্ব, জলবায়ুতত্ত্ব, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, জন্তু-বিজ্ঞান, নৃতত্ত্বইত্যাদি সকল প্রকার প্রকৃতিবিদ্যা লইয়া এক বৎসর ঘাঁটাঘাঁটি করিতে হয়। তাহার পরের বৎসর দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস প্রধান ভাবে আলোচ্য বিষয় থাকে। প্রাচীন গ্রীস হইতে আধুনিক ইয়োরোপ পর্য্যন্ত কোনো দেশ এবং কোনো যুগই বাদ যায় না। তাহার পর তিন বৎসর খৃষ্টানদের ধর্ম্মসাহিত্য, ধর্ম্ম-শিল্প, দার্শনিক তত্ত্ব, ধর্ম্মের ইতিহাস, ধর্ম্ম-ঘটিত আইন, সমাজ-ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়।"

জার্ম্মাণদের এই "পুরোহিত-সর্ব্বস্ব" সম্বন্ধে ভারতীয় পুরুতঠাকুরেরা কি বলিবেন? খৃষ্টধর্ম্ম বিষয়ক দর্শন বলিলে রোমাণ ক্যাথলিকরা টোমাস আকিনাসের মতামত বুঝিয়া থাকে। টোমাস দ্বাদশ শতাব্দীর ইতালিয়ান সাধু। স্মার্ত্ত শঙ্করাচার্য্যের নাম উচ্চারিত হইলে বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজে যে ধারণা জন্মে, রোমাণ ক্যাথলিক সমাজে টোমাসের প্রভাব সেইরূপ। কবিবর দান্তের সাহিত্যে টোমাসের ধর্ম্মব্যাখ্যা বড় ঠাঁই পাইয়াছিল।

(৪)

আয়ুর্ব্বেদ এবং য়ূনানি মতের চিকিৎসকেরা জার্ম্মাণিতে, অষ্ট্রীয়ায় এবং সুইট্‌সার্লাণ্ডে নিজ নিজ জুড়িদার অনেক পাইবেন। এসকল দেশে ঐ ধরণের চিকিৎসাকে "প্রাকৃতিক চিকিৎসা"—"নাটুর হাইল"

বলে। কবিরাজ, বৈদ্য বা হাকিম মহাশয়েরা "নাটুর হাইল চুণ্ডিগার" অর্থাৎ প্রকৃতি-চিকিৎসাবিৎ নামে পরিচিত।

নয়মার্ক্‌ট শহরে বা পল্লীতে চার্মাক নামে একজন কবিরাজের পসার খুব বেশী। প্রকাণ্ড দুর্গ সদৃশ নবাবী প্রাসাদে ইহাঁর বসবাস। বৈঠকখানায় লোকের ভিড় যৎপরোনাস্তি। চার্মাক বলিতেছেন ঃ—"যেষামন্যা গতি-র্নাস্তি তারা আসে আমার নিকট। অর্থাৎ নামজাদা পাশ-করা ডাক্তার এবং অস্ত্রচিকিৎসকেরা যখন জবাব দেন, তখন রোগীরা শরণাপন্ন হয় আমার। যমের দুয়ার হইতে রোগীদিগকে জীবনে ফিরাইয়া আনা আমার ব্যবসা।"

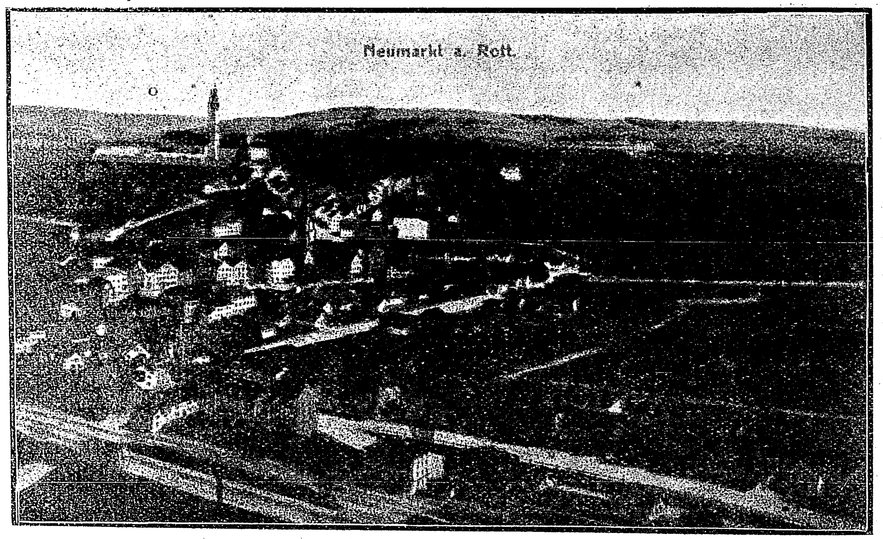

"ঝাড়া, ফুঁকা," "তুক-মুক" ইত্যাদি কিছু দেখিতেছি না। নাড়ী টেপাটিপিও নাই। চোখের রং দেখিয়া ইনি বলিয়া দেন, কবে কোথায় কোন্ হাড়-মাসে কিরূপ দরদ হইয়াছিল। ইহাঁর দ্বিতীয় কৌশল মূত্র পরীক্ষা। ব্যস্। তাহার পরেই অমুক শিকড়, অমুক পাতা, অমুক ফুল ইত্যাদির "টে", কাৎ, বা চা। এক কথায় পাঁচন।

নয় মার্ক্‌ট্ পল্লী

পাশ-করা ডাক্তাররা পায় ত চার্মাককে গিলিয়া খায়। তাহাদের ভাত মারা যাইতেছে যে!

(৫)

দারিদ্র্য কাহাকে বলে, জার্ম্মাণ সমাজে কেহ জানে না। এ দেশের "ফোল্‌ক্‌সশুলে" অর্থাৎ অবৈতনিক প্রাথমিক পাঠশালার শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীদের মাসিক বেতন কম-সে-কম ২৪০ মার্ক (১৮০৲)! এই সকল পাঠশালায় জার্ম্মাণির প্রত্যেক শিশু লেখাপড়া শিখিতে বাধ্য। এই ইস্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাশ হইলে আমাদের ম্যাট্রি-কুলেশুনের সমান পরীক্ষা দেওয়া হয়। বাংলাদেশের ম্যাট্রিকুলেশ্যান ইস্কুলের মাষ্টারদের ভিতর কয়জনে মাস মাস ১৮০৲ পাইয়া থাকেন? জর্ম্মাণির শিক্ষাবিভাগে ইহাই নিম্নতম মাহিয়ানা।

এই সকল ইস্কুলের মাষ্টার হয় কাহারা? "ম্যাট্রি-কুলেশ্যান" পাশ করার পর তিন বৎসর এক নিম্নস্তরের শিক্ষক-বিদ্যালয়ে পড়িতে হয়। তাহার পর আর তিন বৎসর পড়িতে হয় উচ্চতর শিক্ষক-বিদ্যালয়ে। এই ছয় বৎসরের বিদ্যা শেষ হইলে,—অর্থাৎ মোটের উপর আমাদের এম-এ, এম-এস্‌সি বিদ্যার অধিকারী হইলে,

লোকেরা প্রাথমিক বিদ্যাপীঠে মাষ্টারি করিবার সুযোগ পায়। এক কথায় বুঝিতে হইবে,—জার্ম্মাণির প্রত্যেক এণ্ট্র্যান্স ইস্কুলের প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী অন্ততঃ পক্ষে এম-এ, এম-এস্‌সি পাশ। আর ইহাদের কেহই ১৮০৲এর কম দরমাহা পায় না।

ইস্কুলমাষ্টারিই হউক অথবা পুরুতগিরিই হউক কিম্বা রেলওয়েতে কেরাণীগিরিই হউক,—প্রত্যেক চাকরি জার্ম্মাণিতে বেতন হিসাবে সমান। বেতনের সিঁড়ি বার বা তের ধাপে বিভক্ত। ২৪০ মার্ক বা ১৮০৲এর ধাপটা সপ্তম ধাপ। কর্ম্মচারীরা, মাষ্টাররা, কেরাণীরা সকলেই নিজ নিজ বিদ্যা অনুসারে যথানির্দ্দিষ্ট ধাপে ঠাঁই পায়। তাহার পর অভিজ্ঞতা এবং কর্ম্মদক্ষতা মাফিক ধাপের পর ধাপ উন্নতি এবং সঙ্গে সঙ্গে বেতন বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে। অষ্টম ধাপের বেতন ৪০০ মার্ক বা ৩০০৲। নবম ধাপের বেতন ৪৫০ মার্ক বা ৩৩৬৲ ইত্যাদি।

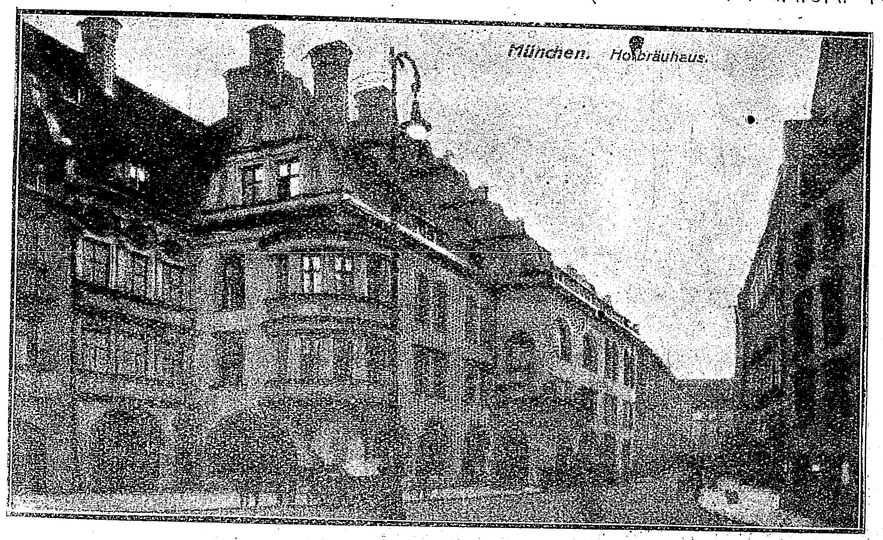

একদম সর্ব্বনিম্ন বা প্রথম ধাপের বেতন ১০০ মার্ক বা ৭৫৲ অর্থাৎ মাসে পঁচাত্তোর টাকার কমে জার্ম্মাণিতে কেহই নকরি করে না। তবে এত কম মাহিয়ানার লোক জার্ম্মাণ সমাজে আছে কি না সন্দেহ, বোধ হয় ঝাড়ুদার ইত্যাদির বেতন এইরূপ।

হোফব্রয় হাউস বা বিয়ার ভবন (মিউনিক)

(৬)

রেল আফিসের এক বাবু গিমনাজিয়ুমে বি-এ পাশ করিয়া চাকরিতে ঢুকিয়াছিলেন। বি-এ পাশ করিলেই চাকরি জুটে, এরূপ বিশ্বাস করা ভুল। প্রত্যেক চাকরির জন্য উমেদারকে স্বতন্ত্র ভাবে নতুন বিদ্যা শিখিতে হয়। রেল, তার, ডাক, খাজনা, তথ্যতালিকা, আদালত ইত্যাদি প্রত্যেক কর্ম্মকেন্দ্রের জন্যই "টেক্‌-নিক্যাল" বা "কত ধানে কত চাল" বিদ্যা আয়ত্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বি-এ পাশের জোরে জার্ম্মাণিতে কেরাণী-গিরি জুটে না। যেদেশে রামাশ্যামা সকলেই বি-এ, বি-এসসি সে দেশে এই সকল পাশের কিম্মৎ কিছুই না।

কেরাণী মহাশয় বলিলেন ঃ—"আঠার ঊনিশ বৎসর বয়সে বি-এ পাশ করি। তাহার পর এক বৎসর মিউনিকের সরকারী কেরাণী বিদ্যালয়ে চোপর দিনরাত গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া আফিস-বিজ্ঞান শিখি। এই সময়ে খোরপোষের জন্য ৭০।৮০ মার্ক করিয়া পাইতাম। তাহার পর পাঁচ বৎসর প্রাকৃটিকাণ্ট অর্থাৎ অ্যাপ্রেণ্টিস রূপে কাজ। এই পাঁচ বৎসর আমাকে সপ্তমধাপের লোক বিবেচনা করা হইত। কিন্তু বেতন দেওয়া হইত

সপ্তম ধাপের ন্যায্য বেতনের বার আনা মাত্র। অর্থাৎ ২৪০ মার্কের ঠাঁইয়ে আমার জুটিত মাস ১৮০ মার্ক বা ১৩৫৲। শেষ পর্য্যন্ত পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর বয়সে পাকা চাকরি জুটিয়াছে। তখন আমার ধাপ ছিল অষ্টম,—৪০০ মার্ক বা ৩০০৲ মাহিয়ানা।"

দেখা যাইতেছে পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর বয়সের যুবা

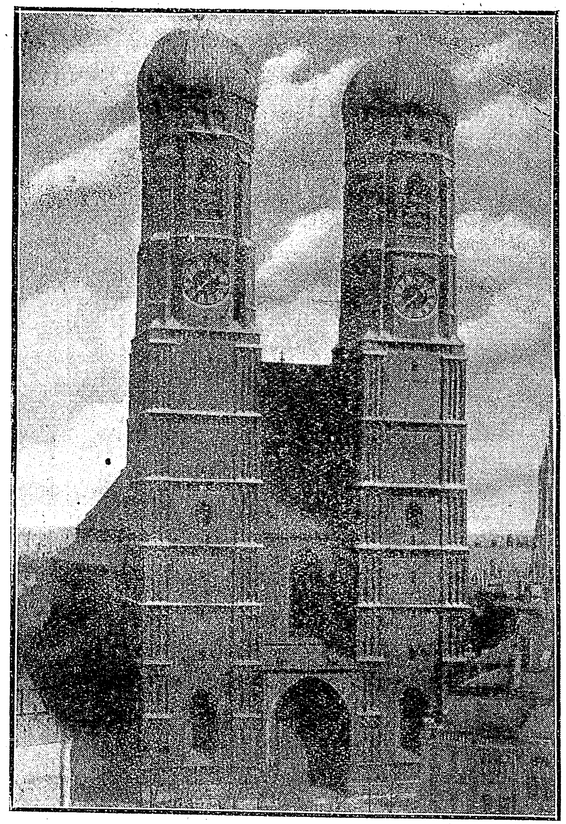

ফ্রাওয়েন কির্চ্চে মন্দির (মিউনিক)

কাজে "পূরাদস্তুর" বাহাল হইবা মাত্র ৩০০৲ বেতন পায়। কাজেই দারিদ্র্য কাহাকে বলে জার্ম্মাণরা জানিবে কোথা হইতে?

রেল-বাবু বলিতেছেন ঃ—"প্রত্যেক ধাপে প্রায় দশ বৎসর করিয়া কাটিয়াছে। আজ দশম ধাপে রহিয়াছি,—বয়স প্রায় বায়ান্ন,—বেতন ৫০০ মার্ক বা ৩৭৫৲। পঁয়শট্টি বৎসর বয়সে পেন্‌শুন পাইব। তখন বেতন হইবে ৫৫০ মার্ক বা ৪২০৲।"

প্রশিয়ায় লোকেরা পেন্‌শুন পায় ষাট বৎসর বয়সে। ব্যাহ্বেরিয়ায় পেন্‌শুনের বয়স পঁয়ষট্টি।

চাকরি সম্বন্ধে আর একটা কথা বলা দরকার। প্রত্যেক কর্ম্মচারী বিবাহিত হইবামাত্র স্ত্রীর জন্য আলগা মাসিক ১২ মার্ক বা ৯৲ পায়। সন্তান জন্মিবামাত্র প্রত্যেকের বাবদ জুটে আলগা মাসিক ১৫ মার্ক বা ১২৲। সন্তানদের একুশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কর্ম্মচারীরা এই সন্তান-বৃত্তি ভোগ করিয়া থাকে।

(৭)

এণ্ট্র্যান্স বা ম্যাট্রিকুলেশ্যনের পর ছয় বৎসর শিক্ষক-বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করিয়া প্রাথমিক পাঠশালায় মাষ্টারি করিতে গেলে বেতন জুটে কম-সে-কম ১৮০৲। বি-এ, বি-এসসি বিদ্যা লইয়া বৎসর ছয়েক কেরাণীগিরিতে শাগ্‌রেদি করিবার পর পাকা নকরি পাইলে ৩০০৲ মাসিক দরমাহা জুটে।

এইবার দেখা যাক,—বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম পরীক্ষায় পাশ হইলে,—অর্থাৎ পিএইচ্‌-ডি বা ডক্‌টর উপাধি থাকিলে বেতন জুটে কত? আমার গৃহস্বামী, পোষ্ট ইন্‌স্পেক্‌টর বাবু না ভাবিয়া চিন্তিয়া সোজা বলিলেন ঃ— "দশম ধাপ—৫০০ মার্ক বা ৩৭৫৲।"

মাসিক ৩৭৫৲ পায় জার্ম্মাণিতে কিরূপ লোক? এদেশের "গিমনাজিয়ুম" এবং "রে আল শুলে" নামক দুই শ্রেণীর মধ্যবিদ্যালয়ের প্রত্যেক মাষ্টারই ডক্‌টর অর্থাৎ দশমধাপের কর্ম্মচারী। এই দুই স্কুল হইতে আঠার উনিশ বৎসর বয়সে বি-এ, বি-এসসি বাহির হয়।

স্ত্রী-বৃত্তি এবং সন্তান-বৃত্তি বেতনের প্রত্যেক ধাপেই জাতি-বিদ্যা-বয়স-নির্ব্বিশেষে জুড়িয়া দিতে হইবে বলা বাহুল্য। ইহার নাম জার্ম্মাণসমাজ। এই সমাজের সঙ্গে টক্কর দেওয়া সোজা কথা নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা কত করিয়া পায়? ইঁহারা দ্বাদশ ধাপের কর্ম্মচারী। দরমাহা ৭০০ মার্ক বা ৫২৫৲। ইহার কম কোনো অধ্যাপক পায় না। এইখানে আর একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। জার্ম্মাণিতে ছাত্রদত্ত বেতন সমূহ প্রায় সবই অধ্যাপকদের প্রাপ্য। এই প্রাপ্যটা "উপরি" অর্থাৎ সরকারী ৫২৫৲ টাকার অতিরিক্ত। যাহার ক্লাশে যত বেশী ছাত্র, তাহার কপালে টাকা তত বেশী। পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, দর্শন, ধনবিজ্ঞান, সাহিত্য, ইত্যাদি বিদ্যা শিখিবার ছাত্রছাত্রী অগণিত। কাজেই এই সকল বিদ্যার অধ্যাপকদের "পায়া" খুব ভারি।

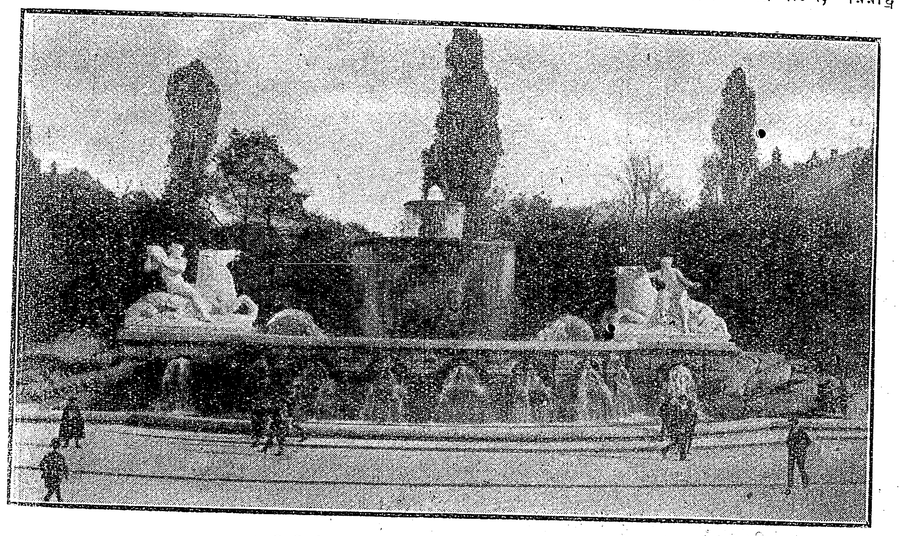

বাস্তুশিল্পী হিল্ডেব্রাণ্ডের গড়া ফোয়ারা (মিউনিক)

ইহাঁরা "লক্ষপতি"। আবার এমন অনেক বিদ্যা আছে, যার জন্য ছাত্রছাত্রী জুটেই না। এই সব বিদ্যার অধ্যাপকরা বাঁধা ৫২৫৲ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য।

"গিমনাজিয়ুম," ও "রে আল শুলে" ইস্কুলগুলার প্রিন্সিপাল বা হেড মাষ্টারদের পদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সমান। মাসিক ৫২৫৲ বেতন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ্‌-ডি পাশের পর আর একটা পরীক্ষা দিলে "প্রিফাট ডোৎসেন্ট" বা সহকারী-অধ্যাপক হওয়া যায়। এই পদের ধাপ একাদশ,—বেতন ৪২০৲।

(৮)

জার্ম্মাণ নরনারীর আর্থিক অবস্থার আলোচনা করিতে গিয়া একটা মস্ত তথ্য নজরে আসিয়াছে। এদেশে ত্রয়োদশ ধাপই বেতনের সর্ব্বোচ্চ ধাপ। সেই ধাপে উঠিলে কর্ম্মচারী, কেরাণী, মাষ্টার, পুরুতঠাকুর সকলেই মাত্র ৮০০ মার্ক বা ৬০০৲ মাসিক পায়। অর্থাৎ ৬০০ টাকার বেশী বেতন জার্ম্মাণ সমাজে জানা নাই। এ এক অপূর্ব্ব আইন।

পোষ্ট ইন্‌স্পেক্‌টারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ— "তাহা হইলে যে সব লোক সমর-সচিব, পররাষ্ট্র-সচিব ইত্যাদির পদে মন্ত্রীগিরি করে তাহাদের বেতন কত?" জবাব ঃ—"মন্ত্রীদের পদ বেতনের সিঁড়ির অন্তর্গত নয়। কেন না তাহাদের সংখ্যা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়। মন্ত্রীরা মাসে হাজার দুই মার্ক অর্থাৎ ১৫০০৲ বেতন পায়। তবে ইহাদিগকে ঠাট বজায় রাখিবার জন্য ঘরবাড়ী, আসবাব, সরঞ্জাম ইত্যাদি সরকার হইতে দেওয়া হয়। বস্তুতঃ সরকারী ইমারতগুলা সবই যথারীতি ফিট ফাট সাজানো থাকে। যেই কোন ব্যক্তি কোন দপ্তরের সচিব বাহাল হয়, তখন সে যথানির্দ্দিষ্ট ইমারতের বাসিন্দা হইতে অধিকারী। কিন্তু মাসিক দরমাহা তাহার ১৫০০৲।"

অতএব জার্ম্মাণ সমাজের প্রথম আর্থিক কথা,—**প্রাথমিক** পাঠশালার মাষ্টারেরা পায় ১৮০৲ মাস। **দ্বিতীয়** কথা ৬০০৲ এর বেশী বেতন পায় না চরমতম **শিক্ষিত** লোকেরাও। আর তৃতীয় কথা,—এ দেশে **যাহারা** রাজ্য চালায়, পল্টন চালায়, আইন চালায় **তাহাদের** মাহিয়ানা ১৫০০৲ এর বেশী নয়।

লক্ষপতি, ক্রোড়পতি হইবার জন্য হাজার হাজার পথ এদেশে খোলা আছে। তেজারতির লাইনে, কৃষিকর্ম্মে, ব্যাঙ্কে, ফ্যাক্টরিতে পুঁজিপতি হইতেছে। লেখক হিসাবে, অভিনেতা হিসাবে, চিত্রকর হিসাবে,

(৯)

রাইটার পত্নী বলিতেছেন ঃ—"স্বামী আমাদের ব্যবসার মালিক বটে। কিন্তু হিসাব পত্র চলে সবই আমার নজরে। স্বামীর উপর অঙ্কের ভার দিলে এত দিনে কারখানাটা কারখানা-লীলা সম্বরণ করিত।"

"টোন" মাটির বাসন তৈয়ারি করা রাইটারদের কারবার। টোনকে পোর্সলেন বা চীনামাটির মাসতুত ভাই বলা চলে,—মাটিটা কিছু নিকৃষ্ট। ইয়োরামেরিকার ঘরে বাইরে যে সব থালা বাটি পেয়ালা ডেক্‌চি গামলা দেখিতে পাই, সে সবকে সহজে আমরা পোর্সলেন বলিয়া

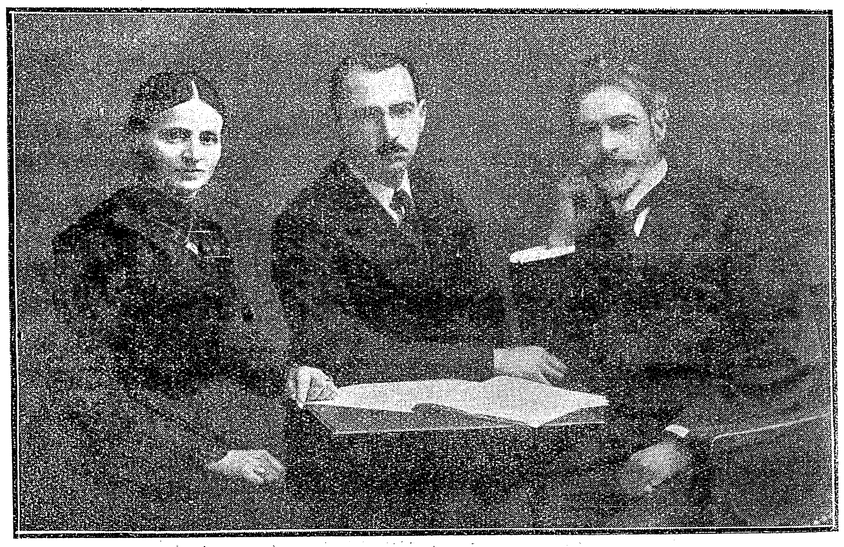

'টোন'—শিল্পী রাইটার পরিবার

গায়ক হিসাবে, এই ধরণের অন্যান্য অসংখ্য হিসাবেও লোকেরা অজস্র টাকা উপার্জ্জন করে।

এই সকল কথা মনে রাখিয়াও সরকারী বেতনের সিঁড়িটা সর্ব্বদা চোখের সম্মুখে রাখা আবশ্যক। এই সিঁড়ি মাফিকই জার্ম্মাণির মধ্যবিত্ত সমাজ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আর এই সিঁড়িয় মূলমন্ত্র এই যে,—নিয়তম মূর্খতম নেহাৎ আনাড়ি লোকও যেন খানিকটা সুখে স্বচ্ছন্দে শরীরটা বাঁচাইয়া সংসারে চলাফেরা করিতে পারে। জার্ম্মাণ আদর্শ জগতে ছড়াইয়া পড়িলে মানবজাতির দুর্গতি অনেক পরিমাণে ঘুচিবে।

থাকি। বস্তুতঃ সে সবের শতকরা নিরানব্বুইটা "টোন"। পোর্সলেন দুনিয়ায় একমাত্র পয়সাওয়ালাদের, এবং মধ্যবিত্তদের পোষাকী,— আসবাব।

রাইটার অতি উঁচুদরের সুকুমার শিল্পী! দেশ-বিদেশের লোকেরা ইহাঁর হাতের গড়া বাসন কোসন চিমণী চুল্লা লইয়া যায়। "রূপ দক্ষতায়" রাইটারকে প্রথম শ্রেণীর কারিগর বলিতেই হইবে। মিউনিকের শিল্প-বাজারে রাইটারের "হাফ্‌নারাই" বা টোন কার-খানার নাম আছে।

রাইটার বলিতেছেন ঃ—"লাণ্ড্‌সহুটের এই বাড়ীটা

আমাদের অনেক দিনের বাস্তভিটা। এই যে ভাটিটা দেখিতেছেন, ইহাতেই আমার পিতামহ প্রপিতামহ সকলেই টোন পুড়াইয়া গিয়াছে। এই ধরণের মান্ধাতার আমলের ভাটি জার্ম্মাণিতে আর একটাও আছে কি না সন্দেহ। আমি ইহাকে পুরানা কায়দায়ই রাখিয়া দিয়াছি। কাঠ পুড়াইয়া আগুন তৈয়ারি করি। নবীনতম ভাটির পরিচালকেরা আমার এই সে-কেলে ভাটির কেরদানি দেখিয়া বিস্মিত হয়। আমার পিতার তৈয়ারি চিম্‌ণী ট্রাউসনিট্‌স দুর্গের এক ঘরে দেখিতে পাইবেন।"

ছেলেও কারবারে বাহাল আছে। গোটা কারখানায় মাত্র পাঁচটা ছোটখাটো যন্ত্র। একটা মোটরের সাহায্যে যন্ত্রগুলা চালানো হয়। আট জন মাত্র মজুর কাজ করে। খাঁটি পারিবারিক শিল্প হিসাবে রাইটারের কারখানাটায় অনেক কিছু শিখিবার আছে।

রাইটারের মাল ভাটি হইতে পড়িতে পায় না। গরম গরম সবই বিক্রী হইয়া যায়। ইহারা "চোপর দিন রাত"ই খাটিতেছেন। রাইটার বলিলেন ঃ—"মজুরদের বেলায় আইন আছে আট ঘণ্টার রোজ। আমি খাটি প্রায় আঠার ঘণ্টা!" স্ত্রী বলিলেন ঃ—"ইহাই আমার স্বামীর একমাত্র ব্যাধি।"

(১০)

দিনরাত বৃষ্টি পড়িতেছে। সবুজ ইজার ফুলিয়া উঠিয়াছে। জল কিনারা ছাপাইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে "খাল বিল পুকুর পরিল।" চারিদিকে হাহাকার,—বিষম বন্যা। এই অবস্থা একমাত্র লাণ্ড্‌সহুটেই গণ্ডীবদ্ধ নয়। মিউনিকও ইজারের উপর,—তাহার দুরবস্থাও এইরূপ। গোটা ইজারতাল জলে ভাসিয়া যাইতেছে।

লাণ্ড্‌সহুটের সড়কগুলা নদীতে পরিণত হইল। মাঠ-ঘাট সবই জলের নীচে। বসতবাড়ীর "কেলার" বা আন্তর্ভৌম প্রকোষ্ঠগুলায় এক হাঁটু বা এক বুক জল। কাজে ভিড়িয়া গেলাম। কয়লা, কাঠ, বাক্স, হাঁড়ীকুঁড়ি সবই "কেলার" হইতে উপরের তলায় তুলিয়া আনিতে লাগিয়া যাওয়া গেল।

হাজার হাজার কিষাণের "পাকা ধানে" সর্ব্বনাশ। মিট্টেনহ্বাল্ড অঞ্চলে কোনো কোনো কিষাণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল। লাণ্ডসহুট অঞ্চলে রাশি রাশি শস্যের আঁটি ভাসিয়া যাইতেছে। গরু ছাগলের দুর্দ্দশাও যৎপরোনাস্তি।

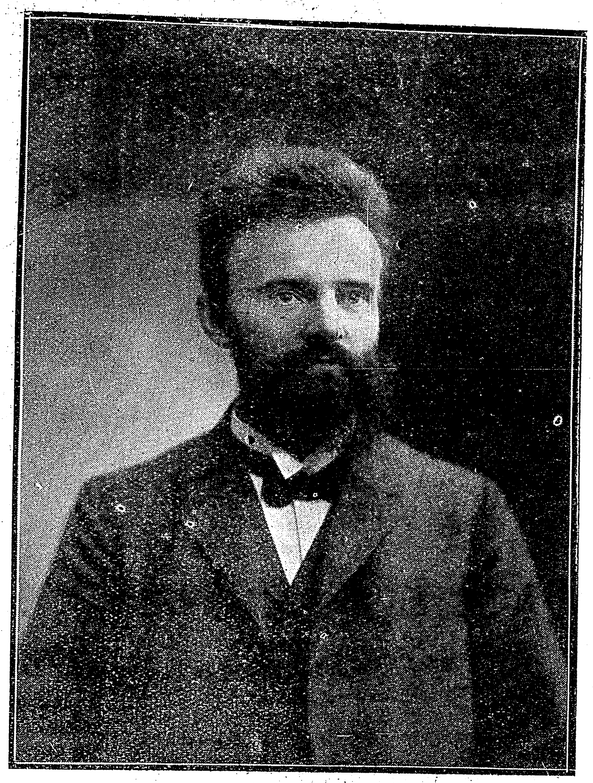

প্রাকৃতিক চিকিৎসক চার্মাক

যাহা হউক,—দৃশ্যটা চমৎকার। ট্রাউসনিট্‌স দুর্গের ছাদে যাইয়া আবেষ্টনটা দেখিতেছি। গোটা জনপদ সাগরে পরিণত হইয়াছে। পল্লীভবনগুলা দূরে দূরে কতকগুলা দ্বীপের মতন দেখাইতেছে। মাঠে মাঠে চলিতেছে নৌকা। মেয়ে পুরুষেরা হাঁটিতেছে জুতা মাথায়

বা ঘাড়ে করিয়া। বন্যার দৌরাত্ম্যে ভারতে এবং চীনেও এইরূপ দৃশ্যই দেখা যায়।

দুই তিন দিনের ভিতরই দুর্দ্দৈব কাটিয়া গেল। দশবিশ বৎসরের ভিতর না কি এমনটি আর লাণ্ডসহুটে ঘটেনাই।

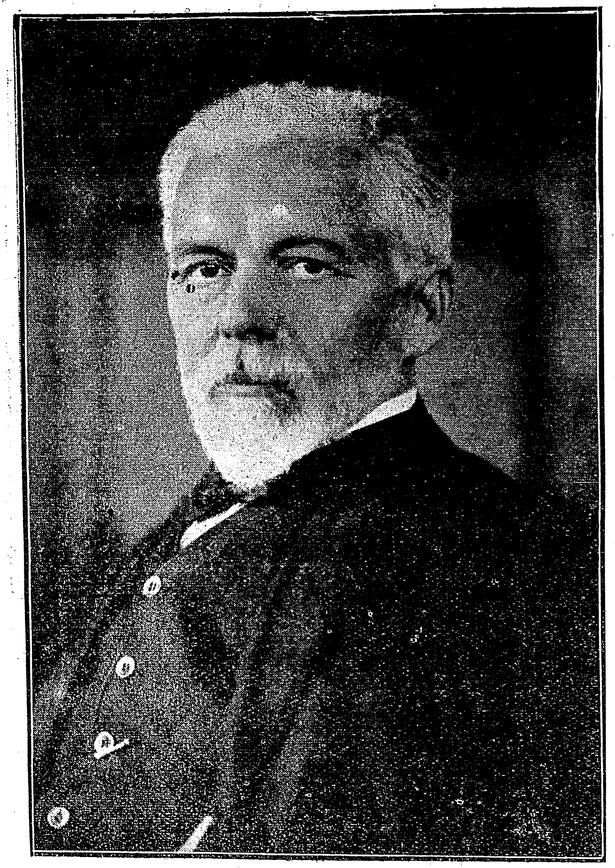

শিক্ষাগুরু কের্শেন ষ্টাইলার

তবে জার্ম্মাণিতে চাষীদের মা বাপ গবর্মেণ্ট। জমিদার নামক অত্যাচারী জীব এদেশে নাই। কোনো নির্দ্দিষ্ট হারে বৎসর বৎসর খাজনা দিতে হয় না। প্রত্যেক বৎসর গবর্মেণ্ট চাষ আবাদের আয় দেখিয়া খাজনার পরিমাণ ঠিক করিয়া দেয়। সেই পরিমাণ ঠিক করিবার সময় প্রত্যেক কিষাণের মাসিক খরচ এবং বার্ষিক আয় লোকসান ইত্যাদি সবই খুঁটিনাটির সহিত আলোচিত হয়। কিষাণ গবর্মেণ্টের নির্দ্ধারিত খাজনার পরিমাণ যুক্তি দেখাইয়া কমাইতে অধিকারী।

(১১)

ব্যাহ্বেরিয়ায় কিষাণরা কত ধারে খাজনা দেয় সেই বিষয়ে কয়েক ঘণ্টা করিয়া খাজাঞ্চিখানায় বড় বাবুদের সঙ্গে বচসা হইল। বুঝিয়া উঠা কঠিন। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করিয়া ত্রৈরাশিকের অঙ্ক কষিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইলাম। রামার দলিলপত্র, শ্যামার দেনাপাওনার হিসাব ইত্যাদি অনেক নথি নাড়াচাড়ি করিলাম। প্রায় এক ডজন খাজনার নাম শুনা গেল। প্রত্যেক কিষাণকেই এই সব দিতে হয়।

ধরা যাউক যেন কোনো লোকের ১৫০ বিঘা জমিতে চাষ চলে। তাহার সঙ্গে কাজ করে স্ত্রী এবং চার পুত্রকন্যা আর দুই মজুর। তাহা হইলে সকল প্রকার শস্য এবং জানোয়ার বেচিয়া,—খরচ পত্র বাদে—তাহার মজুত থাকে আজকালকার বাজার দর হিসাবে প্রায় ১,৫০০৲। এই দেড় হাজার টাকার উপর জমি-কর, ঘর-কর, গির্জ্জা-কর, পল্লী-কর, জেলা কর, ব্যবসা-কর, আয়-কর ইত্যাদি সকল প্রকার করের সমবেত পরিমাণ প্রায় ১৫০৲। বাকি থাকে ১৩৫০৲। এই টাকায় কিষাণের বার্ষিক ভরণ-পোষণ হয়।

কম-সে-কম দেড়শ বিঘা জমি যে কিষাণের নাই, তাহার পক্ষে স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করা এদেশে সম্ভবপর নয়। অন্ততঃ ছয়শ বিঘা জমি যার তাহাকে জার্ম্মাণরা "গুট্‌স্ বেসিট্‌সার" অর্থাৎ ইতালিয় বা ভারতীয় জমিদার জাতীয় লোক বলে। কিন্তু জার্ম্মাণ জমিদার কোনো রাইয়তের বা প্রজার মালিক বিশেষ নয়। সেও এক কিষাণ,—বড় গোছের কিষাণ। নিজ হাতে জমি চষা তাহার কোষ্ঠিতে অবশ্য লেখে না। কিন্তু সে লোক লাগাইয়া চাষ আবাদ, পশুপালন, তদবির করিয়া অন্নসংস্থান করিতে বাধ্য। যদি সে দুর্ভাগ্য ক্রমে কুঁড়ে অথবা মুখ্‌খু হইয়া জন্মে, তাহা হইলে একমাত্র জমির মালিক হওয়ার দরুণ তাহার পেট ভরিবার সম্ভাবনা নাই। শিল্পপতি, ব্যাঙ্কপতি, ব্যবসায়ী ইত্যাদির মতন "গুট্‌স বেসিট্‌সার" বা জার্ম্মাণ জমিদারকে মাথা খাটাইয়া "আট দশ ঘণ্টার রোজ" চালাইয়া হাজারপতি বা লক্ষপতি হইতে হয়। বাঁধা খাজনা [ভোগ করা জার্ম্মাণিতে জমিজমার মালিকদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য নয়।

ম্যালেরিয়ায় ভোগা দক্ষিণ জার্ম্মাণিতে অজানা সামগ্রী। এই কারণেই ব্যাহ্বেরিয়ার চাষী-সমাজে বোল্‌শেহ্বিকীর দন্তস্ফুট অসম্ভব।

(১২)

ফ্রান্‌ৎস্ কাউপ মিউনিকের এক যুবা চিত্রশিল্পী। লাণ্ড্‌সহুটের লোরেটো মন্দিরের অভ্যন্তর চিত্রিত করিবার কাজে ইনি মোতায়েন আছেন। ইঁহার সহকর্ম্মী আর একন যুবা চিত্রকর।

ফ্রান্সিস-পন্থী পুরোহিতদের সঙ্গে মন্দির পরিদর্শন করা যাইতেছে। মই ভাঙিয়া মাচাঙের উপর উঠিলাম। কাউপ বলিলেন :—"দেখিতেই পাইতেছেন দেওয়ালটার

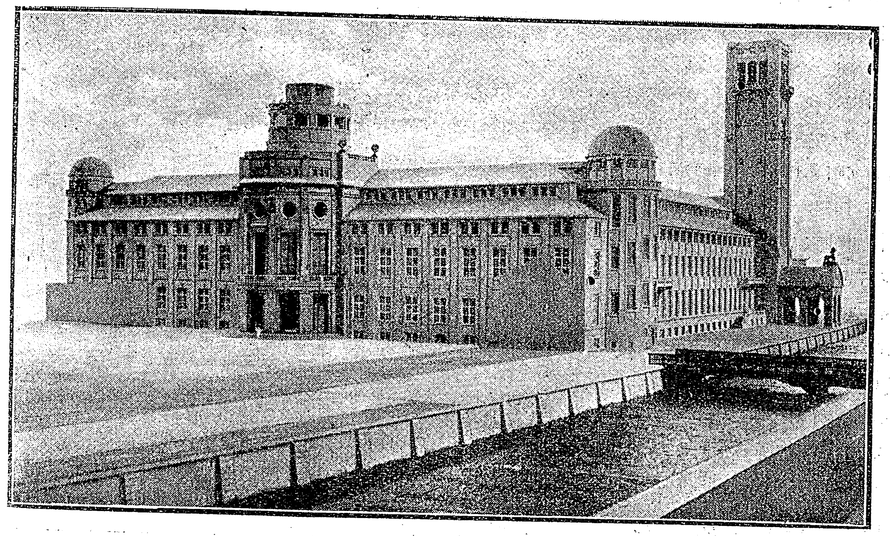

ড্যয়চেস মুজেয়ুম (মিউনিক)

একশ দেড়শ বিঘার কম জমি যাহাদের তাহারা নিজ চাষ আবাদ সারিয়া অন্যান্য ভূমিপতিদের নকরি করিতে লাগিয়া যায়। কিষাণদের ক্ষেতে যে সকল মজুর দেখিয়াছি, তাহারা সাধারণতঃ ত্রিশ পঞ্চাশ বিঘা জমির মালিক। কিন্তু ত্রিশ পঞ্চাশ বিঘার মালিকেরা আর্থিক হিসাবে স্বরাজী নয়। এই জন্যই পরের কাজে গতর না খাটাইলে তাহাদের চলে না।

ব্যাহ্বেরিয়ায় স্বচ্ছল স্বরাজী কিষাণদের সংখ্যা অনেক। কর্জ্জে ডুবিয়া যাওয়া, অনাহারে মৃতপ্রায় হওয়া অথবা উপর লেপা পুছা এক প্রকার শেষ হইয়াই আসিয়াছে। ছাদের কাজ কিছু কিছু বাকি আছে। কাজে হাত দিবার পূর্ব্বে প্রথমে একটা নক্‌সা তৈয়ারি করিয়াছিলাম।" সেই নক্‌সাটা ভিন্ন ভিন্ন কাগজে দেখা গেল।

নক্‌সা মাসিক ছবি আঁকা হইয়াছিল পরে,—দেওয়াল ও ছাদের আকার প্রকার সদৃশ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাগজে। সেই সকল কাগজ দেখাইয়া কাউপ বলিতেছেন,—"দেওয়াল ও ছাদের উপর কাগজ রাখিয়া ছবির রেখায় রেখায় দাগ টানিতে হয়। সেই দাগগুলা দেওয়াল আর

ছাদের উপর চিত্রের জমিন তৈয়ারি করে। তাহার পর রংয়ের খেলা।"

আঁকা হইতেছে ধর্ম্মের কাহিনী—বলাই বাহুল্য। একটা দেওয়াল আরও আধখানা ছাদ লেপিতে লাগিতেছে মাস তিনেক। যুবারা মোলায়েম বর্ণসমাবেশে সুপটু। মূর্ত্তিগুলা সাজাইয়াছেও অতি সুচারুরূপে। সমগ্র রূপাবলীর ভিতর একটা সামঞ্জস্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কাউপের বন্ধু বলিলেন,—"আমরা ইহার পূর্ব্বে আরও দুই চারটা মন্দিরে কাজ পাইয়াছি। আগামী সেপ্টেম্বার মাসে (১৯২৪) আমরা আমেরিকায় যাইতেছি। সেখানে সেইণ্ট লুই সহরের এক গির্জ্জায় আমাদের ডাক পড়িয়াছে।"

(১৩)

অনেক দিন মফঃস্বলে কাটাইবার সময় মাঝে মাঝে সহরে আসিলে লাগে মন্দ নয়। লাণ্ড্‌সহুটে মাত্র হাজার ত্রিশেক লোক। ইহাকে আজকালকার নজরে পল্লীর সামিলই বিবেচনা করিতেছি। কিন্তু মিউনিককে আর মফঃস্বল বলা চলে না। সবই এখানে বিপুল। লাখ দশেক নরনারীর কোলাহল।

ব্যাহ্বেরিয়ার স্বদেশী নাম বায়ার্ণ্। মিউনিককে প্রশিয়ানরা বলে মিন্‌খেন। ব্যাহ্বেরিয়ানদের উচ্চারণে মিন্‌চেন।

গোটা জার্ম্মাণির লোকসংখ্যা আজকাল ছয় কোটি। তার দশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ষাট লাখ লোক বাস করে ব্যাহ্বেরিয়ায় বা দক্ষিণ জার্ম্মাণিতে। ব্যাহ্বেরিয়া এই হিসাবে অষ্ট্রিয়ার সমান,—সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের দেড়া,—আমাদের ভারতীয় চার পাঁচটা জেলার অনুরূপ। এক মিউনিক সহরেই ব্যাহ্বেরিয়াণ-জার্ম্মাণদের ছয় ভাগের এক ভাগ জীবন ধারণ করে। মিউনিক জার্ম্মাণ জীবনের এক মস্ত আড্ডা।

দোকানপাটগুলা নয় হাউজার আর কাউফিঙার ষ্ট্রাসেতে যারপরনাই জাঁকজমকপূর্ণ। শ্বোআবিঙ্ মহাল্লার বাস্তগুলা স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপনের প্রতিমূর্ত্তি। ইজার দরিয়ার দুই কিনারায় সবুজ বাগানের পাশে পাশে সড়কসমূহ সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা সাজাইয়া রাখিয়াছে। "রেসিডেন্‌ৎস" বা রাজবাড়ী, "রাটহাউস" ইত্যাদি সরকারী বাড়ী, এবং অন্যান্য বসত বাড়ী, সবই নিয়েট সৌকুমার্য্যময় ইরামত।

যে পাড়ায়ই যাই,—মনে হইতেছে যেন হ্বিয়েনায় বা প্যারিশে রহিয়াছি। একটা ছোট খাটো প্রদেশ মাত্রের বড় শহর বোধ হইতেছে না। মিউনিক যদি গোটা জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের রাজধানী হইত, তাহা হইলেও জার্ম্মাণ জাতির ইজ্জত নষ্ট হইত না। যাঁহারা বার্লিন দেখিবার পূর্ব্বে মিউনিকে পদার্পণ করিবেন, তাঁহারা ভুলিয়া এই শহরকে ছয় কোটি নরনারীর রাষ্ট্রকেন্দ্র বিবেচনা করিলে দোষ হইবে না।

জ্ঞানমণ্ডলের প্রতিষ্ঠানসমূহ মিউনিকে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর অন্তর্গত। মিউজিয়ামে মিউজিয়ামে "ধুল পরিমাণ"! লুড্‌হ্বিগষ্ট্রাসেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাড়া বলা চলিতে পারে। শহরের আর একটা পাড়া জুড়িয়া চিকিৎসাবিভাগের ল্যাবরেটরি, হাসপাতাল ইত্যাদি অবস্থিত। মিউনিকের টেক্‌নিশে হোখশুলে জার্ম্মাণিতে অতি প্রসিদ্ধ।

স্যাক্‌সন নগর ড্রেসডেন যেমন রেণাসাঁস গড়নে ভরপুর, ব্যাহ্বেরিয়ান নগর মিউনিকও সেইরূপ। বাস্ত রীতির তরফ হইতে প্যারিস, হ্বিয়েনা ও মিলান যে শ্রেণীর অন্তর্গত, মিউনিকও সেই শ্রেণীর শহর। কোনো কোনো ইমারত ঠিক যেন হ্বেনিস হইতে সশরীরে উপড়াইয়া আনা হইয়াছে। বার্লিনের রীতি অথবা জার্ম্মাণি-প্রসিদ্ধ "গথিক" ঢঙ মিউনিকে অতি বিরল। কিছু বিস্মিত হইতেছি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দুনিয়ায় যে সকল নতুন শহর গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রায় প্রত্যেকটায়ই রেণেসাঁসের প্রভাব পড়িয়াছে। প্যারিস, হ্বিয়েনা, মিউনিক ইত্যাদির ত কথাই নাই,—ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম প্রত্যেক জনপদেই ইতালিয়ান রেণেসাঁস কোনো না কোনো আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

মিউনিকের যা কিছু বাস্তগৌরব, সবই ঊনবিংশ শতাব্দীর চিজ্। ব্যাহ্বেরিয়ার "বিক্রমাদিত্য" লুড্‌হ্বিগ (১৮২৫—৪৮) নামজাদা বাস্তশিল্পী স্থপতি ও চিত্রকর বাহাল করিয়া নগরের সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার আমল হইতে প্রিনজরেগেণ্ট লুইটপোল্ড (১৮৮৬-১৯১২) পর্য্যন্ত মিউনিকের দরবারে "নবরত্নের সভা" লাগিয়াই ছিল।

উদাসী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

হে উদাসি!
তুমি বল হাসি
"এ ধরার
"ঐশ্বর্য্য সম্ভার
"সবই না ত্যজিলে কভু
"জীবনে বাঞ্ছিত বর নাহি দেন প্রভু"।
বুঝিব কি তবে,
বিসর্জ্জিতে হবে
যাহা কিছু কাম্য, যাহা কিছু প্রিয় ভবে?
এই যদি সত্য হয়, তবে
বল কেন রত্নাকর
ধরে রত্ন থরে থর!—
প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার যদি সবই মিছে মায়া,
কেন তবে এ সৌরভ, গীতি, আলো, ছায়া?
মুঞ্জরিত সুষমার রাশি,
কেন বা প্রকৃতি হাসে আলো করা হাসি?
ছুহাতে বিলোনো তাঁর অফুরন্ত সম্পদ্ ভাণ্ডার!
বর্ণে, গন্ধে,
গানে, ছন্দে,
ফলফুলে সবুজের প্রান্তর, কান্তার,
অরণ্যানী নানা রঙে রাঙিয়া বিরাজে—
যেন দেবী তৃপ্ত নন নানারূপ মাঝে
আপনারে বিলাইয়া নিতি নব সাজে
রূপে ঢল ঢল
সৌন্দর্য্য-বিহ্বল
নারী সম নিত্য কেন প্রসাধন তাঁর
যদি সবই মিছে ইহা, যদি বৃথা এ জীবন-ভার!
যদি এ জগৎ মাঝে সাধনার, সত্যের মিলন
হয় অঘটন,
তবে কেন প্রকৃতির এ বিরাট অপচয় করে মুগ্ধ মন?
কেন তবে যুগ যুগ ধরি এই দুঃখ-তাপ ভার
রোগ শোক নিরাশার
গুরুভারও স'য়ে শ্লথ চরণবিক্ষেপে চলে ক্লান্ত দেহী আর?
যদি এ জগৎ মায়া, কেন তবে আজিও সে হাসে?
কেন ঢালে সুধারাশি কুসুম সুবাসে,
মলয় বাতাসে,
সদাই অবোধ মন হয় আত্মহারা!
কেন তবে আসা এ জগতে! যদি শুধু পথহারা
চলে লক্ষ লক্ষ হিয়া অন্তরের নিভৃত কামনা
অপূর্ণ বাসনা
শত শত
দীর্ঘশ্বাসি চাপি অবিরত
তবুও বিদ্রোহী প্রাণ তার
কেন বল জপে বার বার:—
"আছে আশা; সত্য—শুভ; দুঃখ কভু নহেক চরম,
"যাহা কিছু দৃশ্যমান তার অন্তরালে আছে মঙ্গল পরম।
"করুণানিধান কোনও কর্ণধার
"করিবেন পার
"জীবনের দিশেহারা এ পাথারে
"অন্বেষু সবারে।
"যদিও না বুঝি আজ
"মহারাজ,
"তোমার এ রচনার অন্তর্গূঢ় সুর,
"যেন তবু তার রেশ,
"নিখিলেশ,
"স্বপ্ন সম
"চিত্তে মম
"ভেসে আসে মাঝে মাঝে মঙ্গল মধুর
"সে উদাত্ত তানে
"ছন্দে শিল্পে গানে

"বীণার ঝঙ্কারে আর স্নেহ, প্রেমে প্রাণে
"নানা স্রোতে আনে
"ভাসায়ে যখন
"চির পুরাতন
"কোনও দূর অতীতের চরম মধুর স্মৃতি,
"এক অসমাপ্ত গীতি ;
"হারায়েছি যদি শেষে
"আজি সে সুরের রেশে
"সে কেবল আমি আজ বিগত-বৈভব
"বিহীন-সৌরভ
"হৃতধন
"এ কারণ"
—এই কথা বলে খিন্ন মন।

সে বিস্মৃত সুর
উজ্জ্বল মধুর
আর কি গো না বর্ষিবে শান্তি বারি
হতাশারই
মাঝে মম দিশেহারা অন্তরেতে আজ,
কহ মহারাজ !
এই কি গো সৃষ্টির মহান্
গরীয়ান্
নিগূঢ় চরম অর্থ ? অবোধ পরাণ
তবে কেন মানিতে না চাহে
বলে 'নহে নহে' অন্তর্দাহে ?
কেন বা সে কাণে মম বলে বার বার :—
"জগতের মাঝে সাধনার
"আছে পথ, আছে আছে শুধু আবিষ্কার
"করিবার অপেক্ষায় মাত্র আছে ব'সে
"আছে মোর মানসী প্রতিমা আছে চেয়ে অনিমেষে
"মোর পানে যুগ যুগ ধরি
"আমারেই বরি
"নির্ম্মাল্য চন্দনে স্নাত সস্মিত আননে
"আছে যেন শুধু মোর চিনিবার প্রতীক্ষায়, যবে অন্য মনে
"আমি খুঁজিতেছি এই অকূল পাথারে
"সে ধ্রুব তারারে,
"যার মধু স্পর্শে মোর মন-প্রাণ সমগ্র অন্তর
"উঠিবে গো উছসিয়া যবে দেবে বর
"তাহার কল্যাণ কর ;
"রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেইদিন এ চাওয়ার হবে সমাধান
"মুহূর্ত্তেক মাঝে"—বলে প্রাণ।

কিম্বা মোর বৃথা বৃথা আশা এ সকল,
আকাশ-কুসুম সম
নিরমম
সকলই বিফল ?
কে বলিবে ? কে বলিবে
চাহিলে মিলিবে ?
সৃষ্টির আদিম কাল হ'তে
এ জগতে
বহু উচ্চ প্রাণ হয়ে গেছে নিষ্পেষিত
নিয়তির অবোধ্য নিহিত
নিষ্ঠুর ও কৃপা-হিম ব্যঙ্গ হাস্যে আর
পদে পদে মানুষের শত ভাঙাগড়া সবই করি একাকার।
হে নিয়তি ! নিরদয় !
এ বিরাট্ অপচয়
সত্যই কি অর্থহীন,
সবই শূন্যে হবে লীন !
সত্যই কি বৃথা হবে অন্তর্গূঢ় আশা
যাহারে যতনে পালি
হৃদয়ের রক্ত ঢালি
আসিয়াছি এতদিন, শুধুই হতাশা
পরিণাম সব আশা ভরসার ?
সবই কি গো হাহাকার ?
এ জগৎ মরীচিকা
অথবা এ প্রহেলিকা
নিদাঘের তপ্ত বক্ষে বর্ষিবে না কভু কি গো সুস্নিগ্ধ আসার?

তুমি কহ হাসি
হে উদাসি :—

"সমাধান চাও যদি তাজ এ সংসার
"দুঃখের আধার,
"শোন তবে মূঢ় নর বাণী এ আমার।
"মায়াময় সহস্র বন্ধন আর আকুল কামনা
"নিহিত বাসনা
"বাধা দেয় শান্তিলাভে তব ; তাই বৃথা এ কল্পনা
"পরিণামে হবে সবই ব্যর্থ এ জল্পনা
"বৃথা আশা তাই ; তবে নূতন আলোক
"চাহ যদি ত্যজ এই অসার নির্ম্মোক।
"পরম তত্ত্বের অন্বেষণ
"দুর্লভ সে ধন,
"মেলে এক নিরালায়
"অরণ্যানী স্নিগ্ধচ্ছায়
"যেথায় বিরাজে
"নিবিড় আঁধার মাঝে
"সেই প্রাণারাম
"নিত্য অভিরাম
"শাশ্বত সুন্দর
"চির মনোহর
"মানবের হৃদয়ের মানসী প্রতিমা,
"যাঁহার মহিমা
"যুগে যুগে গেয়েছেন ত্যাগী ঋষি কবি,
"যে নির্ম্মল ছবি
"উদাসিয়া আসিয়াছে যুগে যুগে প্রেমিক মানবে
"যাঁহারা লভিয়াছেন বিধাতার কৃপা এই ভবে।
"না সম্ভবে
"এই স্বার্থমগ্ন ঈর্ষা-কোলাহল রবে
"মহিয়সী কল্পনার রাজ্যে বসে ; তবে
"কেন মিছে সে প্রয়াস
"কেন সদা দীর্ঘশ্বাস
"আশা-ভঙ্গে ঈপ্সিত-বিয়োগে
"রোগ শোক ভোগে ?
"বৃথা হেথা অন্বেষণ মানসী প্রতিমা
"যখন এ সীমা
"সান্তের রাজ্যেতে তারে পাওয়া শুধু আকাশ-কুসুম,
"বৃথা খোঁজ এ সংসারে তাহার মিলন সব ভ্রম ভ্রম ভ্রম।"

সত্যই কি এই সমাধান
হৃদয়ের চিরন্তন প্রশ্নের মহান্ ?
কেমনে বা কহি হে উদাসি,
ভ্রান্ত তুমি, আলেয়া অন্বেষু ! যবে দেখি দুঃখরাশি
তোমারে স্পর্শিতে নাহি পারে,
এ সংসারে
যা কিছু ঈপ্সিত তাহা তুমি ঠেল পায়
নিশ্চিন্ত ঔদাস্যে অবজ্ঞায়
যাহা রাজেন্দ্রেরও কাম্য, তারে তুমি তৃণসম দলি
যবে যাও চলি
প্রশান্ত আননে—যবে দাও তুমি বলি
জীবনে যা কিছু প্রিয় আদর্শের পায়,
নিন্দাস্তুতি সমজ্ঞান, না ভ্রূক্ষেপি তায়,
তখন কেমনে কহি তুমি শুধু মরীচিকা পানে
বিকল পরাণে
ধাবমান ভাঙাহাল
ছিন্নপাল
তরীখানি প্রায়,
সত্যের পরশ বিনা কভু কি গো সবই ছাড়া যায় ?
নহিলে এ অন্তরের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা কি কভু
রোধ করা যায় সদা ?—নহে নহে প্রভু !

তবু কি গো তব মনে সংশয়ের ছায়া
পড়ে নাকো কভু এসে ?—যদি সবই মায়া,
তবে তব মনে কি গো সন্দেহ না জাগে—
তোমার সাধনা হ'ত সম্ভব কি আগে
শত শত ব্যথাতুর
বিয়োগ-বিধুর
ক্লান্তিভারে অবনত অশ্রুপ্লুত নরনারী যদি
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে সংসারেরে নিত্য নিরবধি
যতনে না পালিত গো সবে ;
যদি এই ভবে
জননী সন্তান-স্নেহ দিত বিসর্জ্জন
দুহিতা কলত্র পুত্র হয়ে আনমন
করিত বৈরাগ্য-চর্চ্চা ; তবে কি গো তুমি

তব চির-আকাঙ্ক্ষিত মানসী-প্রতিমা তরে এই মর্ত্ত্যভূমি
এই সাধনার স্থানে লভিতে জনম
পাইতে সে মোক্ষ, যাহা বল তুমি জীবনে চরম
বহু সাধনার ধন
শৈশবে কখন
হয় না যে ধন লাভ আসি এই ভবে
বহু যত্নে তবে
এ জীবন-সন্ধিপথে
সত্যের দরশ হয় সম্ভব জগতে।
তাই ভাবি আমি
হে সৌম্য নিষ্কামি!
তব মনে
জেগেছে কি না জেগেছে বারেকও জীবনে
উৎকণ্ঠা সংসারী তরে
যারা সদা মোহ ভরে
অন্ধ; যারা কহে সবে—'সামান্য মানব'
কিন্তু তবু যাহাদের
স্নেহ কোল প্রসাদের
দান বিনা জীবন সাধনা তব
হ'ত না সম্ভব
এ চিন্তা কি প্রভু
মনে তব সংশয়ের রেখাপাতও করে নি'ক কভু?

না না কভু নহে,
বিধি যদি রহে
যদি মানবের
হৃদয়ে স্নেহের
প্রীতির নির্ঝর
কলকণ্ঠস্বর
রঙীন আশার
মায়া মমতার
শত বিয়োগের মাঝে প্রণয়ের পুরে
সান্ত্বনার সুরে
নিভৃত অন্তরে
লহরে লহরে
শান্তি উৎস নিরন্তর করে গো বিরাজ
যদি জীবনের হাটে শত কর্ম্মকাজ
দেয় ব্যথা—দেয় না কি সার্থকতা তবু?
অনন্ত বেদনামাঝে অশ্রুধারা কভু
নাহি আনে
কি গো প্রাণে
তৃপ্তির পরম সুর
প্রেমের নূপুর-
ধ্বনি সুমধুর—
নহে কি গো উদাত্ত গম্ভীর তার বাণী?
যার স্পর্শ আনি
বাজায় এ হৃদে নিত্য প্রশান্ত রাগিণী?
যাহার সজল সুর
বিয়োগ-বিধুর
জীর্ণ প্রাণে তপ্ত ভালে বুলায় সে কোমল পরশ
যাহার আভাষে
প্রাণে আসে
শত ব্যথা মাঝে সুখ বিষাদের মাঝেও হরষ
রুদ্র বৈশাখের মাঝে আশীষে যেমতি
জলদের নির্ম্মল বরষ।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

প্রেততত্ত্ব (Spiritualism)

শ্রীচণ্ডীদাস মজুমদার বি-এ, বিদ্যারত্ন, সাহিত্য-ভূষণ

অধুনা ইয়োরোপে ও আমেরিকায় প্রেততত্ত্বের বিশেষ চর্চ্চা হইতেছে। পরলোকতত্ত্ব বা প্রেততত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা ভারতবর্ষের পক্ষে নূতন জিনিস নহে। পুরাকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ উক্ত বিষয়ে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন—হিন্দুশাস্ত্র তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সম্প্রতি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সাধারণ হিন্দুর আধ্যাত্মিক বিষয়ে ঔদাসীন্য বা অনাস্থা জন্মিয়াছে; এমন কি, অনেক হিন্দু পরলোকে বা প্রেতযোনির অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু, পাশ্চাত্য জগতের মনীষিগণ আজ হিন্দুর নিজস্ব সম্পত্তির অধিকারী হইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতেছেন; এবং আমরা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাহা অবলোকন করিতেছি।

বিগত মহাযুদ্ধ পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে আধ্যাত্মিকতা জাগাইয়া দিয়াছে; এবং তাহারই ফলে আজ ইংল্যাণ্ডে Conan Doyle, Sir Oliver Lodge, W. T. Stead, প্রভৃতি মনীষিগণ প্রেততত্ত্বের আলোচনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে, পরলোক আছে—আত্মা অমর, এবং মৃত ও জীবিতের মধ্যে কথোপকথন (Communication) সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, অচিরেই পরপারের যবনিকার উত্তোলন সম্ভবপর হইবে এবং মানব-নেত্রের সমক্ষে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব, অন্তহীন জগৎ প্রকটিত হইবে।

প্রেততত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, প্রধানতঃ দুইটি উপায়ে জীবিত ও মৃতের মধ্যে কথোপকথন সম্ভব হইতে পারে—(১) সম্মোহন বিদ্যার (Hypnotism ও Mesmerism) সাহায্যে ও (২) Automatic writing বা অনিচ্ছা-প্রসূত লিখনের সাহায্যে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি দ্বিতীয় উপায় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

আমি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম automatic writing সাধনায় প্রবৃত্ত হই। নির্জ্জনে বসিয়া কোনও মৃত আত্মীয়ের বিষয় ১৫।২০ মিনিট কাল গভীর ভাবে চিন্তা করিতাম। ৫।৭ মিনিট পরে দক্ষিণ হস্তের নিম্নাংশ যেন খুব ভারী বোধ হইত, এবং উক্ত হস্তস্থিত পেন্‌সিল আস্তে আস্তে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইত। আহূত প্রেতাত্মাকে কোনও প্রশ্ন করিলে, তাহার একটা উত্তর কাগজের উপর লিখিত হইত—কিন্তু তাহা এত অস্পষ্ট যে, বিশেষ চেষ্টা করিয়াও পড়া যাইত না। প্রায় ২ মাস কাল অভ্যাসের পর দেখা গেল যে ৪।৫ মিনিটের মধ্যেই পেন্‌সিল সঞ্চালিত হইতেছে, ও লেখা একটু চেষ্টা করিলেই পড়া যাইতেছে। তখন আমি আমার সঙ্গে ২।৩টি আত্মীয়কে লইয়া spiritual circle বা আধ্যাত্মিক চক্রে বসিতে আরম্ভ করিলাম। ৩।৪ জনে চক্রাকারে উপবেশন করিতাম; আমার হাতে পেন্‌সিল থাকিত; উহা দক্ষিণ হস্তের তিনটি অঙ্গুলীর সাহায্যে খুব আল্‌গা করিয়া ধরিতাম। আমি চক্ষু মুদিত করিয়া প্রেতাত্মার চিন্তা করিতাম—আমার সঙ্গীগণও ঐরূপ করিতেন। ৩।৪ মিনিটের মধ্যেই প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইত এবং পেন্‌সিলটি সবেগে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইত। প্রেতাত্মা আপনার নাম লিখিবার পর তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইত। প্রথমে আত্মীয়গণের আত্মা—পরে বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি দেশের মহাপুরুষগণের আত্মাকে আহ্বান করা হইত। একটা বিষয় আমরা বেশ লক্ষ্য করিতাম যে, উত্তরগুলি আহূত আত্মার শিক্ষা, দীক্ষা ও চরিত্রের সম্পূর্ণ উপযোগী হইত—অনেক সময়ে ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গীর সাদৃশ্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইতাম। ক্রমশঃ আমাদের মনে একটা সন্দেহ হইল যে, হয় তো মিডিয়মের পূর্ব্বচিন্তা বা অর্জ্জিত জ্ঞান তাঁহার অজ্ঞাতসারে হস্ত হইতে কোনও রূপে নিঃসৃত হইতেছে, এবং প্রশ্নগুলির উত্তর মিডিয়মের আন্দাজ-মত হইতেছে। আমাদের মধ্যে একজন বলিলেন যে মিডিয়মের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিষয় বা অপরিচিত ব্যক্তি সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নের ঠিক উত্তর পাইলে, অনেকটা বিশ্বাস হয়। কিছু দিন পূর্ব্বোক্ত রূপ প্রশ্ন করা হইল; কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেল না। এক দিন রাত্রি কালে আমার এক ভাগিনেয় বলিলেন যে, কোনও মৃত জ্যোতিষী বা করকোষ্ঠিবিশারদের আত্মাকে আহ্বান করিয়া আমাদের ভাগ্য গণনা করা হউক। যদি অতীত বা ভবিষ্যতের কথা মিলিয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ব্যাপারটার মধ্যে কিছু সত্য আছে। এই প্রস্তাব অনুসারে এক দিন আমাদের বংশের জনৈক কৃতবিদ্য আত্মীয়ের আত্মাকে আহ্বান করিয়া প্রশ্ন করা হইল—"আপনি পাশ্চাত্য জগতের তিনজন প্রধান মৃত জ্যোতিষীর নাম করুন, আমরা তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে চাই।"

উত্তর হইল—(১) John Murray of Scotland, (২) Lineas Lacheses of Belgium (৩) Von Fokenhaun of Germany। আমরা তৎক্ষণাৎ John Murrayর আত্মাকে আহ্বান করিলাম। তিনি আসিয়া বলিলেন—"আমি একজন Palmist, এই কথা শুনিবামাত্র আমাদের মধ্যে একজন হাত পাতিয়া বসিলেন; মিডিয়ম চক্ষু মুদিত করিয়া পেন্‌সিল ধরিলেন—অন্যান্য সকলে প্রেতাত্মার নাম চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রেতাত্মা ইংরাজীতে লিখিতে লাগিলেন। প্রশ্নকর্ত্তার চরিত্রের বিশেষত্ব, সাংসারিক উন্নতি, ও অতীত ও ভাবী পীড়া সম্বন্ধে ৫।৬ মিনিটের মধ্যে প্রায় ১৫।১৬ লাইন লেখা হইয়া গেল। চরিত্র ও পীড়া সম্বন্ধে

প্রেতাত্মার উক্তি সন্তোষজনক বোধ হইল। তাহার পর তলে তলে আমরা সকলেই এক একটা ছোট খাটো কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া লইলাম—এবং ভবিষ্যদ্বাণীগুলির সফলতার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তাহার পর মিডিয়মের সম্পূর্ণ অপরিচিত ২।৪ জন ব্যক্তির হাত দেখান হইল—সকলে সন্তুষ্ট হইলেন না—কিন্তু একজন খুবই সন্তুষ্ট হইলেন। এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যক—ঘটনার ১ মাস পরে একখানি পুরাতন Biographical Dictionaryতে John Murrayর নাম পাওয়া গেল। তিনি চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, ইহাও জানা গেল—কিন্তু উক্ত অভিধানে তিনি যে Palmist ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না। বলা বাহুল্য, মিডিয়ম John Murrayর নাম একেবারেই জানিতেন না। আমাদের কৌতূহল বাড়িয়া গেল—প্রতি বৎসর পূজাবকাশে ভবানীপুরের বাসায় Seance চলিতে লাগিল। এক দিন বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মাকে আনয়ন করিয়া বলা হইল—"আপনি একটি বাঙ্গালা রচনা লিখিয়া দিন।" তিনি প্রথমে একটু আপত্তি করিয়া শেষে "মানুষ কি চায়?" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিলেন। প্রবন্ধটি তিন রাত্রে সম্পূর্ণ হইল। আমরা রচনার ভাব ও ভাষায় স্বর্গীয় বঙ্কিমের অতি সুন্দর পরিচয় পাইলাম। রচনাটি—"বাণী" নামক একখানি দ্বৈমাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ছাপার অক্ষরে প্রায় তিন পৃষ্ঠা হইয়াছিল।

আমার ২।৩ জন আত্মীয়ের সম্বন্ধে John Murray ১৯২০।২১ সালে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি অতি আশ্চর্য্য রূপে সফল হইয়াছে।

এক দিন গভীর রাত্রে কোনও প্রেতাত্মাকে শব্দ করিয়া তাঁহার আগমনের প্রমাণ দিতে বলায়, ছাদের উপর তিনবার সজোরে পদধ্বনি হইয়াছিল। উহা আমরা আট-দশ জন খুব স্পষ্টরূপে অনুভব করিয়াছিলাম।

এইরূপে ৫।৬ বৎসরব্যাপী সাধনার ফলে আমাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, Automatic writing জিনিষটা একেবারে মিথ্যা নয়। তবে ইহার সাফল্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে—(১) মিডিয়মের স্বাভাবিক ও অর্জ্জিত শক্তি; (২) গভীর নিস্তব্ধতা; (৩) চক্রে উপবিষ্ট জনবৃন্দের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও মনঃসংযোগ (Concentration) (৪) তাহাদের সাত্ত্বিকভাব ও পবিত্রতা। Automatic writing ক্রমাগত ৩।৪ ঘণ্টা চালান অসম্ভব নয়। তবে ইহার ফলে সময়ে সময়ে medium খুব পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু আমার মনে হয়—এই পরিশ্রম নিরর্থক নহে। স্বর্গীয় আত্মার সহিত কথোপকথনে কত শোকার্ত্ত ব্যক্তি শান্তি লাভ করে! কত নিরাশ প্রাণ আশান্বিত হয়, কত নাস্তিকের মনে ঈশ্বর-ভক্তি আসে এবং জনসাধারণের ধর্ম্মবিশ্বাস দৃঢ়তর ও স্থায়ী হয়।

বারান্তরে এ বিষয়ে আরও আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। পাঠক-পাঠিকাগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত "মানুষ কি চায়?" প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"তাই বলিতেছিলাম, স্বর্গ ও নরক এই খানেই আছে—এইখানেই বৃন্দাবন, আবার এইখানেই কুরুক্ষেত্র, এইখানেই দেবীর মধুর হাস্য, আবার এইখানেই দানবীর বিকট অট্টহাস্য—এইখানেই সরস্বার ধারাপাত, আবার এইখানেই মার্ত্তণ্ডের অখণ্ড অগ্নিবর্ষণ, এইখানেই শ্যামের বাঁশরী—আবার এইখানেই মহেশের প্রলয়বিষাণ। এই দুয়ের সামঞ্জস্য কোথায়? এই যে আলো-অন্ধকার, এই যে হাসি কান্না, এই যে অমাবস্যা-পূর্ণিমা, এই যে কুলিশ ও শিরীষ কুসুম, এই যে হরি-হর, এই যে শ্যাম-শ্যামা—এদের সামঞ্জস্য কিসে?"

বৈজ্ঞানিক আহার-বিচার

(আমিষ ও নিরামিষ)

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়, বি-এস্‌সি

আমিষ ও নিরামিষ আহারের প্রকৃষ্টতা ও বৈজ্ঞানিক তর্ক-বিচার বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ব্যক্তিগত বিচারের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যানের কথাই আলোচনা করিব। কারণ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ভালো-লাগা মন্দ-লাগার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমার খুশী, আমি যদি নিরামিষাশী হই, তবে কোন বৈজ্ঞানিক আমায় তাহা হইতে নিরস্ত করিতে পারেন না। এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিজ্ঞানের রাজ্যে আদপেই আমল পায় না; কারণ, বিজ্ঞান জিনিসটা হইতেছে কার্য্য-কারণের সম্বন্ধে আবদ্ধ; সুতরাং আমিষ বা নিরামিষাশীর কেহ যেন আমার এই প্রবন্ধে ভীত হইয়া ভাবিয়া না বসেন্ যে, আমি এই দুইটি মতের একটা ক হয়ত প্রচার করিতে বসিয়াছি। আমিষ বা নিরামিষ ভোজনের ওকালতি করা আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। পরন্তু, উভয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ধরিয়া কিঞ্চিৎ আলোচনাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমিষ ও নিরামিষ আহারের বৈজ্ঞানিক আলোচনার পূর্ব্বে, আমরা শরীরতত্ত্বের পাক-ক্রিয়ার কিঞ্চিৎ আভাষ দিতে চাই; নচেৎ বিষয়টি বুঝা যাইবে না। খাদ্য হজম হইবার সময় শরীরে যে সকল জিনিসের দরকার হয়, তাহা ভগবান জন্ম হইতেই মানব-শরীরে প্রদান করিয়াছেন। মুখের লালা, পাকাশয়ের জারকরস, পিত্তথলী হইতে পিত্তরস ও প্যান্‌ক্রিয়াস্ হইতে নিঃসৃত নানা রস ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পাকাশয়ে ভুক্ত দ্রব্য দলিত ও বিমর্দ্দিত হইবার পর, এই সকল জারকরস পাকযন্ত্রের নানা স্থানে ধীরে ধীরে ক্ষরিত হইয়া, তাহাকে জটিল পরিপাক ক্রিয়ার মধ্যে আনিয়া ফেলে। পরিশেষে হজম হইয়া খাদ্যমাত্রেই কাইল্ (chyle) নামক পদার্থে পরিণত হয় ও রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। এই তো গেল হজম্ হইবার সময় শরীরের ভগবান্-দত্ত নানা জারকরসের স্বতঃ নিঃসরণ। এ ছাড়াও খাদ্য পরিপাক হইবার কালে এমন কতকগুলি তরল ও কঠিন এবং বায়বীয় পদার্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে, যাহাদের নাম শরীরযন্ত্রের কোন

স্থানেই পাওয়া যায় না। তাহারা হইতেছে, পরিপাক-যন্ত্রের উপরি পাওনার জঞ্জাল। এই সব জঞ্জালের মধ্যে কতকগুলি শরীরের মিত্র হইয়া দেখা দেয় এবং কতকগুলি আবার পরম শত্রুর আকারে বিষদৃশ হইয়া উঠে। এই শেষোক্ত শত্রু-সম্প্রদায়কে 'শরীর মহাশয়' তাড়াতাড়ি নানা উপায়ে বাহিরে পরিত্যাগ করিয়া তবেই হাঁফ ছাড়েন। মিত্রগুলির মধ্যে কতকগুলি নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া শরীরের উপকার করিয়া থাকে। এই উপরি পাওনার জঞ্জালের মধ্যে আমোনিয়ার (Ammonia) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমোনিয়া একটি বাষ্পজাতীয় জিনিস ও খুব ঝাঁঝালো। এই আমোনিয়ার প্রধান উৎপত্তির কারণ হইতেছে, নিরামিষ-আহার। যাঁহারা খুব নিরামিষ আহার ভালবাসেন, তাঁহাদের শরীরে এই আমোনিয়ার ভাগও বেশী হইয়া দেখা দেয়। ইহা একপ্রকার ক্ষারজাতীয় বায়বীয় পদার্থ। অম্ল-গণের বিপরীতধর্ম্মী বলিয়া ইহা অম্লের অম্লতা বিনাশ করিতে পারে। শরীরে অম্ল এবং ক্ষারপদার্থের পরিমাণ বড় কম নয়। কখনো বা অম্লের পরিমাণ অধিক হইয়া শরীরের রক্ত দূষিত করিয়া ফেলে, কখনো আবার ক্ষারের পরিমাণ বেশী হইয়া রক্তের নানা দোষের কারণ হয়। এই উভয়ের মধ্যে অম্লটাই হইতেছে শরীর ও রক্তের পক্ষে বিশেষ হানিকর। তা' ছাড়া, ব্যাধির নানা বীজাণুরা সাধারণতঃ অম্লজাতীয় পদার্থের গুণ ও ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকে বলিয়া, অম্লজাতীয় পদার্থটাকে চিরকালই 'শরীর মহাশয়' এবং ডাক্তার মহাশয়েরা ভয় করিয়া চলেন। ক্ষার হইতেছে একেবারে ঠিক্ অম্লের বিপরীতধর্ম্মী ও বিপরীত-গুণগ্রাহী। সুতরাং ক্ষার জিনিসটাকে শরীর বড় সহজে ছাড়ে না। তাহাকে দিয়া ঐ অম্লের বিষকে বিনষ্ট না করাইয়া, শরীর কখনো ক্ষারকে রেহাই দেয় না। সুতরাং ক্ষার হইতেছে, দেহ-মিত্র এবং অম্ল হইতেছে, দেহ-শত্রু। এই শত্রু-মিত্রকে পাশাপাশি রাখিয়া শরীর-যন্ত্র কত যে মারামারি-কাটাকাটির সৃষ্টি করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শত্রুর সংখ্যা দলে ভারি হইলে, অমনি মিত্রের খোঁজে শরীরের নানা স্থান হইতে নানা পদার্থ প্রবল তাড়নায় বাহির হইতে থাকে। মিত্রের দল পরিপুষ্ট হইলে শরীর বেশ আরামেই থাকে, সে কথা বলাই বাহুল্য। আমোনিয়া হইতেছে শরীরের এই গুপ্ত মিত্রের অন্যতম। ডাক্ পড়িলেই ইহা আসিতে বাধ্য হয়। তা' ছাড়া, ইহার কিয়দংশ শরীরে স্বভাবতই রক্ষিত হইয়া থাকে। চোর ডাকাতের ভয়ে সরকার যেমন রাস্তার রাস্তায় প্রহরী নিয়োগ করিয়া থাকেন, স্বভাবতই শরীরে যে আমোনিয়া থাকে তাহাও সেইপ্রকার। আবার ডাকাতি ও মারামারি হইলে যেমন রিজার্ভ ফোর্স (Reserve force) ছুটিয়া আসে, আমোনিয়ার অতিরিক্ত সৃজনও কতকটা সেই রকমের। বলা বাহুল্য, এই স্থলে দেহ শত্রু হইতেছে অম্ল-পদার্থ।

অম্ল-পদার্থের বিপরীতধর্ম্মী ক্ষার জিনিসটা আমরা সাধারণতঃ ভোজ্যের শাক্‌সব্‌জি জাতীয় অংশ হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকি। রক্তে অম্লজাতীয় যে বিশেষ অংশটা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে আমরা খাদ্য হইতে প্রাপ্ত হইলেও, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শরীরের পাক প্রক্রিয়ার মাঝরাস্তায় উপরি-পাওনা রূপেও ইহা সংগৃহীত হইয়া থাকে। রক্তে যখন এই অম্লের ভাগ খুব বেশী হইয়া উঠে, তখনই আমোনিয়া-ক্ষারের রিসার্ভ ফোর্সে টান্ পড়ে। শরীর তখন আমোনিয়া আনিয়া তাড়াতাড়ি অম্লবিষকে বিনষ্ট করিয়া দেয়। এই রিসার্ভ (Reserve) বা অতিরিক্ত আমোনিয়ার ভাগটা আমরা সাধারণতঃ শাক্ শব্‌জী হইতেই সংগ্রহ করিয়া থাকি। সাধারণতঃ যকৃৎ বা Liverই হইতেছে আমোনিয়ার এই অতিরিক্ত বা Reserve অংশের প্রধান আড্ডা।

আমোনিয়া শরীরে অনবরত সৃষ্টি হইতেছে এবং পরিবর্ত্তিত আকারে মূত্রনালী দ্বারা বাহির হইয়া যাইতেছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই পরিবর্ত্তিত আমোনিয়া যাহা শরীর হইতে মূত্রের সহিত বাহির হইয়া যায়, তাহার সংজ্ঞা কি? ইহাকে ইউরিয়া (Urea) বলা হইয়া থাকে। আমোনিয়া ইউরিয়ায় পরিবর্ত্তিত হইবার সময় দুইটি পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যায়। রক্তস্থ কার্ব্বনিক এসিড্ (Carbonic Acid) বাষ্পের সহিত মিশিয়া ইহা প্রথমে স্মেলিং সল্টসের সেই ঝাঁকালো পদার্থ এ্যামোন্ কার্ব্বে (Ammon carb) পরিবর্ত্তিত হয়; তাহার পর এক কণা (Molecule) জলকে ঐ এ্যামোন্ কার্ব্ব হইতে নিষ্কাষিত করিলে, আমোন্ কার্ব্বোনেট্ এবং তাহা হইতে আবার আর এক কণা জল নিষ্কাষিত করিলে, আমরা অ্যামোন্ কার্ব্বোনাইড্ বা "ইউরিয়া" পাইয়া থাকি।

কিরূপে আমোনিয়া ইউরিয়ায় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। "H_2O"জলের সঙ্কেতিক চিহ্ন। এক পরমাণু অক্সিজেন ও দুই পরমাণু হাইড্রোজেন্ লইয়া এক কণা বা এক Molecule জলের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

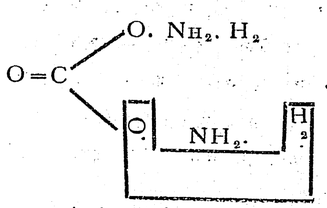

আমোন্ কার্ব্ব।

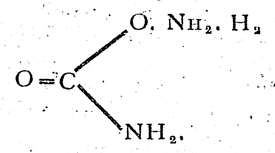

আমোন্ কার্ব্বনেট্।

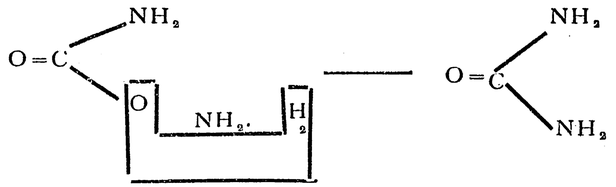

আমোন্ কার্ব্বনেট্।

ইউরিয়া।

এই ইউরিয়াই ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে হুলার (Wohler.) সাহেব কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করেন। অতঃপর ইহার এই কৃত্রিম প্রস্তুত প্রণালী আজও চলিয়া আসিতেছে। ইহা লবণাস্বাদযুক্ত এবং লম্বা লম্বা দানাদার। ইহা ক্ষার বা অম্লজাতীয় পদার্থ দুইটির কোনোটারই স্বরূপ বজায় রাখে না। সদ্য-সংগৃহীত ইউরিয়ার দানা জল ও সুরাসারে সহজেই দ্রবনীয়। শরীরের যকৃৎই (Liver) হইতেছে, ইউরিয়া উৎপাদনের প্রধান আড্ডা। বহু কাল পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ গিনিপিগ্ এবং ব্যাঙ্ জাতীয় জীবজন্তুদের দেহ হইতে একেবারে যকৃৎ-বাদ্ দিয়া দেখিয়াছেন যে, তৎসঙ্গে সঙ্গে ইউরিয়া উৎপাদনও একেবারে লোপ পাইয়াছে। তা' ছাড়া, যকৃৎ বা লিভারের দোষে ইউরিয়ার পরিমাণও কম দেখা যায়। এই সকল অসুখে আমোনিয়া আর ইউরিয়ায় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। সুতরাং তাহা খাঁটি আমোনিয়া রূপেই শরীর হইতে নিষ্কাষিত হইয়া যায়। রক্তের সহিত আমোন কার্ব্বকে মিশ্রিত করিয়া লিভারে পাঠাইলে, কিছুক্ষণ পরে তাহা ইউরিয়া মিশ্রিত হইয়া বাহির হইয়া আসে। সুতরাং লিভারই হইতেছে শরীরের একমাত্র ইউরিয়া তৈয়ারির যন্ত্র। এখন কথা হইতেছে, এই আমোনিয়া শরীরের কোন স্থানে সৃষ্ট হইয়া থাকে? সাধারণতঃ প্যান্‌ক্রিয়াস্-নিঃসৃত জারকরসে খাদ্য হজম হইবার সময়, ঘটনাচক্রে ইহা সৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাহার পর যে পরিবর্ত্তন ধারার মধ্য দিয়া ইহা পরিচালিত হইয়া ইউরিয়ায় পরিণত হয়, সে কথার আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তবে একটা কথা মনে রাখা উচিত যে, যেমন আমোনিয়া হইতে ইউরিয়া পাওয়া যায়, ঠিক্ তাহার বিপরীত উপায়েই ইউরিয়া হইতে আমোনিয়া সংগ্রহ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, রক্তের কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্পের সহিত আমোনিয়া মিশিয়া যে অ.মন্ কার্ব্ব তৈয়ারী করে, পর্য্যায়ক্রমে তাহা হইতে দুই কণা (Molecule) পরিমাণ জল নিষ্কাষিত করিলে, আমরা ইউরিয়া নামক জিনিসটা পাইয়া থাকি। ঠিক্ ইহার উল্টা অর্থে, ইউরিয়াতে পর্য্যায়ক্রমে দুই কণা পরিমাণ (Molecule) জল সংযোগ করিলে পরিশেষে পদার্থটা স্মেলিং সল্টসের সেই ঝাঁঝালো পদার্থ আমোন কার্ব্বে আসিয়া দাঁড়ায়। আমোন কার্ব্ব হইতেছে, আমোনিয়া ও কার্ব্বনিক্ এসিডের সংযোগে সংগঠিত। সুতরাং আমোনিয়া হইতে যেমন ইউরিয়া পাওয়া যায়, ঠিক্ উল্টা অর্থে ইউরিয়া হইতে তদ্রূপ আমোনিয়া গ্যাস্ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। রসায়নের এই পরস্পর-বিরোধী পরিবর্ত্তন-ধারা অতীব কৌতূহলোদ্দীপক।

এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, মানব-শরীরে যে সব ব্যাধি-বীজাণু ও বিষাক্ত পদার্থ দেখা যায়, তাহারা সাধারণতঃ অম্লজাতীয়। এই সব অম্লজাতীয় ব্যাধি-বীজ ও বিষাক্ত পদার্থকে একমাত্র ক্ষারই বিনষ্ট করিয়া শরীরকে নিরাপদ করিতে পারে। যাঁহারা নিরামিষাশী তাঁহাদের শরীরে ক্ষারের অংশই বেশী দেখা যায়। পরন্তু আমিষাশীদের শরীরে অম্লের ভাগ অধিক বলিয়া, শরীরের অম্ল ও ক্ষার উভয়ের সংমিশ্রণে পরস্পর ক্ষয় সাধন ব্যাপার অধিকতর মাত্রায় সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং আমিষাশীগণ অম্ল ও ক্ষারের পরস্পর বিনাশসাধনে যেমন অভ্যস্ত হইয়া পড়েন, নিরামিষাশীরা তুল্য রূপে এই অম্লের বিনাশ সাধনে অভ্যস্ত হইতে পারেন না। সুতরাং নিরামিষাশীর শরীর—ব্যাধি-বীজাণু ও অম্ল-পদার্থের সহিত ক্ষারের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে যেমন সহজেই অভ্যস্ত, আমিষাশীর শরীর কদাপি তদ্রূপ অভ্যস্ত হইতে পারে না। সুতরাং নিরামিষ আহার মানবের শরীরের পক্ষে বৈজ্ঞানিক কারণে তেমন নিরাপদ নহে। অপর দিকে আমিষ-আহার মানবের শরীরের পক্ষে হিতকারী এবং ব্যাধি-বীজাণু ধ্বংসকারী। লোকমত এবং ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছা যাহাই হৌক্, বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া বিচার করিলে, আমিষ-আহারকেই নিরামিষ আহার হইতে উচ্চতর স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। জগতে সকল জাতির খাদ্য তালিকা সমান নহে, এবং সকল জাতির রুচিও এক নহে। তবে মানবমাত্রেই স্বভাবতই তাহার শরীর-রক্ষার উপযোগী খাদ্যসমূহ গ্রহণ করিয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। যে কোন দেশের খাদ্য তালিকা দৃষ্টে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। এমন কোন জাতি দেখা যায় না, যাহারা কেবল মাত্র আমিষ বা কেবল মাত্র নিরামিষ আহারের উপরই জীবন ধারণ করিয়া থাকে। পরন্তু এই উভয় শ্রেণীর খাদ্যের সংমিশ্রণে তাহারা নিজেদের খাদ্য নির্ব্বাচন করিয়া লয়। আমাদের বাঙালীদের খাদ্যও এই মিশ্র খাদ্য এবং তাহাদের নির্ব্বাচনও যে অনেকটা বৈজ্ঞানিক কারণসম্ভূত, সে কথা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করেন।

নীলাম্বরী

ও কা'র মিলিয়ে গেল নীলাম্বরী সুনীল আকাশে
শ্যামল বনে সঘন সাজে মেঘের কাজলে।—সত্যেন দত্ত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার

B. H. P. Works.

পরলোক-প্রসঙ্গে ইস্‌লাম্

মুহম্মদ্ অব্‌দুল্লাহ্

গত আষাঢ় সংখ্যার "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "হিন্দুর পরলোকতত্ত্ব" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইস্‌লাম্ ধর্ম্মে সরকের অনন্তত্ত্ব কল্পনা করা হয়, তাঁহার ধারণা সম্বন্ধে ঐ প্রবন্ধ হইতে এইরূপ আভাষ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তিনি এই বিষয়টীকে ভাল রূপে অধ্যয়ন করেন নাই। প্রচলিত লৌকিক বিশ্বাস অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ ভ্রান্তি ও সঙ্কীর্ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও, উদার শাস্ত্রের মত তাহা নহে। ইস্‌লামে পরলোকতত্ত্বের বিষয়ে পবিত্র কুর্‌আনে কিরূপ মত পোষণ করা হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে স্থূল ভাবে ও সংক্ষেপে তাহাই আলোচিত হইবে। আশা করা যায়, ইহা হইতে বহু মুস্‌লিম্ ও অমুস্‌লিম্ এ সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, পরলোক সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবস্থা অপেক্ষা ইস্‌লামী শাস্ত্রের ব্যবস্থা কোনরূপে কম সন্তোষজনক নহে। যাহারা শিক্ষার অভাবে বা সঙ্গদোষে বা সাময়িক দুর্ব্বলতার কারণে পাপ করিয়া ফেলে, তাহারাও পাপ করে এবং অপরাধী ব্যাপ্ত হয়। জ্ঞানকৃত অপরাধই পাপ, কাজেই তাহার ফলে নরকভোগ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু পরে দেখা যাইবে যে, তাহা ভাবিয়া কাহারও শিহরিয়া উঠিবার কোন কারণ নাই। হিন্দুর ন্যায় ইস্‌লামে জন্মান্তরবাদ স্বীকার করা না হইলেও, পরলোক সম্বন্ধে এই উদার ধর্ম্মের মত অন্য কোন ধর্ম্ম অপেক্ষা কম যুক্তিপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ নহে।

পরলোক সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ইস্‌লাম্ সম্বন্ধে দুই-একটি দরকারী কথা বলিতে চাই। আরবী ইস্‌লাম্ শব্দের অর্থ, শান্তির মধ্যে প্রবেশ। ইহার অন্য অর্থ, অল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। ইস্‌লাম্ মুস্‌লিমের (১) ধর্ম্ম। মুস্‌লিম্ শব্দের অর্থ, যে অল্লাহ্‌র উপর সম্পূর্ণ রূপে আত্ম সমর্পণ করে, অর্থাৎ শান্তির মধ্যে প্রবেশ করে। অল্লাহ্ মুস্‌লিম্‌কে এই আখ্যা দিয়াছেন (পবিত্র কুর্‌আন্ ২২:৭৮)। সুতরাং যে কোন ব্যক্তি স্রষ্টা ও সৃষ্টের মধ্যে এই সম্বন্ধে বিশ্বাস করিবে এবং নিজের বিশ্বাস মত কাজ করিবে, সেই মুস্‌লিম্। আর একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শুদ্ধাত্মা প্রেরিত মহাপুরুষ মুহম্মদ্—তাঁহার উপর অল্লাহ্‌র শান্তি ও আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক—বলিয়াছেন, উদ্দেশ্য দেখিয়া সকল কার্য্যের বিচার করিবে।

এই প্রবন্ধে পবিত্র কুর্‌আনের মতই প্রকাশ করা হইয়াছে ; তবে কয়েকটী ক্ষেত্রে প্রেরিত মহাপুরুষেরও প্রবচন উদ্ধৃত হইয়াছে। সংখ্যার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলি সমস্তই মৌলবী মুহম্মদ্ অলীর (লাহোর) পবিত্র কুর্‌আনের ইংরাজী অনুবাদের মধ্যে পাওয়া যাইবে। বিসর্গের ন্যায় চিহ্নের (colon) উভয় পার্শ্বস্থিত সংখ্যাগুলির বাম দিকের অংশ অধ্যায়ের এবং দক্ষিণ দিকের অংশ শ্লোকের সংখ্যা ; যেমন, ১৭:১৫ ইহার মধ্যে অধ্যায়ের সংখ্যা ১৭ এবং শ্লোকের সংখ্যা ১৫। আর যেখানে এরূপ না হইয়া শুধু একটী সংখ্যাই লিখিত হইয়াছে, তাহা উক্ত গ্রন্থের পাদটীকার সংখ্যা।

পরলোক সম্বন্ধে ইস্‌লামের ধারণা সুস্পষ্ট। আত্মার অবস্থিতির জন্য এবং তাহার ক্রিয়াকলাপের জন্য দুইটী ক্ষেত্র আছে,—ইহলোক এবং পরলোক। ইহলোকের নির্দ্দিষ্ট সময় কাটিলে পরলোকবাসের সময় আসে। প্রথমটী হইতে দ্বিতীয়টীতে যাইবার জন্য মধ্যে যে দ্বার অতিক্রম করিতে হয়, তাহাই মৃত্যু। সুতরাং মৃত্যু শুধু স্থান ভেদে আত্মার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটায়। ইস্‌লামের মতে ইহজীবন ও পরজীবন দুইটি পৃথক্ জীবন নহে, বরং একটী অপরটীর অনুক্রম মাত্র। পবিত্র কুর্‌আনের মতে পরলোকে মানবাত্মার পুনরুত্থানের (Resurrection) পর যে মহাবিচার (Judgment) হইবে, তাহা ইহলোকেরই কৃত কর্ম্মের বিচার। ইহা হইতে আত্মার ঐহিক ও পারত্রিক অবস্থার ধারাবাহিকতার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

পবিত্র মহাগ্রন্থ কুর্‌আনে আছে, অল্লাহ্ বলিতেছেন, "আমি জিন্‌কে ও মানবকে সৃষ্টি করিয়াছি, যাহাতে তাহারা শুধু আমার উপাসনা করে (৫১:৫৬)। ইহা হইতে এইরূপ অর্থ করিবার কোন কারণ নাই যে, মানব শুধু উপাসনা, যোগযাগ, ধ্যান ইত্যাদি লইয়াই জীবন অতিবাহিত করিবে, এবং কোন সাংসারিক ক্রিয়ায় বা চিন্তায় কোন রূপে ব্যাপৃত থাকিবে না। ইস্‌লামে সাংসারিক ও পারমার্থিক দুইটি দিক্ কল্পনা করা হয় না, উভয়েরই এক উদ্দেশ্য এবং একই জীবন বলিয়া গণ্য করা হয়। কারণ সংসারের সমস্ত উৎকৃষ্ট এবং প্রয়োজনীয় বিধান মানিয়া চলা স্রষ্টার ইচ্ছা ও আদেশ এবং তাহাই স্বাভাবিক। শুধু ঐহিক ব্যাপারকে অথবা পারত্রিক ব্যাপারকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লইলে চলিবে না, উভয়কে না ধরিয়া শুধু যে কোন একটিকে সার বলিয়া অবলম্বন করিলেই আত্মার উপর অত্যাচার করা হয়। যাহারা এইরূপে আত্মার উপর অত্যাচার করে, পরলোকে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ইহাই পবিত্র কুর্‌আনের মত। অল্লাহ্‌র উপাসনা করা এবং তাহার ফলে পরলোকে কল্যাণ লাভ করাই মানব-সৃষ্টির উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু এই প্রকৃষ্ট ফললাভ করিতে হইলে প্রত্যেক মানব স্বষ্ট-রক্ষা ও তাহার উন্নতির জন্য নিজের শক্তি ও পরিমাণ অনুসারে কর্ত্তব্য পালন করিতে বাধ্য ; এবং সেই কারণেই তাহাকে, যে কোন্ বৈধ উপায়ে জীবিকার্জ্জন প্রভৃতি কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। মানবকে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে সে শরীরী জীব।

প্রেরিত মহাপুরুষ মুহম্মদ্—তাঁহার উপর অল্লাহ্‌র শান্তি ও আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক—বলিয়াছেন, ইহজীবন কৃষিক্ষেত্র, পরজীবনে ইহার ফললাভ ঘটিবে। ইহা হইতেও বেশ স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে,

---

(১) মুস্‌লিম্ শব্দের পরিবর্ত্তে মুস্‌ল্‌মান্ শব্দটীই সমধিক প্রচলিত। মুস্‌ল্‌মান্ শব্দটী সম্ভবতঃ আরবী মুস্‌লিম্ শব্দের পারসী বহুবচন মুস্‌লিমান্ শব্দের অপভ্রংশ। সুতরাং মুস্‌ল্‌মান্ শব্দটী ঠিক শিষ্ট প্রয়োগ নহে।

এই উভয় লোকের মধ্যে একটী মাত্র অভিন্ন জীবন বর্ত্তমান—মৃত্যুর উভয় পার্শ্বে সেই একই জীবনের রূপান্তর হয় মাত্র। আমার বক্তব্য, উভয় লোকেই একটিই জীবন থাকে,—কেবল লোক-ভেদে তাহার রূপ বা অবস্থার ভেদ হয়, আর মৃত্যুর দ্বারাই সেই ভেদ সংঘটিত হয়।

ইহলোকের দেহ আধিভৌতিক, পরলোকের দেহ আধ্যাত্মিক। ইহলোকেও আধ্যাত্মিক দেহ থাকে এবং তাহার অভাবে আধিভৌতিক দেহের কোন ক্ষমতাই থাকে না; কিন্তু সেই আধ্যাত্মিক দেহ এই নশ্বর (২) দেহের চক্ষুর গোচর হয় না। তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, কোন অবস্থাতেই এই আধ্যাত্মিক দেহ মানব-জ্ঞানের গোচর হয় না; যে সকল সৎক্রিয়াবান্ সাধু পুরুষ ও সাধ্বী স্ত্রী প্রকৃষ্ট জ্ঞানের সাহায্যে নৈতিক ও আত্মিক জগতে উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়া থাকেন, তাঁহারাই মানবজীবনের এই পরম কাম্য বস্তু লাভ করিয়া কৃতার্থ হন; কিন্তু তাহাও আধ্যাত্মিক চক্ষুর সাহায্যে সাধিত হয়, জড় চক্ষুর সে বিষয়ে কোনই ক্ষমতা নাই। "এবং তাহাদিগকে উদ্যানে প্রবেশ করাও যাহা তিনি (অল্লাহ্) তাহাদিগকে (ইহজীবনেই) জানাইয়া দিয়াছেন" (৪৭:৬)।

ইহকালের কৃত কর্ম্মে শুভ বা অশুভ ফল পরলোকে লাভ করা যায়, এবং কোন কোন অবস্থায় ইহলোকেও তাহার আস্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, ব্রতাচারী পুণ্যাত্মারাও নানারূপ দুঃখ, কষ্ট ও বিপদে পতিত হইয়াছেন। এ সকল পরীক্ষা রূপেই তাঁহাদের নিকট আসিয়া থাকে (২:১৫৫)।

এইবার স্বর্গ ও নরকের কথা। পবিত্র ধর্ম্ম ইস্‌লামের উদার মতানুসারে নরককে অবাধ্য ও পাপী লোকদিগের চরিত্র-সংশোধনের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ১২১০; ৫৭:১৫, ২৪৫১)। নরকের শাস্তি অতি কঠোর এবং প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দাহন ন্যায়ানুমোদিত হইলেও যথার্থই ভয়ঙ্কর, কিন্তু পাপীর জন্য এই শাস্তিরই প্রয়োজন। প্রত্যেক মানবকেই নানা রূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আত্মার উন্নতি করিবার জন্য বহুবিধ প্রলোভনের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। যাহারা এই সমস্ত তুচ্ছ প্রলোভনের মায়ায় পড়িয়া মূঢ়ের ন্যায় আত্মসংযমের কথা ভুলিয়া যায়, তাহাদের আত্মা উচ্ছৃঙ্খলতার বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমশঃ মলিন হইয়া পড়ে। ভেজাল সোণাকে খাদ বাহির করিয়া বিশুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নরক-বহ্নিতে নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা আছে (২৫২১)। এই নরক-বাসের ফলে মানবাত্মার বিশোধনের পর সে ক্রমে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে (২৭৯০)।

এই প্রসঙ্গে একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যে সকল অনুন্নত সমাজ অজ্ঞতার মধ্যে নিমগ্ন থাকে, অথবা যে সমাজের মধ্যে কোন তত্ত্ববাহক সুসংবাদ ও সাবধান-বাণী লইয়া আসেন নাই, সেই সকল লোককে মৃত্যুর পর পাপী বলিয়া গণ্য করা হইবে না। কোন সমাজে সত্যধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পর যাহারা সেই ধর্ম্মের বিধান অমান্য করিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারাই পাপী এবং তাহারাই শাস্তি পাইবে (১৭:১৫, ১৪১১)।

নরকবাসিগণ অনেক ক্ষেত্রে নরকের শাস্তি কিছু পরিমাণে এই জগতেই ভোগ করিবে। উচ্ছৃঙ্খলতার বশে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য বার বার চেষ্টা করিয়াও যখন তাহারা বিফলমনোরথ হইবে, তখন হৃদয়ের মধ্যে যে তীব্র যাতনা অনুভব করিবে, তাহাই নরক-যন্ত্রণা। আলঙ্কারিক অর্থে পবিত্র কুর্‌আনে এই কথাটি বর্ণিত হইয়াছে;—"অতঃপর তাহাকে প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর, তৎপরে তাহাকে সত্তর হস্ত দীর্ঘ শিকলের মধ্যে ফেলিয়া দাও" (৫৯:২১, ৩২; ২৫৫৯)। কিন্তু অনেক সময় এই শাস্তি এই জীবনে পরিস্ফুট না হইয়া পরজীবনেই সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিবে। "এবং তাহারা (ইহজীবনে) যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিল, (পরজীবনে) তাহার অপকৃষ্ট ফল তাহাদের নিকট স্পষ্ট হইয়া পড়িবে, এবং যে বস্তুর প্রতি তাহারা পরিহাস করিত, ঠিক তাহাই তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে" (৩৯:৪৮, ২১৬৬)। তবে যদিও নরকের শাস্তি সকল সময় ইহলোকে সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে না, অথবা যদিও পাপী সকল সময় ইহজীবনে নরকের শাস্তি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না, তথাপি তাহা প্রকৃতপক্ষে এই লোকেই আরব্ধ হইয়া থাকে। জ্ঞানময় অল্লাহ্ মানবের আত্মার জন্য যে সকল স্বভাবসিদ্ধ বিধান পবিত্র কুর্‌আনে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার যে সমস্ত নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকল বিধান ও নিদর্শন যাহারা ক্ষমতা থাকিতেও দেখে না বা দেখিয়াও মান্য করে না, তাহারাই অন্ধের ন্যায় বিপথে চলিতে থাকে। এইরূপ অন্ধকেই তাহার অন্ধত্ব মোচন করিয়া প্রকৃত আলোক দর্শনের শক্তি ও যোগ্যতা দিবার জন্য নরকবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। নরকের মধ্যে কেহই প্রকৃত আলোক দেখিতে পাইবে না, অথবা যাহার আলোক দর্শনের মত অবস্থা হইবে তাহাকে নরকে বাস করিতে হইবে না; কেবল আলোক দর্শনের পূর্ব্বে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও বিশোধনের জন্যই নরকে থাকিতে হইবে। সুতরাং নরকে যাহারা থাকিবে তাহারাও আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব হইতে মুক্ত থাকিবে না। "এবং যে কেহ ইহাতে (অর্থাৎ ইহলোকে) অন্ধ থাকিবে, পরলোকেও (অর্থাৎ নরকেও) সে অন্ধ থাকিবে" (১৭:৭২, ১৪৫২)। ইহার অর্থ আধ্যাত্মিক অন্ধতাই নরক।

এইবার নরক কাহাকে বলে, এবং সেই সম্বন্ধে পবিত্র কুর্‌আনের কি মত, তাহার উল্লেখ করিব। নরককে সাধারণতঃ প্রচণ্ড ও প্রজ্বলিত অগ্নির আকারেই চিত্রিত করা হয়। আবার অনেক সময় অগ্নি ব্যতীত অন্য ভাবেও ইহার বহুবিধ বিভীষিকাময় রূপের কল্পনা করা হয়। সরলমতি হইলে মানুষ এই সমস্ত কল্পনা হইতেই আতঙ্কে অস্থির হইয়া পড়ে এবং তাহা হইতে দূরে থাকিবার প্রয়াস পায়। শুধু মুস্‌লিম্ সম্প্রদায় নহে, পরলোক ও স্বর্গ-নরকে বিশ্বাসী সকল সম্প্রদায়েরই

(২) স্থূল অর্থে এই দেহকে নশ্বর বলিলাম। সূক্ষ্ম ভাবে দেখিলে এই দেহেরও বিনাশ হয় না, শুধু রূপান্তর হয় মাত্র।

মধ্যে বোধ হয় এই ভাবটী আছে, এবং ধর্ম্ম ও সমাজের দিক্ দিয়া ইহা যে মঙ্গলকর, তাহা বলাই বাহুল্য। পবিত্র কুর্‌আনে এই নরকাগ্নিকে "গভীর পরিতাপ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। "এইরূপে অল্লাহ্ তাহাদিগের নিকট গভীর পরিতাপের আকারে তাহাদিগের কর্ম্মসমূহ তাহাদিগকে দেখাইবেন, এবং তাহারা সে অগ্নি হইতে বাহির হইতে পারিবে না" (২:১৬৭, ২০৬)। অন্যত্র অভিসম্পাতের সহিত নরকের তুলনা করা হইয়াছে। তাহাদের পুরস্কার এই যে, অল্লাহ্‌র, (স্বর্গীয়) দূতগণের এবং মানবগণের সকলেরই অভিসম্পাত তাহাদের উপর হইবে, তাহারা ইহার মধ্যে বাস করিবে (৩:৮৬, ৮৭; ৪৬২)। এই অভিসম্পাতের ফলে তাহারা নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবে, এ ক্ষেত্রে ইহাই বক্তব্য। নরকের সহিত অন্য একটি বস্তুর তুলনা করা হইয়াছে, তাহা তীব্র যন্ত্রণা। ইহলোকে এই যন্ত্রণাই মানবের মৃত্যু ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট, অর্থাৎ এই জীবনে ইহা অসহ্য, কিন্তু নরকে পাপীকে অতি তীব্র হইলেও এই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, মৃত্যুর শীতল আশ্রয় তাহাকে দেওয়া হইবে না। কারণ নরক শাস্তিরই আবাস এবং মৃত্যুর কোমল স্পর্শ মানব জীবনের জন্য আশীর্ব্বাদ লইয়াই উপনীত হয়।

(১৩০৪)। আর একটী স্থলে অপমানের সহিত নরকের তুলনা করা হইয়াছে। "নিশ্চিতই আজ অবিশ্বাসিগণের উপর অপমান ও অনিষ্ট রহিয়াছে" (১৬:২৭, ১৩৬১)। মানবাত্মার জন্য নরক যে কিরূপ জঘন্য আবাস এবং তাহার শাস্তি যে কিরূপ হীন ও কঠোর, তাহা পবিত্র কুর্‌আনে অতি সুন্দররূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে উক্ত হইয়াছে, "নিশ্চিতই তাহারা সেদিন তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে প্রত্যাখ্যাত হইবে" (৮৩:১৫, ২৬১৪)। ইহা পরলোকের শাস্তি, সুতরাং ইহা নরকেরই শাস্তি।

নরকের মধ্যে বিভিন্ন স্তর আছে। এই সকল স্তরের সংখ্যা সাত (১৫:৪৪) এবং প্রত্যেক স্তরের জন্য এক একটি দ্বার আছে। পবিত্র কুর্‌আনের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে নরকের মোট সাতটী নামের উল্লেখ আছে। যথা:—(১) জহন্নম্, নরক; (২) লযা, জ্বলন্ত অগ্নি; (৩) হুতমা, নিদারুণ বিপত্তি; (৪) সা'ঈর্, প্রজ্বলিত হুতাশন; (৫) সকর্, যন্ত্রণাদায়ক অগ্নি; (৬) জহীম্, প্রচণ্ড অগ্নি; (৭) হাবিয়া, অতলস্পর্শ নরক; (১৩৪১)।

শুধু অধার্ম্মিকেরাই নরকে যাইবে, প্রকৃত ধার্ম্মিকগণকে কোনও সময়েই কোন ক্রমে নরকে যাইতে হইবে না (১৫৫৮)। হিন্দু মতে পাপ ও পুণ্যের মধ্যে যাহা সমধিক অনুরাগের সহিত আচরিত হইবে তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প অনুরাগের সহিত আচরিত বিপরীত ফলকে বাধা দিবে, এরূপ ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ইস্‌লামে সেরূপ মত পোষণ করা হয় নাই, বরং তাহার বিপরীত মতই ব্যক্ত হইয়াছে। ইস্‌লামের মতে নরকে নানারূপ শাস্তির ব্যবস্থা আছে, এই সকল বিভিন্নতা পাপের প্রকৃতি অনুসারেই হইয়া থাকে। যে যে পরিমাণে পাপ করিবে, তাহার শাস্তিও সেই পরিমাণেই হইবে, কোনরূপে তাহার অধিক হইতে পারিবে না (৬:১৬১; ৮৪১)। যিনি পাপপুণ্যের বিচার ও ফলাফল নির্দ্দেশ করিবেন, তিনি কি সকল বিচারকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নহেন? (৯৫:৮) নারকীদের জন্য যে শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে, তাহা তাহার কৃত পাপের অনুরূপই হইবে (৭৮:২৬, ২৬৪৬)। নরকবাসীরা প্রকৃত জীবনও ভোগ করিতে পাইবে না, আর তাহাদের মৃত্যুও হইবে না, কারণ প্রকৃত জীবন কেবল পুণ্যবান্ লোকদিগেরই জন্য এবং মৃত্যু হইলে তাহারা শাস্তি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া শাস্তি উপভোগ করিবে; কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা উদ্দেশ্য নহে (৮৭:১২, ১৩; ২৭১৯। ২০:৭৪; ১৫৯২)। সুকৃতি হউক বা দুষ্কৃতি হউক, যে যে কাজ করিবে সে তাহারই ফল লাভ করিবে (৯৯:৭, ৮; ২৭৮৬ক)।

পরকালে নূতন করিয়া নরকের সৃষ্টি হইবে না, ইহা পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান আছে; তবে এক্ষণে ইহা মানবচক্ষুর গোচরীভূত নহে এবং পুনরুত্থানের দিবসে ইহাকে স্পষ্ট করিয়া দেখান হইবে। (২৬:৯১; ১৮১৮)।

মানব সমাজে প্রায়ই দেখা যায়, নরক সম্বন্ধে সাধারণতঃ অস্পষ্ট ও ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্তু ইস্‌লাম্ ধর্ম্ম সুস্পষ্ট ভাষায় এই ভ্রান্তি দূর করিয়া প্রকৃত সত্যের আবরণ উন্মোচন করিয়া দিয়াছে। সচরাচর লোকে যখন নরকের বিষয়ে আলোচনা করে, তাহারা তখন শাস্ত্রোক্ত আলঙ্কারিক বাক্যগুলিকে প্রকৃত সত্য বলিয়া ধরিয়া লয়; তখন তাহারা ভাবিতে পারে না যে, নরক বিশেষ করিয়া পরলোকের ব্যাপারেই অবস্থিত এবং পরলোকের সকল ব্যাপারই আধ্যাত্মিক। তবে আলঙ্কারিক বাক্যগুলির প্রয়োগ কেবল এই জন্যই করা হইয়াছে যে, তাহাতে লোকে জড়জগৎ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ হইতে কল্পনার সাহায্যে শাস্তির প্রচণ্ডতা কতক পরিমাণে ধারণা করিতে পারিবে। পবিত্র কুর্‌আনে উক্ত হইয়াছে, "ইহা (নরক) অল্লাহ্ কর্ত্তৃক প্রজ্বালিত অগ্নি, যাহা হৃদয়সমূহের উপর দিয়া উত্থিত হয়" (১০৪; ৬, ৭)। ইহা হইতে বুঝা যায়, মানবের হৃদয়ের মধ্যেই নরক অবস্থিত, ইহার কোন পৃথক্ আবাসস্থান নাই। ইহলোকে ইহার অবস্থা এইরূপ, কিন্তু পরলোকে ইহা আরও সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিবে। (২৭৯৮)।

নরকের সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিতে বাকী আছে। সাধারণতঃ অমুস্‌লিমের এবং বহু মুস্‌লিমেরও ধারণা আছে যে, পবিত্র কুর্‌আনের মতে পাপী অনন্তকালের জন্য নরক ভোগ করিবে। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। পাপের গুরুত্ব হিসাবে নরকবাসের স্থায়িত্ব নির্দ্দেশ করা হয়। যে সকল স্থানে নরকবাস অনন্তকালের জন্য বলিয়া অর্থ করা হয়, তাহার অর্থ আরবী কোষকারগণ দীর্ঘকাল বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এই সকল স্থলের ঠিক পরবর্ত্তী একটু অংশ পাঠ করিলে, ঐ সকল শব্দের অর্থ যে অনন্তকাল না হইয়া দীর্ঘকাল হইবে, তাহা স্থির করা সুসাধ্য হইয়া যায়, এবং এই অর্থ প্রয়োগ করাই সঙ্গত ও কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। পবিত্র মহাগ্রন্থের এই উক্তির প্রতিপোষণের

জন্য প্রেরিত মহাপুরুষ মুহম্মদের—তাঁহার উপর অল্লাহ্‌র শান্তি ও আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক—কয়েকটী অতি বিশ্বস্ত প্রবচন উদ্ধৃত করিলাম। তিনি বলিয়াছেন ঃ—(১) অতঃপর অল্লাহ্‌ বলিবেন, (স্বর্গীয়) দূতগণ ও তত্ত্ববাহক এবং বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ সকলেই পাপীদিগের জন্য মধ্যস্থতা করিয়াছে, এবং এক্ষণে সকল দয়াশীলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়াশীল (অর্থাৎ অল্লাহ্‌) ছাড়া তাহাদের জন্য মধ্যস্থতা করিতে আর কেহ বাকী নাই। এই বলিয়া তিনি অগ্নি (অর্থাৎ নরক) হইতে এমন একদল লোকের কতগুলিকে বাহির করিবেন, যাহারা কখনও কোনও সৎকার্য্য করে নাই। (২) নিশ্চিতই নরকের উপর এমন এক দিন আসিবে যখন তাহা একটী শস্যক্ষেত্রের ন্যায় দেখাইবে, যাহা অল্পকাল শ্রীসম্পন্ন থাকিবার পর শুকাইয়া গিয়াছে। (৩) নিশ্চিতই নরকের উপর এমন এক দিন আসিবে যখন তাহার মধ্যে একটীমাত্রও মানব থাকিবে না। (৪) যদি নরকের অধিবাসিগণ মরুভূমির বালুকণার ন্যায় অসংখ্যও হয়, তথাপি এমন এক দিন আসিবে যখন তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনা হইবে (১২০১)।

এইবার স্বর্গের কথা। প্রথমেই জ্ঞাতব্য বিষয় হইতেছে, স্বর্গ কি এবং কোথায়? স্বর্গ একটী বিশাল রাজ্য, পরম সুখের স্থান ইত্যাদি,—ইহাই স্বর্গ সম্বন্ধে লৌকিক ধারণা। এই ধারণা অবশ্যই সম্পূর্ণ রূপে শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ইহাকেই যথার্থ মত বলা যায় না। শাস্ত্রে যে সকল কথার উল্লেখ আছে, সাধারণ লোকে তাহার শব্দগত অর্থই ব্যবহার করে, কিন্তু তাহা যে রূপক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং তাহার অর্থ যে প্রচলিত অর্থ অপেক্ষা অনেক বেশী গভীর, তাহা অনেকে বুঝিতে পারে। স্বর্গ সম্বন্ধে পবিত্র কুর্‌আনে বলা হইয়াছে যে, ইহা আত্মার উন্নত অবস্থামাত্র; কোনও স্থানের নাম নহে। স্বর্গ ও নরককে দুইটী অবস্থা বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (২৪৫৪ক)। স্বর্গ, আকাশ সকল (৩) ও পৃথিবীতে ব্যাপ্ত (৩ঃ ১৩২; ২৪৫৪ক)। রূপক অর্থে স্বর্গকে সুখের স্থান, উদ্যান ইত্যাদি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (১২৮৭, ২২৯৮)। স্বর্গে পুণ্যবান্ লোকদিগকে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট ও কল্যাণকর অবস্থায় আনা হইবে, তাহা এ জগতে সাধারণ মানবের জ্ঞানগোচর নহে। এ বিষয়ে পবিত্র কুর্‌আন্ বলিতেছেন, "কোন আত্মা জানে না, তাহার নয়নকে তৃপ্ত করিবার জন্য কি সঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে; সে যাহা করিয়াছে (ইহা) তাহারই পুরস্কার" (৩২ঃ ১৭)। ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া প্রেরিত মহাপুরুষ মুহম্মদ্—তাঁহার উপর অল্লাহ্‌র শান্তি ও আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক—বলিয়াছেন, "অল্লাহ্‌ বলিয়াছেন, আমি আমার পুণ্যবান্ সেবকদিগের জন্য যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, কোন চক্ষু তাহা দেখিতে পায় নাই, কোন কর্ণ তাহা শুনিতে পায় নাই, এবং কোন মানবহৃদয় তাহার ধারণা করিতে পারে নাই"।

(৩) সকল গ্রহেরই একটী করিয়া আকাশ আছে বলিয়া আকাশ শব্দটী বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে (২৫১৬)।

এক্ষেত্রে অবশ্য জড় দেহের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে; এবং ইহা হইতেও সপ্রমাণ হইতেছে যে, স্বর্গের সম্বন্ধে যে সকল পার্থিব বস্তুর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা রূপক অর্থেই ব্যবহৃত)। কিন্তু সাধারণ লোকের জ্ঞানগোচর না হইলেও যাঁহারা নিয়মিতভাবে ও নিষ্ঠার সহিত অল্লাহ্‌র আদেশ ও বিধানসমূহ মানিয়া চলেন, অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ, তাঁহারা এই জগতেই স্বর্গের বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারেন। পবিত্র কুর্‌আনে আছে, "এবং তাহাদিগকে উদ্যানে প্রবেশ করাও যাহা তিনি (অল্লাহ্‌) তাহাদিগকে জানাইয়াছেন" (৪৭ঃ৬)। ইহা ছাড়া ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ এ জগতে স্বর্গসুখ ভোগ করিবারও সৌভাগ্য লাভ করেন। এ সৌভাগ্য কোন কোন বিশিষ্ট কার্য্যে সাফল্য লাভ করিলে ভোগ করা যায়, এবং পরলোকে যাহা ভোগ করা যায় তাহা পূর্ব্বকৃত সুকৃতির পুরস্কার (২১০৯, ২২৯৬)।

পবিত্র কুর্‌আনে বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে যে স্বর্গে পরিপূর্ণ শান্তি ব্যতীত অন্য কিছুই বিরাজ করিবে না। তথায় যে সকল কথা শুনা যাইবে তাহাতে শুধু শান্তিই সূচিত হইবে। এ বিষয়ে পবিত্র গ্রন্থের উক্তি, "তাহারা তথায় কেবল "শান্তি" ব্যতীত অন্য কোন অনর্থক কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইবে না" (১৯৬২)। স্বর্গোদ্যানকে পরিপূর্ণ শান্তি বলিয়াও আখ্যাত করা হইয়াছে (১৫৫৫)।

মুস্‌লিমের স্বর্গ সকলপ্রকার শোকদুঃখ ও শ্রান্তিক্লান্তির অতীত। মহা শান্তি ও কল্যাণেরই আবাস। এ সম্বন্ধে পবিত্র কুর্‌আনে সুস্পষ্ট ভাষায় উক্ত হইয়াছে, "নিশ্চিতই যাহারা (অনিষ্টের কবল হইতে) আপনাদিগকে রক্ষা করিয়াছে, তাহারা উদ্যানসকল ও ঝরণাসকলের মধ্যে থাকিবে; শান্তিতে, নিরাপদে সেগুলিতে প্রবেশ কর। এবং আমরা তাহাদের বক্ষঃস্থল হইতে বিদ্বেষের যাহা কিছু (থাকিবে) তাহার উচ্ছেদ করিব,—(তাহারা) ভ্রাতৃগণের ন্যায় (হইবে)...। শ্রান্তি তাহাদিগকে ক্লেশ দিবে না, কিংবা তাহারা তাহা হইতে কখনও দূরীভূত হইবে না" (১৫ঃ ৪৫—৪৮)। সুতরাং স্বর্গবাসিগণ সকল দুঃখকষ্ট ও হীনভাব হইতে সদা মুক্ত থাকিবেন এবং তাঁহাদের স্বর্গবাস অনন্তকালের জন্য হইবে। ইহা দ্বারা অস্থায়ী স্বর্গবাস সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের যে মত আছে, তাহার বিরোধিতা করা হইয়াছে (১৩৪২)। এই বিষয়ে পবিত্র কুর্‌আনে অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, "এবং তাহারা বলিবে ঃ (সকল) স্তুতিবাদ অল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদিগের হইতে দুঃখকে দূরীভূত করিয়াছেন...; তথায় শ্রান্তি আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না, অথবা ক্লান্তি আমাদিগকে তথায় ক্লেশ দিবে না" (৩৫ঃ৩৪,৩৫)। স্বর্গে শান্তির ভাব যে কিরূপ প্রবল ও উন্নত, তাহা এই সকল শ্লোকে স্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত হইয়াছে।

অজ্ঞ লোকদের মধ্যে একটী মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, উদার ইস্‌লাম্ ধর্ম্মের শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীজাতির স্বর্গে প্রবেশ নিষেধ। পবিত্র কুর্‌আনে সে বিশ্বাসের প্রতিবাদ করা হইয়াছে (৪২,২৩৫৬)। ইন্দ্রিয় পরতার উল্লেখ করিয়া মুস্‌লিমের স্বর্গের নামে যে অপবাদ

প্রচার করা হয়, তাহারও মূলে কোন সত্য নাই। যাঁহারা ভ্রান্ত ভাবে এই মত পোষণ করেন, তাঁহারা "হুর্‌"র উল্লেখ করিয়া নিজেদের মতের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু "হুর্‌"—সম্বন্ধে তাঁহারা ঠিক ভাবে অর্থগ্রহ করিতে পারেন না। "হুর্‌" শব্দের প্রকৃত অর্থ পুণ্যাত্মা সঙ্গিগণ বা সঙ্গিনীগণ। পবিত্র কুর্‌আনে ইহা মঙ্গল বা আশীর্ব্বাদের অর্থেই আলঙ্কারিক ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে (২৩৫৬)।

অতঃ, স্বর্গ আধ্যাত্মিক অবস্থাবিশেষ, এবং আধ্যাত্মিক সুখভোগই স্বর্গভোগ, স্বর্গের সহিত আধিভৌতিকতার সম্পর্ক নাই (২১০৯ক)। স্বর্গে হীন ইন্দ্রিয়পরতার লেশমাত্র নাই। যে সকল পুণ্যাত্মা সাধু পুরুষ ও স্ত্রী নানারূপ পার্থিব প্রলোভন ও মোহ অতিক্রম করিয়া, সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহুবিধ কঠোর সাধনার ফলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া স্বর্গবাসের অধিকারী হইবেন, তাঁহারা যে তথায় ইন্দ্রিয়-পরতার প্রশ্রয় দিবেন, এরূপ চিন্তা করাও বাতুলতা। স্বর্গ নিরবচ্ছিন্ন শান্তির আবাস; "অল্লাহ্‌ শান্তির আবাসের প্রতি আহ্বান করিতেছেন" (১০ঃ২৫, ১১২৩)। সর্ব্ববিধ স্বর্গসুখকে একমাত্র "শান্তি" শব্দদ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে (৩৬ঃ৫৮, ২০৯১)। অল্লাহ্‌র মহিমাকীর্ত্তন ও শান্তিবাণীর সম্বন্ধে অন্যত্র সুস্পষ্ট ভাষায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ঃ—"ইহার মধ্যে তাহাদের প্রার্থনা হইবে ঃ তোমার মহিমা, হে অল্লাহ্‌! এবং ইহার মধ্যে তাহাদের অভিবাদন হইবে ঃ শান্তি; এবং তাহাদের অন্তিম প্রার্থনা হইবে ঃ স্তুতিবাদ অল্লাহ্‌র, যিনি জগৎসকলের প্রভু (১০ঃ১০)।" "তাহারা তাহার মধ্যে শান্তি, শান্তি শব্দ ব্যতীত কোন অনর্থক বা পাপময় কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইবে না" (৫৬ঃ২৫, ২৬)।

স্বর্গের বৈশিষ্ট্য পরব্রহ্মের দর্শনে, এবং ইহাই স্বর্গবাসীর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। পরমাত্মার দর্শনই আত্মার পরম কাম্য; উৎকৃষ্ট আত্মার জন্য ইহাই ব্যবস্থা, যেমন এই দর্শন হইতে বিমুখতাই উচ্ছৃঙ্খল আত্মার নরক। অল্লাহ্‌র দর্শনলাভই স্বর্গবাসীর শ্রেষ্ঠ আনন্দ (২৩৪৩)। এই দর্শনলাভের আনন্দ স্বর্গবাসিগণ অনন্ত কাল ধরিয়া ভোগ করিতে থাকিবেন। "যাহাদিগকে সুখী করা হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে, তাহারা উদ্যানে থাকিবে, যতকাল আকাশসকল ও পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে ততকাল তাহাতে বাস করিবে...; (ইহা) একটী দান যাহা কখনও কর্ত্তিত হইবে না" (১০ঃ১০৮, ১২০২)। কিন্তু ইহলোকের সুকৃতির ফলে পরলোকে স্বর্গসুখ ভোগ করাই স্বর্গবাসিগণের চরম সার্থকতা নহে, সেখানেও তাঁহারা আত্মার অধিকতর উন্নতির জন্য নিরত থাকিবেন। যিনি উন্নতির যে স্তরে থাকিবেন, তিনি সেই স্তর অতিক্রম করিয়া পরবর্ত্তী উন্নততর স্তরে উপনীত হইবার জন্য চেষ্টা করিবেন। "কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে যাহারা তাহাদের প্রভুর প্রতি (কর্ত্তব্যের বিষয়ে) অবহিত থাকে, তাহারা উন্নত স্থান সকল লাভ করিবে, তাহাদের উপর উন্নততর স্থান সকল থাকিবে" (৩৯ঃ২০, ২১৫৯)। তথায় ক্রমোন্নতির পথে তাঁহারা প্রার্থনা করিবেন, "আমাদের প্রভু! আমাদের জন্য আমাদের জ্যোতিঃ সম্পূর্ণ কর, এবং আমাদিগকে পরিত্রাণ দাও" (৬৬ঃ৮)। এইরূপে তাঁহারা অনন্তকাল ধরিয়া একটীর পর আর একটি স্তরে উন্নতিলাভ করিতে থাকিবেন, সে উন্নতির কোন সীমা নাই। পরবর্ত্তী স্তরকে শেষের স্তর মনে করিয়া সাধনা-নিরত আত্মা যখন তাহাতে উন্নীত হইবেন, তখন আবার তিনি তাঁহার পরের স্তর দেখিয়া তাহাতে যাইবার জন্য সচেষ্ট হইবেন। এই ভাবেই অনন্তকাল ধরিয়া সকল আত্মাই অনন্ত সাধনায় ব্যাপৃত থাকিবেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এক সময়ে নরকে একটী আত্মাকেও থাকিতে হইবে না। সকল মলিনতা হইতে মুক্ত হইলে নরকবাসী আত্মাও স্বর্গলাভ করিয়া অপর সকলের মত এই মহাসাধনায় নিরত হইবেন এবং ক্রমশঃ অনন্ত যাত্রার পথে অগ্রসর হইতে থাকিবেন (২৫২১)।

আত্মা যখন উচ্ছৃঙ্খলতা, অবাধ্যতা ও অসংযম অথবা আত্মসংযমে অসামর্থ্যের কারণে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সে নিজের অবস্থা সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করিতে পারে। কিন্তু অল্লাহ্‌র পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা হইতে সে সেই অবস্থায় নিজের ইচ্ছানুসারে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। তাহার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য তাহাকে সকল ব্যাধি ও মলিনতা হইতে মুক্ত করিয়া প্রকৃত জ্যোতির্দর্শনের যোগ্য করিবার জন্য সেই কঠোর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ইহা পরলোকের ব্যবস্থা। কিন্তু যাঁহারা এই জগতেই পুণ্যময় জীবন যাপন করিতে পারেন, তাঁহাদিগকেও প্রথমে সমাজের অত্যাচার, প্রবৃত্তির তাড়না, আত্মসংযমের কঠোর সাধনা ইত্যাদি যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তবে উন্নত অবস্থা লাভ করিতে হয়। ইহলোক বা পরলোক উভয়ত্রই যিনি এই অবস্থায় আসিয়া থাকেন, তাঁহাকেই আধ্যাত্মিক উন্নতির উৎকৃষ্ট স্তরে উন্নীত করা হয়। তখন তিনি উপাসনা প্রভৃতি কার্য্যকে কঠোর বোধ করেন না, বরং তাহা আগ্রহ ও নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া থাকেন,—ইহাই এখন তাঁহার আত্মার খাদ্যে পরিণত হয় (২৭৩২)। এই অবস্থার বিষয়ে পবিত্র কুর্‌আনের বাণী এইরূপ ঃ—"হে শান্তিস্থিত আত্মা! তোমার প্রভুর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন কর; এক্ষণে আমার সেবকদিগের মধ্যে প্রবেশ কর, এবং আমার উদ্যানে প্রবেশ কর" (৮৯ঃ২৭-৩০)।

এক্ষণে স্বর্গ ও নরকের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ ঃ—স্বর্গ ও নরক কোন স্থান বিশেষের নাম নহে, আত্মার দুইটি পৃথক্ অবস্থার নাম; রূপক অর্থে এইগুলিকে স্থান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। স্বর্গ ও নরকের সকল বস্তুই আধ্যাত্মিক, তবে সাধারণ লোককে বুঝাইবার জন্য রূপক অর্থে সেগুলিকে পার্থিব বস্তুর ন্যায় উল্লেখ করা হইয়াছে। নরকভোগ অনন্ত নহে, কিন্তু স্বর্গবাস অনন্ত। মলিনাত্মা ব্যক্তিদিগকে তাহাদের আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত পাপের গুরুত্ব বিচার করিয়া নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নরকে নিক্ষেপ করা হইবে, যাহাতে তাহারা অনুতাপ প্রভৃতির দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন করিয়া স্বর্গবাসের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে।

অকাল-মৃত্যু ও বাল্য-বিবাহ

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দে

গত কয়েক মাসের 'ভারতবর্ষে' উপরিউক্ত বিষয়ে নানা জনে আলোচনা করেছেন। বিষয়টি গুরুতর, সুতরাং আবশ্যকের চেয়ে বেশী যে আলোচনা হয়েছে এমন বলা যায় না। এ বিষয়ে নানা জনে নানা দিক থেকে আলোচনা করে নূতন কথা ও নূতন যুক্তি দেখালে সমাজের উপকার হবার সম্ভাবনা। আমি 'ভারতবর্ষে'—পূর্ব্ব-পূর্ব্ব আলোচনা-কারীরা বলেন নি, এমন নূতন যুক্তি ও নূতন কথার অবতারণা করে, নূতন ধরণে আলোচনা করার চেষ্টা করব। ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ে যা আলোচনা হয়ে গিয়েছে, নীচে তার সার সংগ্রহ করে দিয়ে, পরে নিজের মন্তব্য সংক্ষেপ প্রকাশ করব।

গত বর্ষের ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের কাগজে শ্রীমতী অনুরূপা দেবী এ বিষয়ে প্রথমে আলোচনা করেন। তাঁর মত সংক্ষেপে এই :—

(১) বাল্য বিবাহ অকাল মৃত্যুর কারণ নয়

কারণ, দেখা যায় যে, আমাদের পিতা, পিতামহ, ও প্রপিতামহ ও তাঁহাদের সমসাময়িক অনেক অনেকের জানা লোক বাল্য-বিবাহের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘজীবী ছিলেন।

(২) অকাল মৃত্যুর আসল কারণ—

অসার ও ভেজাল খাদ্য, বিরুদ্ধ-ভোজন, দূষিত, বদ্ধ বায়ু ও ধুম সেবন, দায়িত্বহীন, আচারশূন্য, নিয়মানুবর্ত্তিতাশূন্য, প্রাচীন হিন্দু ও আধুনিক ইয়োরোপীয় উভয় আচার-ভ্রষ্ট খিচুড়ী নবীন পন্থা, পরীক্ষার চাপ, জীবিকা অর্জ্জনের জন্য আবাল্য পণ্ডশ্রম, দুশ্চিন্তা ও নৈরাশ্য।

(৩) উপায়—

সমস্ত বালক বালিকার প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা, অর্থাৎ হিতাহিত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা, সংযম শিক্ষা, চরিত্র গঠন।

(৪) বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধ মত—

দাসমনোভাব বশতঃ বিজেতা ইংরাজদের অন্ধ অনুকরণ ইচ্ছা সঞ্জাত। বিপক্ষদের ভাবখানা এই—ইংরাজরা দীর্ঘজীবী, আমরা নই; আমাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ আছে, তাদের মধ্যে নেই; তারা বলে বাল্যবিবাহই অকাল-মৃত্যুর কারণ, তাই ঠিক।

(৫) কিন্তু ইয়োরোপীয় ও আমাদের সমাজের প্রভেদ—

১। তাদের অপেক্ষা আমাদের যৌবন শীঘ্র আসে ও যায়।

২। গড় পরমায়ু আমাদের ২৩ বৎসর, ইংলণ্ডের ৪৬, জাপানের ৪৪।

(৬) ইয়োরোপীয়দের দীর্ঘায়ু হওয়ার আসল কারণ—

ভাল আহার, বাস, ব্যায়াম, আমোদ,—এ সকলের

নিয়মানুগামিতা, বিশেষতঃ বিদ্যাশিক্ষায় অসাধারণ পরিশ্রমের অভাব এবং দুশ্চিন্তা ও নৈরাশ্যের অভাব।

(৭) বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন

সেকালে বাল্য বিবাহ হলেই সকলে ছেলের মা হতেন না। স্বামীর সঙ্গে দেখা শুনা হলেও স্বতন্ত্র গৃহে বাস করতেন।

(৮) বাল্য বিবাহের গুণ—

১। বালিকা বধূ শ্বাশুড়ী, দেবর, ননদ প্রভৃতির সঙ্গে ঝগড়া করলেও তাঁদের ভাতে মারতে পারবে না—ঘর-ভাঙ্গানী হবে না।

২। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সহজে ভালবাসা হয়।

(৯) যৌবন-বিবাহের দোষ—

১। বড় মেয়ে ভিন্ন আচার-অভ্যাস-সম্পন্ন শ্বশুরবাড়ীর নূতন চাল-চলন শিখতে চায় না ও পারে না।

২। ফলে পারিবারিক সুখ-শান্তির ব্যাঘাত হয় ও একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গে।

৩। দেশবাসীর গড় আয়ু যখন ২৩, তখন পুরুষের ২৭-৩০, ও মেয়ের ১৭-২০ বয়সে বিবাহ হলে :—

(১) প্রজাবৃদ্ধি হবে না।

(২) পিতা বয়স্ক পুত্র কন্যা রেখে যেতে পারবেন না। বিধবা অপোগণ্ড শিশু সন্তান নিয়ে বিব্রত হবে।

(১০) বিবাহের প্রকৃত বয়স

১১।১২ বৎসর বয়সে যখন এদেশে নারীত্ব দেখা যায়, তখন তাই ঠিক বিবাহের বয়স।

(১১) স্ত্রী-শিক্ষা।

১। বর্ত্তমান স্কুল কলেজের শিক্ষা হিন্দু স্ত্রী শিক্ষার উপযোগী নয়।

২। গ্রাজুয়েট স্ত্রীলোক অত পরিশ্রমে যা শেখেন, তার অধিকাংশ জীবন-পথে চলার কোন কাজে লাগে না।

৩। শ্বশুর-ঘরই বালিকাদের প্রকৃত শিক্ষাস্থল হওয়া উচিত।

(১২) বিবাহে পাত্রপাত্রী নির্ব্বাচন-প্রণালী

স্বয়ং নির্ব্বাচনের দোষ—

১। আমাদের অসুন্দরের দেশে অধিকাংশ মেয়ের বর জুটবে না।

২। মেয়েদের বর শিকারের সময়ে সুন্দর যুবা পুরুষকে হাব ভাব কটাক্ষাদির দ্বারা বশ করার চেষ্টার অভ্যাস পর-জীবনেও রয়ে যায়।

৩। যুবক-যুবতীর ইন্দ্রিয়-বৃত্তি প্রবলা, ও কল্পনা তেজস্বিনী হওয়ায় তাঁরা রূপ-মোহ দ্বারাই নির্ব্বাচন করেন,—ধীর ভাবে সমস্ত গুণাগুণ পরীক্ষার ক্ষমতা থাকে না।

পৌষ ১৩৩০এর কাগজে অধ্যাপক শ্রীসত্যশরণ সিংহের প্রবন্ধের সার মর্ম্ম এই :—

(১) যৌবন বিবাহের দোষ ও বাল্যবিবাহের গুণ।

উপরে লেখা শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর মতের সার নং (৯) ১ ও ২ এবং (৮) ২ সংখ্যক যুক্তি স্বীকার করেন।

(২) যৌবন বিবাহের পক্ষে যুক্তি—

১। ১৬ বৎসরের মেয়ের বিবাহ হলে শীঘ্র জননী হওয়ার সম্ভাবনা। বিধবা হলেও তাঁর দায়িত্ব ও স্নেহের ধন বর্ত্তমান থাকে।

২। ভারতের প্রকৃত গৌরবের যুগে—অর্থাৎ বেদ, মহাকাব্য, ও দর্শন প্রণয়নের যুগে ও বৌদ্ধ যুগে—যৌবন-বিবাহ প্রচলিত ছিল।

৩। যৌবন বিবাহে প্রজাবৃদ্ধির বাধা হয় না (শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর মতের সার (৯) ৩ (১) ও (২) সংখ্যক যুক্তির উত্তর)। মেয়ের ১৮ বৎসরে বিবাহ দিলে, তিন বৎসর অন্তর একটি সন্তান জন্মালে, ৪৫ বৎসর পর্য্যন্ত (৪৫—১৮=২৭, ২৭÷৩=) ৯টি সন্তান হতে পারে।

(৩) বাল্য বিবাহের কুফল—

১। বাল্য-বিবাহের ফল অকাল-মৃত্যু—(অনুরূপা দেবীর মতের সার ( ) এর উত্তর)—

(ক) পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ বাল্যবিবাহের সন্তান হয়েও দীর্ঘায়ু হয়েছিলেন, অনেকে নয়।

(খ) অল্প বয়সে সন্তান প্রসবে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের মতে—

(১) অল্পজীবী ও অসুস্থ সন্তান জন্মে।

(২) মাতার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

লেখকের মতে—

(৩) প্রসূতির বিশেষ কষ্ট হয়, ও মৃত্যু সম্ভাবনা বেশী।

(গ) দরিদ্র দেশে বাল্য বিবাহের ফলে বহু সন্তান

লাভ হয়। সুতরাং ছেলেরা খারাপ খাওয়া, পরা ও বাড়ীর দোষে অল্পায়ু হয়।

২। পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ হলে লেখাপড়ার ব্যাঘাত হয়।

৩। ছাত্রাবস্থায় বাপ হয়ে পড়লে পড়া ছেড়ে যেমন তেমন চাকরী খুঁজতে ও নিতে হয়।

৪। বিবাহিতা বালিকার নারীত্ব শীঘ্র (অকালে) আসে।

৫। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের মতে নারীত্ব দেখা দিলেই সন্তান প্রসবের উপযুক্ততা জন্মে না।

৬। বালবিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

৭। অনেক বালবিধবা ভ্রষ্টা হয়।

(৪) মেয়েদের বিবাহের বয়স—

১৬ বছরের কমে নয়।

অগ্রহায়ণ ১৩৩০এর ভারতবর্ষে শ্রীপদ্মনাভ দেবশর্ম্মা এ বিষয়ে এইরূপ মত প্রকাশ করেছেন—

(১) বাল্যবিবাহের সমর্থক যুক্তি খণ্ডন।

১। মেয়ের ১১।১২ বৎসর বয়সে বিবাহ দিয়ে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত স্বামী সহবাস নিবারণ করা খুব শক্ত। দৃষ্টান্ত প্রভাত বাবুর "নিষিদ্ধ ফল" গল্প। (শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর মতের সার সংগ্রহের (৭) ও (১০) সংখ্যক যুক্তির উত্তর।)

২। পল্লীগ্রামনিবাসী শিক্ষিত পাত্রের সঙ্গে যুবতী ধনী-কন্যার বিবাহ হলে অসুবিধা বা অশান্তি হবে না; কারণ—

(ক) বধূ শীঘ্রই পল্লীগ্রাম ত্যাগ করে স্বামীর সঙ্গে তাঁর কর্ম্মস্থানে যায়।

(খ) পল্লীগ্রামে থাকা হলেও ধনীর কন্যা ও উপযুক্ত পুত্রের বধূর দোষ ত্রুটি গুরুজন সহজে ক্ষমা করেন। (শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর (৯) ১ ও ২ সংখ্যক যুক্তির উত্তর।)

(২) স্ত্রী শিক্ষার জায়গা

বাপের বাড়ীই মেয়েদের শিক্ষার ঠিক জায়গা, (শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর নং (১১) ৩এর উত্তর)

(৩) যৌবন বিবাহের দোষ খণ্ডন

বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সকল ঘরের আবহাওয়া প্রায় একই রকম। মেয়ের বাপ পাত্রের জাত কুল দেখবার সময়, তাদের বাড়ীর আচার ও অভ্যাস কি রকম সে খোঁজ নিয়ে কাজ করলে কোন গোল হয় না। (শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর (৯) ১ ও ২ এর উত্তর।)

(৪) যৌবন বিবাহ ও ইয়োরোপীয় সমাজ।

বিদেশী সমাজের বিশৃঙ্খলার কারণ যৌবন-বিবাহ ও স্ত্রী-স্বাধীনতা নয়,—সমাজ ও বিবাহের আদর্শ।

মাঘ ১৩৩০এর ভারতবর্ষে শ্রীমতী অনুরূপা দেবী তাঁর সমালোচকদের উত্তর দিতে গিয়ে তাঁর পূর্ব্বে লেখা কোন কোন কথা আবার বলেছেন। তাঁর লেখা নূতন কথা সংক্ষেপে এই—

(১) বাল্য বিবাহের দোষ খণ্ডন

অকাল-মৃত্যুর কারণ বাল্য-বিবাহ নয়; কারণ, বাল্য-বিবাহ হিন্দু সমাজে সুদূর অতীত কাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু অকাল মৃত্যু নূতন আমদানী। (সিংহ মহাশয়ের নং (৩) ১ (ক) ও (খ) এর উত্তর।)

(২) বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধ যুক্তি

বাল্য বিবাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুচিত, যেহেতু বাল্য-বিবাহের পর ব্রহ্মচর্য্য পালন অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসম্ভব। (পদ্মনাভ বাবুর নং (১) ১এর সমর্থন)

(৩) বাল্য বিবাহ ও যৌবন-বিবাহের সমন্বয়।

যিনি নিজের ছেলেকে ব্রহ্মচর্য্য পালনোপযোগী শিক্ষা দিতে সমর্থ, ও যাঁর পুত্রবধূকে মনের মত গড়বার সাধ ও সামর্থ্য আছে, তিনি ১২ বছরের মেয়ে আনবেন; যাঁরা ঐ পরিশ্রমে কাতর, তাঁরা বড় মেয়ে আনবেন।

(৪) স্বয়ং নির্ব্বাচনের দোষ

বড় মেয়ের সহজে কোন পুরুষকে নিজের যোগ্য বর বলে মনে ধরে না, সুতরাং বিবাহে বিলম্ব হয়, এমন কি বিবাহ হয় না।

(৫) অবরোধ প্রথা, নারীর স্বাতন্ত্র্য ও পুরুষের সহিত সর্ব্বত্র সমান অধিকার

প্রথমটির পক্ষপাতিনী নন, কিন্তু শেষের দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু মনে করেন ও তাদের পক্ষপাতিনী নন।

মাঘ ১৩৩০এর ভারতবর্ষে শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন যে, তিনি অধিকাংশ বিষয়েই শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর সঙ্গে একমত। তিনি শাস্ত্র উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন

যে, অকাল-মৃত্যুর কারণ বাল্য-বিবাহ নয়, পরন্তু বেদাদি শাস্ত্রের অনধ্যয়ন, সদাচারের বর্জ্জন, অলসতা, ও দূষিত আহার্য্য গ্রহণ।

ফাল্গুন ১৩৩০ এর ভারতবর্ষে পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত সত্যশরণ সিংহ মহাশয়ের প্রবন্ধের উত্তরে নিম্নলিখিত মত যুক্তি দেখিয়েছেন—

(১) বাল্য বিবাহের গুণ—

বালক বালিকা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে স্বভাব জন্য ভালবাসা স্বাভাবিক ভাবে গড়ে ওঠে, সেটা দৃঢ়মূল ও সুখের হয়।

(২) বাল্য-বিবাহের দোষ খণ্ডন—

১—সেকালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত প্রভৃতি অধিকাংশই বাল্য-বিবাহ করতেন; কিন্তু অনেকেই দীর্ঘজীবী হতেন। (সিংহ মহাশয়ের (৩) ১ (ক) ও খ ১) এর উত্তর।)

২—কাশীধামে অনেক বৃদ্ধা আছেন, যাঁরা অল্প বয়সে বিধবা করেছেন, কিন্তু এখনও বেশ পরিশ্রম করেন। (সিংহ মহাশয়ের (৩) ১ (খ) (২) এর উত্তর।)

৩ (ক)—পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পড়ে শুধু বালবিধবা নয় যুবতী-বিধবাও ভ্রষ্টা হয়। (খ) স্ত্রীলোকের কাম পুরুষের চেয়ে অনেক কম। যে বাল-বিধবার ইন্দ্রিয়-সুখের আস্বাদ লাভ হয় নি, তার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালন, উপযুক্ত শিক্ষা পেলে, খুব সহজ। (সিংহ মহাশয়ের (৩ ৭ এর উত্তর।)

৪—এ কথা ঠিক যে দরিদ্র দেশে প্রজা বৃদ্ধি হওয়া অধিক কষ্টের ও অবনতির কারণ। এই জন্যই ঋষিরা বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। (সিংহ মহাশয়ের (৩) ১ (গ) এর উত্তর।)

৫—অপর প্রদেশের মত বঙ্গদেশে দ্বিরাগমন প্রথার প্রচলন করলে বাল্যবিবাহের ফলে অকাল-নারীত্ব ও অকাল-মাতৃত্ব নিবারণ হয়। (সিংহ মহাশয়ের (৩) ১ (খ) (১) (২) ও (৩), (৩) ১ গ), (৩) ৪ ও ৫ সংখ্যক যুক্তির উত্তর।)

৬—পাঠ্যাবস্থায় বিবাহে পড়ার ব্যাঘাত হয় বলে বিবাহ স্থগিত রাখা যায় না; কারণ—

পড়া শেষ হতে অনেক দিন লাগে—এম-এর পর ডাক্তারি, এঞ্জিনিয়ারী, পি-আর-এস, রিসার্চ্চ প্রভৃতি

আছে; কিন্তু অবিবাহিত অব
প্রলোভনপূর্ণ স্থানে থাকায় চরিত্র
(সিংহ মহাশয়ের (৩) ২ এর উত্তর

৭—মনুসংহিতা ও মহাভারত
আজ্ঞা দিয়েছেন। রাম ও সীতা
(সিংহ মহাশয়ের (২) ২ এর উত্তর

(৩) যৌবন বিবাহ

১—যৌবন-বিবাহ প্রবর্ত্তন কর
প্রচলন অবশ্যম্ভাবী। মনুর মতে
কুচরিত্র হয়।

২—একজনকে রূপ গুণ যে
করলে, পরে তার চেয়ে বেশী র
দেখলে, তাকেই ভালবাসবে ও পে

৩—যৌবন-বিবাহ কামজ,—
স্বার্থপরতা বাড়ায়।

বৈশাখ ১৩৩১ এর ভারতবর্ষে
মহাশয় এই বিষয়ে দ্বিতীয় বার
কোন কোন যুক্তির উত্তর নিম্ন
চেষ্টা করেছেন—

(১) যৌবন-বিবাহের

১—গান্ধর্ব্ব বিবাহের সন্তান
দৃষ্টান্ত—কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির। (প
এর উত্তর।)

২—যৌবনে গান্ধর্ব্ব বিবাহকারি
হয় না। দৃষ্টান্ত—দময়ন্তী, সাবি
প্রভৃতি। (পণ্ডিত মহাশয়ের (৩) ২

(২) বাল্য-বিবাহের ও

বাল্য বিবাহে সর্ব্বদা স্বামী-স্ত্রীর
জন্মে না; তার প্রমাণ, বাল্য-বিবাহ
দলে কুস্থানে গমন, ও বালিকা
ঘরের বাহির হওয়া, ও আত্মহত
মহাশয়ের (১) ১ এর উত্তর।)

(৩) বাল্য বিবাহের

অল্প বয়সে সন্তানের পিতা হ
চিন্তায় বিব্রত হয়ে সমস্ত উচ্চ আ
জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চ্চা, শিল্প-বাণিজ্যের

প্রভৃতি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। আর মেয়েরা হেসে খেলে বেড়াবার ও বিদ্যা, জ্ঞান ও শক্তি অর্জ্জনের বয়সে নিরক্ষরা, কুসংস্কারাচ্ছন্না, দুর্ব্বলা বধূরূপে স্বামীর গলগ্রহ হয়।

পাঠকদের পূর্ব্ব আলোচনাকারীদের যুক্তিগুলি মনে করিয়ে দেবার জন্য, আর নিজে তাদের উপর মন্তব্য প্রকাশ, ও নূতন যুক্তি দেবার সুবিধার জন্য, এই সার সংকলন করে দিলাম।

লেখকগণ যে ক্রমে লিখে গেছেন, ঠিক সেই ক্রমে, তাঁদের প্যারার পর প্যারার সার মর্ম্ম না লিখে, তাঁরা আগে যুক্তির একটা খসড়া করে নিয়ে পরে তাদের ক্রম ঠিক করে নিয়ে লিখলে, সম্ভবতঃ যে ক্রমে যুক্তি সাজাতেন, সেই ক্রমে আমি লিখতে চেষ্টা করেছি। কোথাও কোথাও তাঁদের ভাবকে স্পষ্টতর করে সংক্ষেপে লিখতে হয়েছে। আমার কাজ ভাল হয়েছে কি না, তার বিচার পাঠকদের ও মাননীয় লেখকদের উপর। যদি লেখকদের মত যথাযথ প্রকাশে আমার ভুল-চুক, ছাড়-বাদ হয়ে থাকে, তাঁরা অনুগ্রহ করে মার্জ্জনা করবেন ও দেখিয়ে দেবেন। লেখক-সাধারণের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন এই যে, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম বাবুর মত, যদি তাঁরা গুরু বিষয়ে লিখিত চিন্তা ও যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধের শেষে নিজেদের যুক্তি ও তথ্যের সার সংকলন করে দেন, তবে যে শুধু আমাদের (পাঠকদের) তাঁদের কথা বুঝবার ও মনে রাখবার সুবিধা হয় তা নয়, তাঁরা নিজেই নিজের প্রবন্ধের দোষ-ত্রুটি ও যথার্থ মূল্য বুঝতে পারবেন। অপরের প্রবন্ধের উত্তর দেবার পূর্ব্বে তার সার সংকলন করে, পরে নিজের উত্তরে তার প্রত্যেক যুক্তির উপর নিজের মন্তব্য ও উত্তরের সংক্ষিপ্ত নোট আগে লিখে নিয়ে, তার ক্রম সাজিয়ে নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে বসলে খুব ভাল হয়।

এইবার পূর্ব্ব-আলোচনাকারীদের যুক্তিগুলির সম্বন্ধ নির্ণয় করে, তাঁদের সমালোচনা ও তর্কের বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমার মতামত লিখছি।

আলোচ্য প্রবন্ধগুলির শিরোনাম থেকে বোঝা যায় যে, প্রধান আলোচ্য বিষয়—আমাদের দেশে অকাল-মৃত্যুর কারণ বাল্য-বিবাহ কি না। কিন্তু শ্রীমতী অনুরূপা দেবী আনুষঙ্গিক ভাবে বাল্য-বিবাহ ভাল কি যৌবন বিবাহ ভাল, স্ত্রী-শিক্ষার প্রকৃত স্থান শ্বশুর বাড়ী কি বাপের বাড়ী, পাত্র-পাত্রী-নির্ব্বাচন নিজে করা ভাল, কি গুরুজনদের হাতে থাকা ভাল, প্রভৃতি অপরাপর নিকট ও দূর সম্পর্কিত বিষয়সমূহের অবতারণা করায়, আলোচনা অন্যান্য পথে চলে গিয়েছে। যখন ঐ সব বিষয়ের উত্তর প্রত্যুত্তর হয়ে গিয়েছে, তখন আমাকেও বাধ্য হয়ে ঐ সব বিষয়েও সংক্ষেপে তাঁদের যুক্তির মূল্য নির্দ্ধারণ ও নিজের মতামত প্রকাশ করতে হবে।

১—বাল্য বিবাহ অকাল-মৃত্যুর কারণ কি না?

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী ও পণ্ডিত মহাশয়ের উত্তর—"না"।

তাঁদের যুক্তি এই যে, সেকালে (অর্থাৎ বহুপূর্ব্ব কালে হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন থেকে গত ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) প্রায় সকলেই বাল্যবিবাহ করতেন, কিন্তু অনেকেই দীর্ঘায়ু হতেন। তেমন অনেক দেখা লোকের কথা মনে আছে। (দেবীর) প্রথম বারের যুক্তির (আমার কৃত) সংক্ষিপ্ত সারের নং (১), দ্বিতীয় বারেরও নং (১), ও পণ্ডিত মহাশয়ের নং (২) ১৩২ দেখুন।)

আমার উত্তর—(১) সেকালের লোকের জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা হাতে না পেলে, এখনকার চেয়ে তাঁদের মৃত্যুর হার কম ছিল, অথবা তাঁরা এখনকার লোকের চেয়ে দীর্ঘায়ু ছিলেন, এ কথা জোর করে বলা চলে না। গুটিকতক নিজের মতের পোষক দৃষ্টান্ত দিলে, অথবা আন্দাজী কথা বললে, কিছুই প্রমাণ হয় না।

(২) শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর প্রথম বারের (২) সংখ্যক যুক্তিতে আধুনিক কালে অকাল-মৃত্যুর যে কারণগুলি দেখান হয়েছে, সেগুলি সবই ঠিক। শুধু ম্যালেরিয়া বাদ পড়েছে। কিন্তু তা থেকে প্রমাণ হয় না যে, বাল্য-বিবাহ অকাল-মৃত্যুর কারণ নয়। সেকালে এখনকার চেয়ে অকাল-মৃত্যু কম হ'ত ধরে নিয়েও বলা যেতে পারে যে, বর্ত্তমান কালে অকাল-মৃত্যুর নানাবিধ কারণের মধ্যে সেকালে অনেকগুলি ছিল না,—কতকগুলি ছিল, তাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ একটি। যদি সেকালে বাল্য-বিবাহ না থাকত,—স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে বর্ত্তমান

ইয়োরোপীয়দের মত জ্ঞান থাকত, তাহলে অকালমৃত্যু আরও কম, ও দীর্ঘ-জীবন আরও বেশী হত।

উপরের (১) ও (২) থেকে দেখা গেল যে, বাল্য-বিবাহ যে অকাল-মৃত্যুর কারণ নয়, এ কথা বলা চলে না। এবার দেখাব যে ওটা তার কারণ সমূহের মধ্যে একটি।

(১) যাবতীয় জীব ও উদ্ভিদ রাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, প্রথম যৌবন সঞ্চারে যে স্ত্রী-পুরুষের মিলন হয়, তাতে আদৌ ফল হয় না। আর যদি বা হয়, জন্মাবামাত্র মরে যায়, নচেৎ বেঁচে থাকলে দুর্ব্বল রুগ্ন ও অল্পায়ু হয়। দৃষ্টান্ত—কাঁচা বেগুনের বীজ পুতলে, গাছ বড় হলে ফুল ধরে যায়, তাতে ফল ধরে না। নারকোল, তাল, খেজুর প্রভৃতি গাছের প্রথম বছরের ফুলে ফল ধরে না। গরু, ঘোড়া, কুকুর প্রভৃতির প্রথম বিয়ানের ছানাগুলি হয় মরে যায়, নতুবা চিররুগ্ন অবস্থায় বেঁচে থাকে। সিংহ মহাশয়ের (৩) খ (১) (২) ও (৩) সংখ্যক যুক্তি ঠিক বলে মনে হয়। সুতরাং মনে হয় যে, বাল্য-বিবাহ অকাল-মৃত্যুর সনাতন কারণ। সেকালেও এই কারণে অকাল-মৃত্যু হত, কিন্তু তখন একালের মত অকাল-মৃত্যুর আরও অনেকগুলি কারণ বর্ত্তমান না থাকায়, খুব সম্ভব এখনকার চেয়ে অকাল-মৃত্যু কম হত।

২ বাল্য-বিবাহের দোষ

সিংহ মহাশয় ও দেবশর্ম্মা মহাশয় বাল্য-বিবাহের যে দোষগুলি দেখিয়েছেন, আমি সেগুলি স্বীকার করি। সেগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি দোষ দেখাচ্ছি।

(১) বালিকা বধূ লেখাপড়া, বুদ্ধির মার্জ্জন, গৃহকর্ম্ম, সংসার পরিচালন, নিজের স্বাস্থ্যরক্ষা, সন্তানপালন প্রভৃতিতে কাঁচা ও অনভিজ্ঞ থেকে যাওয়ার জন্য সুগৃহিণী ও সুমাতা হতে পারে না, এ কারণেও শিশু মৃত্যুর আধিক্য হয়। একান্নবর্ত্তী পরিবারে অপর প্রাচীনা আত্মীয়াদের সঙ্গে থাকা হলে, এই দোষ কতকাংশে দূর হয়; কিন্তু আজকাল অনেক বধূকেই বিবাহের অল্পকাল পরেই স্বামীর সঙ্গে তাঁর কর্ম্মস্থানে গিয়ে স্বাধীনা গৃহিণী হতে হয়।

(২) অল্প বয়সে শ্বশুরবাড়ীতে বাপের বাড়ীর মত খেলা ধূলো, হাসি গল্প, লেখাপড়া করতে না পাওয়ায় ক্রমাগত নিষেধ, সমালোচনা, নিন্দা, বিদ্রূপ, ও ভয়ের মধ্যে, চাপের মধ্যে অল্প আলো ও বাতাসওয়ালা ঘরে, অবরোধের ভেতর, ঘোমটার ভেতর, থাকার জন্য, বালিকা বধূর শরীর ও মনের যথাযথ বিকাশ, উন্নতি ও স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত হয়

(৩) অবিবেচক অসংযমী লোকেরা, (যাঁদের সংখ্যা পৃথিবীতে শতকরা ৯৯) নাবালক বিকাশের পূর্ব্বেই স্বামীর সঙ্গে বালিকা বধূর এক শয্যায় শয়নের ব্যবস্থা করেন। অথবা বাড়ীর অপরে ব্যবস্থা করেছে দেখেও আপত্তি ও প্রতীকার করেন না। আর স্বামীরাও তাকে পশুবৃত্তি চরিতার্থ করবার যন্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করে অসহ্য যন্ত্রণা দেয়।

দৃষ্টান্ত—লায়ন ও ওয়াডেল সাহেব প্রণীত Medical Jurisprudence ৪র্থ সংস্করণ ২২৫ পৃষ্ঠায় আছে যে, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে হরিমোহন মাইতি নামে একজন ৩৫ বৎসর বয়সের বাঙ্গালী কুলাঙ্গার তার ১১ বছর ৩৷৷০ মাস বয়সের স্ত্রীর প্রতি ঐ রকম করাতে, অতিরিক্ত রক্তস্রাবে ১৩৷৷০ ঘণ্টা পরে বেচারীর মৃত্যু ঘটে। সরকার ফরিয়াদী হয়ে হরিমোহনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালান। ডাক্তারী পরীক্ষায় সাব্যস্ত হয় যে, সেবারের আগেও কয়েকবার সহবাস হয়েছিল *

সম্ভবতঃ, এই ঘটনার পর, এই অধঃপতিত দেশে ধর্ম্মের নামে এরূপ বীভৎস ভাবে বালিকা-হত্যা হয়ে থাকে জানতে পেরে, দয়ালু ন্যায়বান সরকার সহবাস সম্মতির বয়স ১০ থেকে ১২ করেন। কিন্তু আজ অবধি এই আইন অনুসারে একটিও মোকদ্দমা হয় নি, কোন অপরাধীর শাস্তি হয় নি। কারণ অত্যাচারিতা বালিকারা মুখ বুজে সব সহ্য করে, সুতরাং ফরিয়াদি কে হবে, আর পুলিশই বা কি করে টের পাবে। বাংলা দেশে দ্বিরাগমন প্রথা প্রায় নেই, আর প্রবর্ত্তন করাও অসম্ভব। কারণ একবার বিয়ে দিলে বাপের বাড়ী মেয়েকে পাঠান না পাঠান সম্বন্ধে মেয়ের বাপের আর কোন জোর থাকে না। বিবাহের পূর্ব্বে এত বছরে পড়ার আগে মেয়েকে শ্বশুর ঘর করতে পাঠান হবে না, এরূপ মৌখিক চুক্তিতে ছেলের বাপ রাজি হলেও, "ধূলো পায়ে দিন" না করলেও

* Calcutta High Court, Queen Enepress versus Harry Mohan Mythee, I, L. R. 18 Cal 49, J. Wilson, July 1890.

বিবাহের পর পণের টাকা, গহনা, দান-সামগ্রী প্রভৃতি মনের মত না হলেই ছেলের বাপ বৈবাহিকের উপর প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেন, অর্থাৎ বৌ নিয়ে গিয়ে আর পাঠান না যতক্ষণ না তিনি আদেশ মত জরিমানা দিয়ে তাঁর তুষ্টিসাধন করেন। চোখের উপর এ সমস্ত দেখে শুনেও কি করে মা বাপ কচি বয়সে, অর্থাৎ জাতির অধঃপতনের যুগে প্রণীত শাস্ত্রানুসারে, নারীত্ব বিকাশের পূর্ব্বে, মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন? থাকুক না কেন বাল্য বিবাহের দুই একটি গুণ। সব দিক বিচার করে দেখলে ১৬ বছরের আগে মেয়ের বিয়ে না দেওয়াই ভাল।

(৪) শ্বাশুড়ী ননদ প্রভৃতির দ্বারা বালিকা বধূর প্রতি যে সব অমানুষিক অত্যাচারের (প্রহার, লোহা পুড়িয়ে গায়ে ছেঁকা দেওয়া, অনাহারে ছোট অন্ধকার ঘরে বন্দী করে রাখা, প্রভৃতি) কথা মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখা যায়; (কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত আহিরীটোলার আনন্দময়ীর ও তার কিছুদিন পরের আরও কয়েকটি ঘটনার কথা মনে করুন) আর ঐ রকম বা ওর চেয়ে কিছু কম মাত্রার, অত্যাচার, উৎপীড়ন, যা অনেক বাড়ীতেই হয়, কিন্তু খবরের কাগজে বেরোয় না, এমন কি অনেক সময় পাড়ার লোকেও জান্‌তে পারে না, সে সব, বধূ বালিকা ও অশিক্ষিতা হলে যতটা সম্ভব, যুবতী ও শিক্ষিতা হলে ততটা নয়। সেইজন্য মেয়েদের বাপেদের উচিত যে, মেয়েদের মুখ চেয়ে, তাদের ছোট বয়সে, অশিক্ষিতা, অসহায়া, ভীতা, নিরুপায়া অবস্থায় বিবাহ না দিয়ে, যেন বড় করে, ছেলেদের মত যত্ন করে, বাড়ীতে ও স্কুলে, বাংলা, সংস্কৃত, ও ইংরাজি ভাষা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, অপঘাতের আশু প্রতিকার, রোগীর শুশ্রূষা, শিশুর শরীর পালন ও চরিত্র গঠন, ধাত্রীবিদ্যা, স্ত্রীরোগ, পাটিগণিত, ভূগোল, ইতিহাস, সংসারের হিসাব রাখা, রান্না, আচার, চাটনি, মোরব্বা, জ্যাম প্রভৃতি তৈরী, হাতের ও কলের সেলাই, পোষাকের কাট ছাঁট, ধর্ম্মনীতি, গান বাজনা ও অপর সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান যতদূর সম্ভব যথাসাধ্য শিক্ষা দিয়ে বিয়ে দেন। এরূপ বয়স্থা, (১৬।১৭।১৮ বৎসরের) শিক্ষিতা ও কর্ম্ম নিপুণা বধূর উপর অত্যাচার উৎপীড়নের সম্ভাবনা তুলনায় অনেক কম।

(৫) ১১।১২ বছরের মেয়েকে দেখে সে বড় হলে তার শরীরের গড়ন কেমন হবে তা কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু ১৬।১৭ বছরের বড় মেয়েকে দেখে সেটা অনেকটা আন্দাজ করা যায়। সুতরাং যাঁরা চান যে তাঁদের বংশধরেরা হৃষ্ট-পুষ্ট, বলবান, ও লম্বা চৌড়া গড়নের হোক, রোগা ও বেঁটে না হোক, ছোট মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়ে অনিশ্চিতের ঝুঁকি তাঁদের নেওয়া উচিত নয়।

(৬) ছেলের বাপেরা প্রায়ই নানা কারণে মেয়েকে বাপের বাড়ী পাঠান না। ছোট মেয়েকে না পাঠালে তার ও তার মা বাপের যত কষ্ট হয়, বড় মেয়ে হলে তত হয় না।

(৭) ছোট মেয়েকে বৌ করে ঘরে আনলে, সে বড় ও মোটা হলে, তার অনেক গহনা ভাঙ্গিয়ে আবার গড়াতে হয়। মধ্যবিত্ত ও গরীব গৃহস্থের পক্ষে সেটা অনেক লোকসান।

(৮) সমাজের অধিকাংশ মেয়েকে বড় শিক্ষিতা ও কর্ম্মদক্ষ (৪) সংখ্যক দোষের শেষ ভাগে উল্লিখিত মত) করে বিয়ে দিলে বরপণের কামড় অনেক কমে যাবে।

আজকাল বরপণের প্রকোপ এই জন্য বেশী যে—

(ক) মেয়েদের কোন বিশেষ গুণ বা দাম নেই,

(খ) মেয়েদের বিয়ে দিতেই হবে, এবং

(গ) নারীত্ব বিকাশের আগেই বিয়ে দিতে হবে, এই রকম সামাজিক বাধ্যবাধকতা থাকা।

সুতরাং বরপণ প্রথার চোট কমাতে হলে—

(ক) (৪) সংখ্যক দোষের শেষে উল্লিখিত মত মেয়েদের সুশিক্ষা দিয়ে তাদের দাম বাড়াতে হবে, ফলে যে সব শিক্ষিত ছেলেরা শিক্ষিতা স্ত্রী চান, তাঁদের সংখ্যা দিন দিনই বাড়তে থাকবে। তাঁরা এই রকম সুশিক্ষিতা মেয়ের খোঁজ পেলে, মেয়ের বাপের সাধ্য ও ইচ্ছামত দেওয়া গহনা, ও দানসামগ্রী মাত্র নিয়ে, কোন দাবী দাওয়া খাঁই না করে, বিয়ে করতে রাজি হবেন, ও তাঁদের বাপেদের মধ্যে যাঁরা লোভী, তাঁরাও ছেলের আগ্রহ ও ইচ্ছার কথা জেনে ক্রমশঃ লোভ ছাড়তে বাধ্য হবেন। যাঁদের পয়সা কম অথচ মেয়ে কালো বা সংখ্যায় বেশী, অথবা দুইই—তাঁদের তো এ ছাড়া অন্য পথ নেই, আর পথ আছে গলায় দড়ি।

(খ) মেয়েকে সুশিক্ষিতা করার পর সুপাত্র পেলে

তবেই বিবাহ দেব, এই প্রতিজ্ঞা করা। ফলে নারীত্ব বিকাশের আগে বিয়ে দেওয়া তো হবেই না, কোন কোন মেয়ের হয়ত যোগ্য সুপাত্র সময়ে না পাওয়ার জন্য বিয়ে হবেই না। না হয় নাই বা হল। তাঁরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে শিক্ষয়িত্রী, ডাক্তার, ধাত্রী, শুশ্রূষাকারিণী, দরজি প্রভৃতির কাজ করে নিজের ও ছোট ভাই বোন বা বুড় মা বাপের খরচ চালাতে পারবেন। সেটা তাঁদের নিজের, পরিবারের ও সমাজের পক্ষে বিধবা হয়ে দেওর ভাই প্রভৃতির গলগ্রহ হয়ে থাকার চেয়ে অথবা চরিত্রহীন, মাতাল, মূর্খ, বৃদ্ধ বা দরিদ্র স্বামীর হাতে পড়ার চেয়ে, ঢের কম অকল্যাণকর হবে।

৩—বাল্যবিবাহ ও বাল-বিধবা

সিংহ মহাশয় বলেছেন যে, বাল্যবিবাহের ফলে বাল-বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি হয় (যুক্তি নং (৩) ৬)। পণ্ডিত মহাশয় যদিও এঁর সমস্ত যুক্তির উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এই যুক্তি সম্বন্ধে নীরব। সুতরাং ধরে নিতে পারি যে, এটা তিনি মেনে নিয়েছেন। বাস্তবিক না মেনে উপায় কি?

৪—অল্প বয়সে সন্তান প্রসবের ফলে মেয়েদের স্বাস্থ্য নষ্ট ও অকাল মৃত্যু হয় কি না।

সিংহ মহাশয় বলেন হয়। (যুক্তি নং (৩) ১ (খ))। পণ্ডিত মহাশয় কাশীর গঙ্গাস্নানকারিণী বৃদ্ধাদের দেখিয়ে এ কথা অস্বীকার করেন। (যুক্তি নং (২) ২)

(ক) গুটিকতক সেকালের দীর্ঘজীবী লোকের উল্লেখ করা সম্বন্ধে আমার ১ (১) এ যা বলেছি, এখানেও সেই কথা খাটে, অর্থাৎ মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখে একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত করা উচিত নয়। সেই সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম স্থলগুলি সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান ও সংখ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা না করা, অথবা নিজের সুবিধামত চোখ বুজে থাকা, সুবুদ্ধি, সত্য জানার ইচ্ছা, বা ন্যায়বিচারের পরিচয় নয়।

যে বৃদ্ধাগুলি বেঁচে আছেন পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাদেরই দেখেছেন, কিন্তু তাঁদের কত গুণ বার্দ্ধক্যের আগেই স্বর্গে গিয়েছেন, তার হিসাব কে দেবে?

(খ) তা ছাড়া, কাশীর পথে ঘাটে যাঁদের তিনি দেখেছেন তাঁদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন বিধবা। তাঁদের মধ্যে অনেকে হয়ত মা হবার আগেই বিধবা হয়েছেন, অনেকে মাত্র ২।১টি ছেলের মা হয়ে বিধবা হয়েছেন। অনেকে হয়ত আদৌ বালিকা বয়সে সন্তান প্রসব করেন নি। সুতরাং মোটে সন্তান প্রসব না করায়, বা বালিকা বয়সে সন্তান প্রসব না করায় বা অল্প সন্তান প্রসব করায়, ও তার উপর মিতাচারে থাকা ও গঙ্গাস্নানের জন্য তাঁদের শরীর তো ভাল থাকবারই কথা।

(গ) বাল্য-বিবাহের ফলে নারীত্ব-বিকাশের পূর্ব্বেই স্বামী-সঙ্গ হয়; ফলে অকালে নারীত্ব বিকাশ—আদ্য ঋতু—যৌবনোদ্গম ও বাল-মাতৃত্ব হয়। যার যৌবন শীঘ্র বা অকালে আসে, তার যৌবন শীঘ্র বা অকালে যায়। সুতরাং বাল্য-বিবাহ ও বাল-মাতৃত্বের ফলে আমাদের মেয়েদের যৌবন, স্বাস্থ্য, ও রূপলাবণ্য, যৌবন-বিবাহকারীদের তুলনায়, শীঘ্রই যায়। তারা ঠিক "কুড়ীতে বুড়ী" না হোক, তিরিশ চল্লিশে তো হয়ই। মৃত্যুও তাদের তুলনায় অকালে হয়।

(ঘ) বহু পুরুষ ধরে যৌবনের পূর্ব্বেই বাধ্য হয়ে স্বামী সহবাস ও সন্তান প্রসব করার ফলে, আমাদের মেয়েদের শরীরের দৈর্ঘ্য পুরুষের চেয়ে অনেক কম দাঁড়িয়েছে। গোদের উপর বিষফোড়ার মত, অবরোধ প্রথা এই অবস্থার সহকারী কারণ। মরাঠি ও গুজরাটিদের মধ্যে প্রথম প্রধান কারণটী বাঙ্গালীদের মতই বর্ত্তমান, দ্বিতীয় সহকারী কারণটি নেই, তাই তাদের মেয়েরাও পুরুষের চেয়ে বেঁটে, তবে হয়ত বাঙ্গালীর চেয়ে তাদের গড় তফাত কম। কিন্তু যাদের ভিতর এই দুইটির মধ্যে কোন কারণই বর্ত্তমান নেই, তাদের স্ত্রী পুরুষের দৈর্ঘ্য প্রায় সমান। ইয়োরোপীয়দের মধ্যে আপনারা এটা লক্ষ্য করে থাকবেন, আর পূর্ব্ব আফ্রিকার কাফ্রিদের মধ্যেও, সে দেশে তিন বৎসর বাস করার সময়, আমি লক্ষ্য করেছি।

সারমর্ম্ম

(১) বাল্য বিবাহ যে অকাল-মৃত্যুর কারণ নয়, এমন বলা যেতে পারে না।

(২) গুটি কতক দৃষ্টান্ত দেখে কোন মত খাড়া করা চলে না।

(৩) বাল্য-বিবাহ অকাল-মৃত্যুর অন্যতম কারণ।

(৪) অকাল-মৃত্যুর একটি কারণ বাল্য-বিবাহ সেকালেও ছিল, একালেও আছে। কিন্তু একালে অকাল-

মৃত্যুর অনেকগুলি নূতন জবর কারণ জোটাতে সেকালের চেয়ে একালে লোকে অল্পায়ু হয়।

(৫) সে কালে বাল্য বিবাহ না থাকলে, ও আধুনিক ইয়োরামেরিকার মত ধাত্রীবিদ্যা, শিশুপালন, ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাদির জ্ঞানের সমাজে প্রসার থাকলে, লোকে আজও দীর্ঘায়ু হত।

(৬) বাল্য-বিবাহের দোষ—

১—অকাল-মৃত্যু। এর মুখ্য কারণ ঃ—

(ক) অপূর্ণ-শরীর সম্পন্ন অপ্রাপ্ত-যৌবন পিতা মাতার সন্তান স্বভাবতই রুগ্ন, দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হয়। (শিশুর অকাল মৃত্যু।)

(খ) বালিকা মার সন্তান প্রসবে কষ্ট, স্বাস্থ্যভঙ্গ ও মৃত্যু পর্য্যন্ত হয়। (স্ত্রীর অকাল মৃত্যু)।

(গ) বালিকা স্ত্রীর নারীত্ব অকালে আসে; সুতরাং যৌবন অকালে যায়, আয়ুও অকালে শেষ হয়। (স্ত্রীর অকাল-মৃত্যু।)

(ঘ) বালক স্বামীর অকালে ইন্দ্রিয় পরিচালন বশতঃ আয়ুনাশ হয়। (স্বামীর অকাল-মৃত্যু)।

গৌণ কারণ—

(ক) বালিকা মা শিশুপালনে অজ্ঞ ও অক্ষম হওয়ায় শিশুর রোগ ও মৃত্যু বেশী হয়। (শিশুর অকাল মৃত্যু)।

(খ) বালক পিতা যথেষ্ট রোজগার করতে পারার আগেই অনেকগুলি সন্তান নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ে, ফলে দারিদ্র্য; ফলে শিশুর উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাস, চিকিৎসা ও পথ্যের অভাব; ফলে অধিক শিশু-মৃত্যু। (শিশুর অকাল-মৃত্যু)।

২—বালক স্বামীর লেখাপড়ায় ব্যাঘাত হয়।

৩—বালক স্বামীর নিজের ও দেশের উন্নতির সম্বন্ধে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সাহস ও ত্যাগের কাজের উৎসাহ খর্ব্ব হয়।

৪—বাল-বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

৫—সুতরাং সমাজে পতিতা নারীর ও স্ত্রী কয়েদীর সংখ্যা বাড়ে।

৬—শ্বশুর বাড়ীর চাপ ও ভয়ের ভিতর বালিকা বধূর শরীর ও মনের বাড় ভাল হয় না।

৭—তার ফলে তার সন্তানদের শারীরিক ও মানসিক সম্যক উন্নতি হয় না।

৮—নারীত্ব বিকাশের পূর্ব্বে স্বামীর সঙ্গে রাত্রিযাপন করতে বাধ্য হওয়ায়, তার অত্যাচারে বিশেষ কষ্টভোগ করে, মৃত্যু পর্য্যন্ত হয়।

৯—বালিকা (সুতরাং অশিক্ষিতা অথবা সামান্য শিক্ষিতা) বধূর উপর শ্বাশুড়ী, ননদ, স্বামীর অত্যাচার, উৎপীড়ন, মার, ধোর যত বেশী মাত্রায় হতে পারে, প্রাপ্তী ও শিক্ষিতার উপর ততটা সম্ভব নয়।

১০—ছোট মেয়েকে তার শ্বশুরেরা বাপের বাড়ী না পাঠালে তার ও তার মা বাপ প্রভৃতির যত কষ্ট হবে, বড় মেয়ের বেলায় ততটা নয়।

১১—ছোট পাত্রী বড় হলে, রোগা ও বেঁটে (সুতরাং অবাঞ্ছনীয়) হবে কি না, পাত্র পক্ষ আন্দাজ করতে পারেন না।

১২—ছোট বৌএর গহনা, সে বড় ও মোটা হলে, আবার ভাঙ্গিয়ে গড়াতে হয়।

১৩—বালিকার বিবাহের বয়সের সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকাতে, ও পাত্রী অশিক্ষিতা (সুতরাং শিক্ষিত পাত্রের কাছে সঙ্গীরূপে মূল্যহীন) হওয়াতে বরপণের প্রকোপ কমছে না।

১৪—মেয়েদের দৈর্ঘ্য পুরুষের চেয়ে কমে গেছে।

সমাপ্তি

পূর্ব্ব পূর্ব্ব আলোচনাকারিগণ বর্ত্তমান বিষয় প্রসঙ্গে যে সমস্ত সমস্যার অবতারণা করেছেন, তার মধ্যে এই প্রধান চারটি বিষয় সম্বন্ধে এবার আলোচনা করলাম ঃ—

(১) বাল্য বিবাহ অকাল-মৃত্যুর কারণ কি না।

(২) বাল্য-বিবাহের দোষ।

(৩) বাল্য-বিবাহ ও বাল বিধবা।

(৪) অল্প বয়সে সন্তান প্রসবের ফলে মেয়েদের স্বাস্থ্যনষ্ট ও অকাল-মৃত্যু হয় কি না।

আগামী বারে তাঁদের আলোচিত নিম্নলিখিত অপ্রধান অপর ১৬টি সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করব—

১. বাল্য-বিবাহ, বালবিধবা ও সামাজিক দুর্নীতি। (১ক) স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কার ইন্দ্রিয়-লালসা বেশী। (২) বাল্য-বিবাহের কথিত গুণ বিচার। (ক) স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা সহজে ও দৃঢ় হয়। (খ) বালিকা বধূ ঘর-ভাঙ্গানী হয় না। (গ) সে শ্বশুরবাড়ীর নূতন চাল ও প্রথা সহজে গ্রহণ করতে পারে। (৩) যৌবন-বিবাহের কথিত দোষ বিচার। (ক) বড় মেয়ে সহজে নিজেকে শ্বশুর বাড়ীর নূতন আচারের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। (খ) যৌবন বিবাহ প্রচলিত হলেই গান্ধর্ব্ব বিবাহ চলিত হবে, কিন্তু মনুর মতে গান্ধর্ব্ব বিবাহের ও ইয়োরোপীয় সমাজে বিশৃঙ্খলা। (ঘ) যৌবন-বিবাহ ও ব্যভিচার।

(৪) বাল্য-বিবাহ ও যৌবন-বিবাহের রফা বা সমন্বয়। (৫) প্রাচীন ভারতের গৌরবের যুগে যৌবন-বিবাহ ছিল কি না। (৬) পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ দেওয়া উচিত কি না। (৭) বিবাহের উপযুক্ত বয়স কি? (৮) বাল্য-বিবাহের ফলে অকাল-মাতৃত্ব-নিবন্ধন দোষগুলি বর্জ্জন করে গুণগুলি লওয়া সম্ভব কি না। (৯) পাত্র ও পাত্রী নির্ব্বাচন-প্রণালী। (ক) স্বয়ং নির্ব্বাচনের দোষ। (খ) স্বয়ং নির্ব্বাচনের গুণ। (গ) গুরুজনের নির্ব্বাচনের দোষ। (ঘ) গুরুজনের নির্ব্বাচনের গুণ। (ঙ) কিরূপ পাত্র ও পাত্রী নির্ব্বাচন করা উচিত। (চ) মীমাংসা। (১০) বর্ত্তমান স্কুল কলেজে স্ত্রী-শিক্ষা। (১১) মেয়েদের শিক্ষার ভাল জায়গা বাপের বাড়ী না শ্বশুর বাড়ী? (১২) প্রজাবৃদ্ধি ভাল না মন্দ? (১৩) প্রজাবৃদ্ধি ভাল ধরে নিলে কি তার জন্য বাল্য-বিবাহ হওয়া দরকার? (১৪) অনাবশ্যক লোক-সংখ্যা-বৃদ্ধি নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায় কি বিধবা-বিবাহ রহিত করা? (১৫) বিধবা-বিবাহ বন্ধের প্রকৃত কারণ কি? (১৬) বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি?

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

বীণা তাহার ঘরে একখানা সোফার উপরে একা শুইয়া উদাস নেত্রে জানালার বাহিরে চাহিয়া পড়িয়া ছিল। অবিরাম রোদনে তাহার চোখ দুটি আরক্তিম ও স্ফীত। একখানি লতাপুষ্পখচিত রেশমি রুমালে সে ক্ষণে ক্ষণে চোখের জল মুছিয়া ফেলিতেছিল।

স্বভাবতই অপূর্ব্ব সুন্দরী সে। এমন উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় রূপ সচরাচর চোখে পড়ে না। সর্ব্বদা সযত্নরচিত বেশভূষা, সাজসজ্জায় সেই সংস্কৃত ও মার্জ্জিত সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ প্রভায় দর্শকের দৃষ্টি ও মন মুগ্ধ করিয়া তুলিত। সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতেই সে রূপ অপূর্ব্ব ও নয়নাভিরাম। আজও তাহার সেই অশ্রুসিক্ত ম্লান করুণ রূপে তাহাকে সুদক্ষ শিল্পীর রচিত মনোরম চারু প্রতিমার ন্যায় দেখাইতেছিল।

সে অত্যন্ত কোমল ও লঘুপ্রকৃতি। অজস্র আদরে ও প্রশ্রয়ে পালিত হওয়ায় তাহার প্রকৃতি গঠিত হইতে পারে নাই। সে প্রজাপতির মতই মনোরম—প্রকৃতিও তাহার সেইরূপ সুখী ও আমোদপ্রিয়; সংসারে অভাব বা দুঃখ-কষ্টের কল্পনামাত্রও সে সহিতে পারে না। তাহার জীবনের এই প্রথম আঘাতে সে সত্যই প্রথমটা একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

লীলা ধীরে নিঃশব্দ পদে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ মুগ্ধ ও স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে ভগিনীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার পাশে ধীরে বসিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া ডাকিল—দিদি! উচ্ছ্বসিত অশ্রুর আবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। বীণা মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই লীলার সজল নয়নের সহিত দৃষ্টি মিলিত হইল।

"লিলি! আমার বুকটা যেন ভেঙ্গে গেছে ভাই!" বীণা বালিশে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। লীলা নিঃশব্দে তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছিল, তাহার চোখের জলে বীণার মাথার চুলের রাশি সিক্ত হইতে লাগিল।

টেবিলের উপর সুদৃশ্য ফ্রেমের ভিতর হইতে অরুণের নিশ্চল প্রতিকৃতি নীরব সহাস্যমুখে এই দুই ক্রন্দনরতা ভগিনীর দিকে চাহিয়া ছিল।

শোকের বেগ একটু প্রশমিত হইলে লীলা বলিল, অরুণের ভাগ্যে যে এমন দুর্ঘটনা ঘটবে, তা কে ভেবেছিল?

চিরজীবনের মত দৃষ্টি হারিয়ে থাকা যে কি ভয়ানক—মনে মনে কল্পনা করতেও পারা যায় না। যা হোক, সব মন্দ জিনিসের ভিতরই কিছু না কিছু ভাল থাকেই,—এখন সেইটাই আমাদের পরম সান্ত্বনা। তুমি যে তাকে একবারে হারাও নি, এইটেই এখন সব চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের কথা নয় কি ভাই?"

বালিশের উপর হইতে মুখ তুলিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে বীণা বলিল, এখন আর তাতে আমার কোন সান্ত্বনাই নেই।

—"কেন নেই? ভেবে দেখলে এখনো এর ভাল দিক-টাও ঢের আছে। যুদ্ধে অরুণ একেবারে মারা পড়তেও পারতো, তা হলে আর তাকে ফিরে পাবার কোন আশা থাকতো না। এখন সে বেঁচে আছে, এখনো তোমাকে সে আগের মতই বা হয় ত আগের চেয়েও বেশি ভালবাসে। সে আবার তোমারি কাছে ফিরে আসছে। এখন এইগুলোই ত পরম সান্ত্বনা দিদি!"

—"তুমি যে গোড়ার কথাটাই বুঝছো না লিলি! এর পরে আর তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ হতে পারে না। আমি তার সেই দৃষ্টিহীন চোখ, সে মুখ কিছুতেই দেখতে পারবো না। এ কথা মনে করতে গেলে আমি যেন পাগল হয়ে উঠি। আমার বুকের ভিতর যে কি রকম করছে, তুমি বুঝতে পারবে না। মনে হচ্ছে, যে দিকে হোক, ছুটে পালিয়ে যাই,— তাতে যদি মনে শান্তি আসে!"

লীলা সস্নেহে তাহার বিশৃঙ্খল চুলের গোছা গুছাইয়া দিতেছিল। সে বলিল, জীবনের প্রথম আঘাতেই এমন করে ভেঙে পড়ো না ভাই! সংসারে মানুষকে অনেক ধাক্কা খেয়ে, অনেক ঝড় তুফানের মধ্য দিয়ে যেতে হয়,—এত অল্পে কাতর হলে কি চলে? তুমি ত কোন দিন জীবনে কোন কষ্ট পাও নি, দুঃখ সহ্য করতে মোটেই অভ্যস্ত নও,—তাই প্রথমটা এ রকম মনে হচ্ছে। ধীরভাবে গ্রহণ করতে পারলে দেখবে, ক্রমেই এটা সহজ হয়ে আসছে। আরও দেখবে যে, যাকে ভালবাস, এত সহজে তাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া যায় না। তাকে দেখতে হবে বলে এখন এত ভয় পাচ্ছ, এর পরে দেখবে, তাকে সুখী করা ছাড়া জীবনে তোমার আর প্রার্থনীয় কিছু নেই। আর এ তো এখন তোমারি কাজ দিদি! তোমার ভালবাসার আশ্রয় ছাড়া আর কোথায় তার শান্তি আছে? সংসারে আমাকে কোথাও দরকার নেই তা জানি; কিন্তু ধরো, যদি আমাকে কারু এমনি দরকার হতো, আমি কি তখন পেছিয়ে আসতুম?

টেবিলের উপর সুদৃশ্য পুষ্পাধারে ফুল সাজান ছিল. বীণা একটা গোলাপ তুলিয়া লইয়া বলিল, "উঃ,! মাথাটা এমন ধরেছে!"

সে ফুলটি নাকের কাছে ধরিয়া লীলার কথার উত্তরে বলিল, "তুমি যে পিছোতে না, তা আমি জানি লিলি! তুমি চিরদিনের গোঁয়ার, দশ জনে যা করতে ভয় পায়, তুমি না ভেবে চিন্তে তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়,—এই তোমার স্বভাব। কিন্তু তুমি তো জানো, আমি ঠিক তার উল্টো প্রকৃতির! আমি বড় অল্পে কাতর; দুঃখ-কষ্ট আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না। অরুণকে বিয়ে করা দূরে থাক, আমি আর কখনো তার সঙ্গে দেখা করতেও পারবো না। মা বলেছেন, এ বিয়ে হলে আমার সমস্ত জীবন নষ্ট হয়ে যাবে।"

"মার কথা চুলোয় যাক! বয়স তো যথেষ্ট হলো, নিজের কথা একটু নিজে ভাবতে শেখো দিখি!" অত্যন্ত রাগিয়া লীলা এই কথা বলিয়াই তখনি নিজেকে সংযত করিয়া লইল, শান্তভাবে বলিল, "তুমি যদি তাকে সত্যই ভালবেসে থাক, তা হলে এখন তোমার কি করা উচিত বা অনুচিত, এ কথা অন্যের তোমাকে শেখাবার কোন দরকার হবে না। তোমার নিজের মন থেকেই এর উত্তর পাবে। আমি তাই বলছি, এখন মিছে কান্নাকাটি না করে, কথাটা ভাল করে শেষ পর্য্যন্ত ভেবে দেখ, কি তুমি করতে পার। আমার মতে তোমার সর্ব্বপ্রথম কাজ হচ্ছে তাকে লেখা, যে, ঘটনা যেমনি হোক, তার সঙ্গে তোমার যে সম্বন্ধ তা অনিবার্য্য, কেউ তা রোধ করতে পারবে না। তোমার এই কথা তাকে যে কত শান্তি দেবে, তা তুমি এখন বুঝতে পারছো না।"

"আমি কখনো তাকে এ কথা লিখতে পারি না—কখনো না! তুমি কি পাগল হয়েছ লিলি?" উত্তেজনার আতিশয্যে বীণা বিছানায় উঠিয়া বসিল। "আমি যখন নিশ্চয় জানি, যে, তার সঙ্গে আমার বিয়ে অসম্ভব, তখন

খামকা তাকে মিছে আশা দিয়ে চিঠি লিখে লাভ কি? যদিও এ ঘটনায় আমার বুক একেবারে ভেঙ্গে গেছে, তবু তাকে সত্য কথা বলবার মত সাহস আমার যথেষ্ট আছে!"

লীলা একদৃষ্টে বীণার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, সে বলিল, "তুমি যদি এটা একেবারে স্থিরনিশ্চয় বলে মীমাংসা করে রেখে থাক, তা হলে এর ওপর আর বলবার কি আছে! এখন তা হলে মাকে নিশ্চিন্ত হতে বলি গে। তিনিই ব্যস্ত হয়ে আমায় তোমার কাছে পাঠিয়েছিলেন, পাছে তুমি ভালবাসার খাতিরে তাকে কোন আশা দিয়ে চিঠি লিখে ফেল। তাঁর বোঝা উচিত ছিল, আর যে যাই করুক, তাঁর বীণা কখনো এমন কাজ করতে পারে না।"

তার পর একটু হাসিয়া সে আবার বলিল, তোমরা ত জানোই—আমি একরোখা কাঠখোট্টা মানুষ—খাই দাই, ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াই। বড় জোর একটু পড়াশুনা করি। কিন্তু ভালবাসার কোন ধার ধারি না—ও বিষয়টা ভাল বুঝিও না। তুমি আজ যে ভালবাসার নমুনাটা দেখালে ভাই! এই যদি ভালবাসা হয়, তাহলে ও বস্তুকে দূর থেকেই নমস্কার করছি! আমার এই কাঠখোট্টা স্বভাবই ভালো—ও জিনিস বুঝে কোন দিন দরকার নেই বাবা!"

বীণার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে মুখ ভার করিয়া বলিল, "মা যে বলেন, তোমার কিছু মায়া-দয়া নেই, তুমি একেবারে হার্টলেস্—তা সে কথা সত্যি; না হলে তুমি আমার এমন শোকের সময় আমায় এ রকম ঠাট্টা করতে পারতে না!"

লীলা হাসিয়া বলিল, "দোহাই তোমার, রাগ করো না মিছেমিছি! যেটা তুমি শোক বলে ভাবছো, ওটা শোক নয়—শোকের অভিনয় মাত্র। তোমাদের সমাজের নিয়ম ও ফ্যাসান যে, এ রকম ঘটনা হলে নায়িকার বুক-ভাঙ্গা পতন, মূর্চ্ছা, শোক ইত্যাদি হওয়া উচিত,—তুমিও সে নিয়মটা উল্টে দিতে পারো না। কাজেই যা যা করতে হয়, সবই করেছ; আর দু এক ঘণ্টা বাদে একেবারে চাঙ্গা হয়ে উঠবে—এখন কোন ভয় বা ভাবনা নেই। যথার্থ আঘাত যার লাগে, সে কি সে সময় বসে বসে নিজের ভাল মন্দ সম্বন্ধে এখন চুলচেরা বিচার করতে পারে? যা হোক, আমি এখন যাই—তোমাকে সান্ত্বনা দেবার বিশেষ কিছু ত দরকার দেখছি না। ভাল কথা, অরুণের চিঠিখানার কি জবাব দেবে তা হলে?"

—"সে আমি ওই টেবিলের ওপর লিখে রেখেছি। কিন্তু লিলি, তুমি সব সময় আমার সঙ্গে এমন নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার কর—এ একেবারে আমার পক্ষে অসহ্য!"

বীণা রুমালখানা তুলিয়া লইয়া আবার চোখ ঢাকিল।

লীলা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিল, "এর মধ্যেই লিখে ফেলেছ? কই, দেখি?"

টেবিলের উপর হইতে খোলা চিঠিখানা চকিতে তুলিয়া লইয়া লীলা পড়িতে লাগিল—

"প্রিয় অরুণ! তোমার দুর্ভাগ্যের সংবাদ আমায় এক-বারে ভেঙ্গে দিয়েছে। আমি যে কি যন্ত্রণায় দিন কাটাচ্ছি, সে লিখে জানাতে পারবো না। তুমি আমাদের বিবাহের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিতে চেয়েছো, আমিও অনেক ভেবে দেখেছি—এখন সেইটাই উচিত। কারণ এখন তোমার যে রকম স্ত্রীর দরকার, আমি তার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। আমি অত্যন্ত অল্পেতেই কাতর হয়ে পড়ি—ধৈর্য্য ও সহ্য করবার শক্তি আমার মোটে নেই। সেবা ও যত্ন—যা তোমার এখন সারা জীবন অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন—আমি তাতে একবারে অক্ষম। মা-ও বলেছেন, এ বিবাহ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া এখন আমাদের দুজনের পক্ষেই অত্যন্ত কষ্টকর, তাই আমার মনে হয়, এ কষ্ট স্বীকার করবার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আমি তোমায় কখনো ভুলবো না, কখনো না! প্রার্থনা করি—তোমার অবশিষ্ট জীবন যতদূর সম্ভব—যেন সুখী হয়! এখন তবে বিদায়!

বীণা—

লীলা পত্র পাঠ করিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—এ কি হৃদয়হীনের মত নিষ্ঠুর উত্তর! পত্রের কোনখানে একটা আন্তরিক স্নেহ ভালবাসা বা সমবেদনার লেশমাত্র নাই! মানুষ যাহাকে ভালবাসে, তাহার দুরবস্থার সময় এমনি করিয়া এক কথায় তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে?

বীণা কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শেষে বলিল, লিলি! তুমি এখানা ডাকে ফেলিয়ে দিতে পারবে? অরুণ এখন কিছু দিন কিরণের কাছে থাকবে

লিখেছে। চিঠিখানা বসন্তপুরের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলেই চলবে।

লীলার আর কোন কথা বলিবার প্রবৃত্তি ছিল না। সে পত্রখানা হাতে করিয়া নিঃশব্দে কক্ষ ত্যাগ করিল।

(৬)

অপরাহ্নে মিঃ রায়ের ভবন সংলগ্ন টেনিসকোর্টে বীণা তাহার বন্ধুদের সঙ্গে টেনিস খেলিতেছিল। লীলার কথাই ঠিক—সমস্ত দিন একা ঘরে বদ্ধ থাকিয়া ও প্রচুর অশ্রুবর্ষণ করিয়া তাহার হৃদয়ের ভার লঘু হইয়া গিয়াছিল। সে প্রজাপতির মতই মনোরম—ও তাহারি মত চঞ্চল ও লঘু-প্রকৃতি—তাহার মধ্যে কোন গভীরতা ছিল না। যেমন সে অল্প আঘাতে মুহ্যমান হইয়া পড়ে—তেমনি অল্পেতেই সব ভুলিয়া যায়। কোন কিছুই তাহার অন্তরে স্থায়ী ভাবে ছাপ রাখিতে পারে না।

লীলা তাহার সঙ্গে রুবে আসিয়াছিল,—সে খেলায় যোগ না দিয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া সকলের খেলা দেখিতেছিল। আজ তাহার মনে প্রতি দিনের মত আনন্দ বা স্ফূর্ত্তি ছিল না,—সমস্ত দিনের মধ্যে আজ সে একবারও তাহার অভ্যস্ত লেখাপড়ায় বা কোন কাজে মন দিতে পারে নাই। অরুণের শোচনীয় পরিণামের কথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। এ সম্বন্ধে তাহার নিজের কাতরতা দেখিয়া নিজেই সে মনে মনে বিস্মিত হইতেছিল। সকলেই এ সংবাদ শুনিয়াছিল, ও শুনিবামাত্র আহা! উহু! করিয়া দুফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া হৃদয়ভার লঘু করিয়া ফেলিয়া, এ সম্বন্ধে যথাকর্ত্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছে, স্থির করিয়া—প্রতি দিনের মত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে খুই সহজেই ত মন দিল; কিন্তু তাহার এ হইল কি! যাহাকে সে কোন দিন চক্ষে দেখে নাই, যাহার সঙ্গে তাহার কোন পরিচয় মাত্র নাই, তাহারি কথা ক্ষণে ক্ষণে মনে হইয়া কেবলি আজ তাহার চোখে জল আসিতেছে, এ কথা সে কাহাকে বলিবে, কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না।

ও পাশের কোর্ট হইতে টেনিসের ব্যাট হাতে লইয়া নির্ম্মলা ছুটিয়া আসিল। "লীলা! খেলতে যাবি নি! দাঁড়িয়ে আছিস যে?"

লীলা বলিল, আজ আমি খেলবো না ভাই! তোরা যা, খেলগে,—আমার আজ ভাল লাগছে না কিছু!

নির্ম্মলা কাছে আসিয়া লীলার মুখের কাছে মুখ লইয়া কিছুক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া সকৌতুকে বলিল, তোর আবার আজ হলো কি? মন ভাল না থাকা, মুখ ভার, এ সব উপসর্গ তোর ত কোন কালে ছিল না,—ও সব ত আমাদেরি একচেটে জিনিস। কিন্তু আজ উল্টো রকম দেখছি যে! না ভাই! চল্! একজন পার্টনার না হলে আমাদের খেলা হচ্ছে না! আমার সঙ্গে তুই খেলবি চল! নির্ম্মলা লীলার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

লীলা হাত ছাড়াইয়া বলিল, না ভাই নিলি! আজ আমি খেলতে পার্ব্বো না। সত্যিই কিছু ভাল লাগছে না! ওই ওধারে প্রভা দাঁড়িয়ে আছে,—ওকে ডেকে নিয়ে তোরা খেলগে যা!

—"ও কিছু খেলতে পারে না। কিন্তু তাও না হয় ওকে নিয়েই খেলছি; কিন্তু তোর হল কি—সেটা বল? এখানে একা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবি তুই—এই রকম মুখ করে—দেখে আমি খেলতেই বা যাই কি করে?"

বাহিরে মোটরের হর্ণ বাজিয়া ওঠায় লীলা উৎকর্ণ হইয়া সেই দিকে চাহিয়া ছিল,—অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও কাহাকেও না দেখিয়া বলিল, হবে আর কি! মনটা বিশেষ ভাল নেই! কিন্তু কিরণ আজ কেন এখনো আস্‌ছে না বল্ তো? সে তো এত দেরি কোন দিন করে না?

নির্ম্মলা লীলার দিকে চাহিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, অবাক করেছিস তুই! এই জন্যে মুখে বিশ্বের বোঝা নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস বুঝি? যা হোক, এতক্ষণে একটা হদিস্ পাওয়া গেল! আহা মরে যাই আর কি!

নির্ম্মলা তাহার পরিপুষ্ট শুভ্র বেলফুলের মত মুখখানি লীলার মুখের কাছে আনিয়া সকৌতুকে গাহিল—

"ওই বাঁশী-স্বর তার, আসে বার বার
সেই শুধু কেন আসে না—
এই হৃদয় আসন শূন্য পড়ে থাকে
কেঁদে মরে শুধু বাসনা।"

লীলা রাগিয়া তাহাকে এক ধাক্কা দিয়া বলিল, যা—দূর হ এখান থেকে, বিশ দিন না বলেছি—কিরণ আমার

বন্ধু—তাকে নিয়ে তোদের ঐ সব চিরকেলে পচা ঠাট্টা করবিনি কখনো?

নির্ম্মলা বলিল, ও বাবা! মেয়ের যে একেবারে মিলিটারী মেজাজ দেখছি! মরগে যা তবে এখানে একলা দাঁড়িয়ে! কিরণ এলে এর শোধ নিয়ে তবে আমার অন্য কাজ!

নির্ম্মলা চলিয়া গেলে লীলা এদিক ওদিক ঘুরিয়া হলের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পিতা ও মিঃ ঘোষ ব্রীজ খেলায় মত্ত ছিলেন, সে কিছুক্ষণ তাহাই দেখিতে লাগিল।

মিঃ রায় বলিলেন, লিলি যে আজ এদিকে? খেলতে যাও নি?

লীলা শ্রান্ত কণ্ঠে বলিল, না বাবা! আজ খেলতে ভাল লাগছে না!

তাহার পরই সে মিঃ ঘোষের বিশাল পরিপুষ্ট স্কন্ধদেশে তাহার হাত রাখিয়া আবদারের সুরে বলিল, কাকা! আপনি যে নতুন বাগানবাড়ী কিনলেন, আমরা বুঝি সেখানে যেতে পাব না? কবে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন, বলুন!

মিঃ ঘোষ তাসের হিসাব একমনে করিতেছিলেন, সহসা আক্রান্ত হইয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, তোরা যে দিন যাবি—সেই দিনই—ওর আর আমি দিন ঠিক করব কি রে পাগলী? নির্ম্মলাকে বলে তোরা একটা দিন ঠিক করে চল্ না—কালই কি পরশু, যেদিন তোদের সুবিধে হয়।

তাঁহারা আবার খেলায় মন দিলেন। লীলা শূন্যমনে ঘুরিতে ঘুরিতে মায়ের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

ক্লবঘর উজ্জ্বল আলোকমালায় শোভিত—ঘরে ঘরে বিলিয়ার্ড খেলা, তাস খেলা চলিতেছে। বারাণ্ডার স্থানে স্থানে তরুণীর দল তাহাদের ভক্ত উপাসক-বৃন্দে বেষ্টিত হইয়া আলাপে মগ্ন—মাঝে মাঝে তাহাদের সুমিষ্ট হাসির ধ্বনি ও গল্পের মৃদু গুঞ্জন অস্পষ্টভাবে শোনা যাইতেছিল। প্রবীণা গৃহিণীর দল এক স্থানে সমবেত হইয়া পরস্পরের চর্চ্চায় চিত্তবিনোদন করিতেছিলেন।

মিসেস দত্ত পাটনা সহরের একটি গেজেটবিশেষ—সহরের সর্ব্বসাধারণের ঘরের খবর তাঁর নখদর্পণে বিরাজ করিত। কে তাহার ঘরে কি দিয়া ভাত খায়, অমুক বাড়ীর ছেলেটা কত রাত্রে বাড়ী ফেরে, কোন বাড়ীর মেয়েদের লজ্জা ও শীলতা সীমা অতিক্রম করিতেছে, কোন বাড়ীতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব নাই, এ সমস্তই তিনি মুখে মুখে বলিয়া দিতে পারিতেন। একবার কাহাকেও নিরীক্ষণ করিলেই তিনি তাহার রীতি-চরিত্র, নাড়ী-নক্ষত্র—সব অবলীলাক্রমে বলিয়া দিতেন। তাঁহার কথার বিরুদ্ধে কেহ কোন প্রমাণ আনিলেও, তাঁহার রায়ের কখনো পরিবর্ত্তন হইত না। তিনি বিজ্ঞের মত হাসিয়া বলিতেন, আমরা হলুম সবজান্তা লোক, আমাদের কাছে চালাকি? হুঁ! ইহার পর আর কোন কথা চলিত না।

লীলা শুনিল—এ হেন প্রতিযশা মিসেস দত্ত তাহার মাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছিলেন, তা তুমি বেশ করেছ দিদি! এ ক্ষেত্রে বিয়ে ভেঙে না দিয়ে আর উপায় কি? মেয়েটাকে ত আর হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে পারো না? আর মেয়ে বলে মেয়ে! এমন মেয়ে এ সহরের কথা ত ছেড়েই দাও—বাংলা দেশে খুঁজলে আর একটা পাবে না—এ আমি এই বড় গলায় জোর করে বলতে পারি! কি দুঃখে এমন সোণার প্রতিমা অন্ধের হাতে ধরে দেবে?

মিসেস রায় এই সহানুভূতিতে একবারে গলিয়া গেলেন। বীণা অদূরে একখানা সোফায় বসিয়া বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করিতেছিল। মিসেস রায় একবার সস্নেহ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তাই তোমরা পাঁচজনে বল ত ভাই! এতে কি আমার অন্যায় হয়েছে কিছু? বিশেষ যখন প্রস্তাবটা সে নিজেই করেছে! মেয়ে সকাল থেকে আর ঘর থেকে বেরোল না, কেঁদে কেঁদে খুন! আমার এত ভাবনা হয়েছিল, সে কি আর বোলবো! বিকেলে যখন কাপড় ছেড়ে নেমে এলো, তখন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম! যা হোক, তবু কতকটা সামলেছে দেখে এখানে নিয়ে এসেছি,—পাঁচজনের মধ্যে থাকলে মনটা শীঘ্র ভাল হবে!

মিসেস দত্ত বলিলেন, বেশ করেছ! খেলাধূলো করুক, আর পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে মিশুক, সব ভুলে যাবে! ও মেয়ের আবার বিয়ের ভাবনা! কত লোকে মাথায় করে নিয়ে যাবে! এই দু'চার দিনের ভিতর কলকাতা থেকে আমার এক বোন-পো আসছে, ছেলে যাকে বলতে

হয়! চেহারা কি! তরুণ কোথা লাগে তার কাছে! বাংলা দেশে মস্ত জমিদারী—রাজা উপাধি তাদের, এলে দেখো তখন...

একজন মহিলা বলিলেন, আজকাল সরলাকে যে আর দেখতে পাই নে? সে তো এদিকে আসা এক রকম ছেড়েই দিয়েছে দেখছি! পাটনায় আছে, না চলে গেছে কলকাতায়?

মিসেস রায় বলিলেন, না, সে এখানেই আছে। সেদিন একটা চিঠি দিয়েছিল,—শরীর ভাল থাকে না, তাই আসতে পারে না লিখেছে।

মিসেস দত্ত একটু হাসিয়া বলিলেন, ও সব বাজে কথা! বাড়ীর পাশে থাকি আমি! আমার কাছে কি আর কোন খবর লুকানো থাকে! যে সব ব্যাপার চলছে আজকাল... কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া তিনি নীরব হইলেন।

তখন চারিদিক হইতে সমস্বরে 'কি হয়েছে'? 'ব্যাপার কি'? ইত্যাদি প্রশ্ন উঠিতে লাগিল। যা হোক এতক্ষণে একটা মুখরোচক বিষয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে!

মিসেস দত্ত তখন জাঁকিয়া বসিয়া একটি বিরাট ভূমিকা ফাঁদিলেন,—ব্যাপার আর কি! স্বামী স্ত্রীতে বনিবনাও হচ্ছে না! মেয়েরা ত অল্প বয়সে নিজের মন ভাল করে বোঝে না—খালি ওপরচটক দেখে ভুলে যায়! যাই বল দিদি! আমি ঐ সব বিদেশী লোকগুলোকে বিয়ে করার একেবারে বিপক্ষে! ওতে কখনো সুফল হতে ত দেখলুম না। এই সরলা—গোড়ায় বুঝলে না—ঢের বুঝিয়েছিলুম—এখন টের পাচ্ছেন ত? কথাটা শেষ করিয়া তিনি একবার বিজয়গর্ব্বে সকলের মুখের দিকে তাকাইলেন।

—"কিন্তু সরলা ত খুব ভাল মেয়ে? তার সঙ্গে না বনবার কারণ কি?"

—"কারণ আর কি? মারাঠিগুলো যে কাঠখোট্টা গোঁয়ার—ওরা কি কখনো আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে পারে? যতই লেখাপড়া শিখুক, জাতের স্বধর্ম্ম যাবে কোথা? ও পাঞ্জাবী, মান্দ্রাজী, মারাঠি সব সমান! বাঙ্গালীর মধ্যে যে কোমলতা, যে ভদ্রতা আছে, আর কোন জাতে ত সেটি কই দেখলুম না।"

মিসেস রায় বলিলেন, তা সরলা যদি এত কষ্টই পাচ্ছে, তা হলে ওদের মধ্যে ত ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়া ভালো। সদ্ভাবই যদি না থাকে, তবে মিছে এ সংসারের অভিনয় করে আরো নিজেদের জীবনে দুঃখ ডেকে আনার দরকার কি?

—"ছেলেটি আছে যে! ছেলেকে সে ছাড়তে চায় না! আমি ত কত দিন ও কথা বলেছি তাকে! বল্লেই কাঁদে—বলে, ওর জন্যে আমি সব সহ্য করে বেঁচে থাকবো।"

এ কথায় উপস্থিত মহিলাদের সকলের মনই একটি করুণ সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মিসেস দত্ত অতঃপর কোন্ প্রসঙ্গ তুলিয়া সভা জমাট রাখিবেন, এই অবসরে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

লীলা বিরক্ত হইয়া হল ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

কিরণ সেদিন একটু দেরী করিয়া আসিয়াছিল। লীলা বলিল, আর একটু হলেই তোমার সঙ্গে আজ আমার বিষম ঝগড়া হয়ে যেত!

'অপরাধ'?—বলিয়া হাসিয়া কিরণ লীলার হাত ধরিল। খোলা বারাণ্ডা দিয়া উন্মুক্ত চাঁদের আলো তাহাদের দুজনের মুখে চোখে রজতধারা ঢালিতেছিল।

লীলা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই নির্ম্মলা আসিয়া তাহাদের নিকটে দাঁড়াইল। বলিল, এই যে কিরণবাবু! এই এলেন বুঝি? আজ আপনার বড় দেরী হয়েছে! লীলা বিকেল থেকে যা ব্যস্ত হচ্ছিল! বলিয়া সে অর্থপূর্ণ কটাক্ষে লীলার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল।

কিরণ কিছু না বুঝিয়া সরলভাবে বলিল, তাই না কি? এত ব্যস্ত হবার কারণটা কি লিলি? দরকার ছিল কিছু?

নির্ম্মলা নিরীহের মত বলিল, আপনাদের যে কেমন স্বভাব! দরকার না থাকলে বুঝি আর মানুষ কারুকে খুঁজতে পারে না? যাক, বসুন আপনারা, আমি বাড়ী যাই! রাত হয়েছে!

কিরণ বলিল, কিচ্ছু রাত হয়নি এখনো! তুমিও বসো না—গল্প করা যাক খানিকটা!

—নাঃ! আমার আজ কাজ আছে! একটা গান প্র্যাকটিস্ করতে হবে! ঐ যে ভাল—সেই গানটা

আপনি জানেন কিরণবাবু? 'হায়! মিলন হলো! যখন যৌবন ফুরালো আর বসন্ত গেলো!'—ঐটে?

কিরণ একটু বিব্রতভাবে মাথা চুলকাইয়া বলিল, ঐটে কেন, আমি ত কোন গানই জানি না, সে তো তুমি জানই!

নির্ম্মলা কথাটা শেষ করিয়াই মুখে রুমাল দিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল,—কিরণের উত্তর শুনিবার জন্য দাঁড়াইল না।

কিরণ কিছুই বুঝিল না; হাসিয়া বলিল, 'নির্ম্মলাটা আচ্ছা পাগলা দেখছি! কিন্তু সত্যি কেন খুঁজছিলে আমাকে লিলি? কিছু দরকার ছিল?

—"ছিল না? বিশেষ দরকার! বিকেল থেকে খুঁজে খুঁজে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি,—ওঁর আসবার আর সময়ই হয় না! কি করছিলে এতক্ষণ?"

কিরণ অনুতপ্ত হইয়া বলিল, তাই রাগ হয়েছে বুঝি? সত্যি লিলি! একটা কাজ ছিল, সেটা সেরে আসতে একটু দেরী হয়ে গেছে! আমি কি জানি যে, তুমি আমায় খুঁজবে? যাক্, দরকারটা কি তোমার?

—"সে একটা ভয়ানক বিষয়!"

কিরণ হাসিয়া বলিল, যাকগে, ভয়ানক বিষয় পরে শোনা যাবে, আপাততঃ তোমার সঙ্গেও আমার বিশেষ ঝগড়া আছে। তুমি এত ভাল গান গাইতে পার, অথচ আমায় এত দিনের মধ্যে সে কথা কিছুই বল নি! আমি জানতুম, আমাদের বন্ধুত্বের মধ্যে কোন কথা গোপন থাকবে না।

লীলা বলিল, তোমায় কে বলেছে আমি গান গাইতে পারি?

—"বলবে আবার কে? আমি নিজে শুনেছি—তুমি আজ সকালে মাঠে গান গাইছিলে। আমায় গান না শোনালে, আমি তোমার কোন কথা শুনবো না! এত দিন আমায় কিছু বলা হয় নি!

লীলা হাসিয়া বলিল, সে কি আমার দোষ? লণ্ডনে থাকতে আমি গান বাজনা ভাল করেই শিখেছিলুম। এখানে এসে দেখি, সবাই বীণাকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত,—আমার বিষয় জানবার বা আমার গান শোনবার কারু অবসর নেই। আমার কেউ খোঁজ করে নি, আমিও নিজে থেকে কারুকে কিছু বলি নি।

—"বেশ করেছ! এখন উঠে এস! আজ আর ছাড়ছি না,—একটা গান শোনাতেই হবে!

—"কিন্তু কিরণ! ওরা সব বড় হাসবে তা হলে!"

—"তাতে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না।"

কিরণ লীলার হাত ধরিয়া জোর করিয়া তাহাকে পিয়ানোর কাছে বসাইয়া দিল। (ক্রমশঃ)

চন্দননগরের সাধক ও সিদ্ধপুরুষ (১)

শ্রীহরিহর শেঠ

প্রকৃত সাধু সংসারে খুবই বিরল হইলেও একেবারে দুর্ল্লভ নহে। জটাজুটধারী, কৌপিন বা গেরুয়া-পরিহিত সংসার-ত্যাগী সাধুর—বেশ-বৈশিষ্ট্যহীন সাধু বা সাধকের পরিচয় আমরা বড় রাখি না। এমন শ্রেষ্ঠতম সাধু যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের স্বরূপ চিনিবার মত লোকও সুলভ নহে। তেমন সাধু চন্দননগরে কয়জন আসিয়াছেন, কয়জন চলিয়া গিয়াছেন, তাহার কথা জানি না। কোন না কোন ক্ষমতা-সম্পন্ন এখানকার সাধু, সাধক বা সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া পরিচিত যে সব মহাপুরুষের কথা জানিতে পারা যায়, তাঁহাদের কথাই এখানে সংক্ষেপে বলিব।

চন্দননগরে কয়েকজন অলৌকিক ও অসাধারণ ক্ষমতাশালী সাধু বা সাধক পদবাচ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের নাম হনুমান দাস বাবাজি, নমাজি সাহেব, আলথু সা ও কানাইদাস বাবাজি। এতদ্ভিন্ন মাখন বৈষ্ণব ও দাতা সাহেব নামক আর দুই জন ছিলেন,—তাঁহাদেরও কিছু অসাধারণ ক্ষমতা ছিল; কিন্তু তাঁহাদের চরিত্রগত বিশেষত্বের কথা বড় কিছু শুনা যায় না।

হনুমান দাস বাবাজিকে দেখিয়াছেন, এমন বৃদ্ধ লোক কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও এখানে জীবিত ছিলেন। বাবাজি যখন এখানে থাকিতেন, তখন চন্দননগরের উপকণ্ঠে গঙ্গা-

(১) এই প্রবন্ধে লিখিত মহাত্মাদের কথা ভিন্ন যদ্যপি আর কাহারও কথা কাহারও কিছু জানা থাকে, বা ইহাতে কোন ভুল চুক থাকে, লেখককে চন্দননগরের ঠিকানায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে বাধিত হইব।

তীরে একটী সামান্য কুটীর তাঁহার আবাস স্থান ছিল ; এবং সময় সময় একটি তিন্তিড়ী বৃক্ষের উপর তাঁহাকে কালযাপন করিতে দেখা যাইত। তাঁহার প্রকৃত নাম কি ছিল এবং জন্মস্থান কোথায় ছিল, তাহা অজ্ঞাত। তিনি তেঁতুল গাছে থাকিতে ভালবাসিতেন বলিয়াই সম্ভবতঃ লোকে তাঁহাকে হনুমানদাস বাবাজি বলিত। তিনি ছোট ছোট বালক

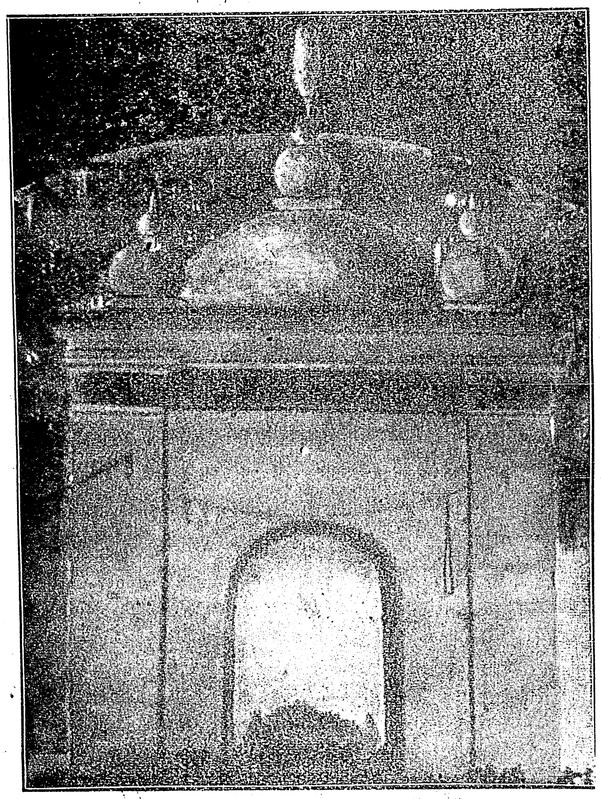

নমাজী সাহেবের সমাধি মন্দির (নমাজী পীরের আস্তানা)

বালিকাদের অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তাহারাও সর্ব্বদা তাঁহার নিকট আসিয়া বিরক্ত করিত। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই কারণেই তিনি গাছের উপর উঠিয়া বসিয়া থাকিতেন।

তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার সম্বন্ধে এত কথা প্রচলিত আছে যে, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। কথিত আছে, তিনি যাহা মনে করিতেন, তাহাই করিতে পারিতেন। ছেলেরা তাঁহার কাছে যাহা খাইতে চাহিত, তাহাই পাইত। এক দিন স্থানীয় কোন বণিক নৈহাটী হইতে ফরাশডাঙ্গায় নৌকা বোঝাই করিয়া গুড় লইয়া আসিতেছিলেন। বালকের দল ঐ গুড় খাইতে চাহিলে, বাবাজি বণিককে উহা হইতে কিছু দিতে অনুরোধ করেন। তাহাতে বণিক উত্তর দেন,—'ইহাতে গুড় নাই, পাঁক আছে।' পরে দেখা যায়, সমস্ত কলসগুলিই পাঁকে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। শেষে কাতর কণ্ঠে বাবাজিকে সবিশেষ জানাইলে, তাঁহার কৃপায় বণিক তাঁহার গুড় পুনঃপ্রাপ্ত হন।

বাবাজি ভাগীরথীর বারিবক্ষে পদব্রজে যথেচ্ছ ভাবে গমন করিতে পারিতেন। ইচ্ছা করিলেই অদৃশ্য হইতে বা নিমেষ মধ্যে বহুদূরে যাইতে পারিতেন। রথের সময় একই দিনে একই সময়ে তাঁহাকে পুরী ও মাহেষে রথ টানিতে এবং এখানেও ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া যাদুঘোষের রথ টানিতে বা উল্লাসে নৃত্য করিতে দেখা যাইত। তিনি ইচ্ছা করিলে একাসনে বসিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া স্বয়ং যেমন ত্রিভুবন পরিদর্শন করিয়া আসিতে পারিতেন, তেমনই অপরকেও ঐ প্রকারে নানা স্থান দেখাইতে পারিতেন। এক দিন তিনি গঙ্গাসৈকতে বসিয়া ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া তাঁহাদের সহিত বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর কথা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে একজন ভক্তকে "আমাদের অদৃষ্টে আর রাধাগোবিন্দজীর পাদপদ্ম দর্শনলাভ হলো না"—এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে জাহ্নবীর জলে ডুব দেওয়াইয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ মূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছিলেন। এইরূপ শত শত আশ্চর্য্য কার্য্যের কথা শুনা যায়। ক্ষুধার্ত্তের আহার, দরিদ্রের অর্থ, অপুত্রককে পুত্র দান তাঁহার পক্ষে

অতি সামান্য কথা ছিল। এক দিন প্রদোষকালে শ্মশানে রমণী-কণ্ঠ নিঃসৃত আর্ত্তনাদ শ্রবণে ব্যথিত হইয়া তথায় গমন করিয়া তিনি অবগত হন যে, রমণীর একমাত্র সন্তান কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। তিনি দয়া-পরবশ হইয়া মৃতের নিকট গিয়া তাহার কর্ণধারণ পূর্ব্বক "এই বেটা উঠ" বলিয়া সম্বোধন করিবামাত্র, বালক জীবন প্রাপ্ত হইয়া যেন গাঢ় নিদ্রাভঙ্গের পর ধীরে ধীরে উপবেশন করিল। বাবাজি রমণীকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে অনুমতি করিয়া, এ কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। সেই সরল-হৃদয়া রমণী গৃহে প্রত্যাগমনের পর সকলকে তাঁহার অসীম দয়ার এবং পুত্রের অদ্ভুত জীবন-প্রাপ্তির কথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না। এই ঘটনার পর হইতে ক্রমে তাঁহার কাছে লোক-সমাগম অত্যন্ত অধিক হইতে লাগিল। এই সময় তিনি এক দিন হঠাৎ এখান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ইহার পর তাঁহাকে আর কেহ চন্দননগরে দেখেন নাই। শুনা যায়, অল্প দিন পরেই তিনি পুরীতে দেহ-রক্ষা করেন। তাঁহার ন্যায় সিদ্ধপুরুষ এতদঞ্চলে আর কেহ ছিলেন বলিয়া জানা যায় না।

হনুমান দাসের সাধনা, ধ্যান ও যোগের কথা কেহ বলিতে পারেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে কালনায় সিদ্ধ ভগবান দাস নামক অপর একজন মহাপুরুষের কাছে যাইতেন। অনেকের বিশ্বাস, তিনিই হনুমান দাসের গুরু ছিলেন। সেই মহাপুরুষ আজি নাই, কিন্তু সহরের উপকণ্ঠে তাঁহার সামান্য জীর্ণ সমাধি-মন্দিরটী আজিও বিরাজ করিতেছে। তিন্তিড়ী বৃক্ষ কালের নিষ্ঠুর আবর্ত্তনে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু আজিও সেই পুণ্যময় স্থানকে লোকে তেঁতুল তলার ঘাট বলে। (২)

নমাজী সাহেবের ক্ষমতা ও সাধুতার কথা এখানে

(২) ১৩০৭ সালের 'পূর্ণিমায়' মল্লিখিত "হনুমান দাস বাবাজী" শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার বিষয় কিছু বিশদভাবে লিখিত আছে।

তিরুপত্তি মন্দিরের মোহান্ত ও তাঁহার শিষ্য চতুষ্টয়
(ছবির বামদিকে মধ্যস্থলের পোষাক পরিহিত শ্রীরামচন্দ্র)

অধিক লোকে বিশেষ ভাবে না জানিলেও; তাঁহার নামে উর্দ্দুবাজারে নমাজী পীরের আস্তানায় সহরের হিন্দু মুসলমান অধিবাসীদের অনেকেই মানসিক করিয়া প্রতি বৃহস্পতিবারে পূজা দিয়া থাকেন, এ কথা অনেকেই বিদিত আছেন। নমাজী সাহেব জাতিতে মুসলমান। তিনি একজন সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন ; প্রথমে বাজারে বসিয়া পাটোয়ারি করিতেন। এই সময় সরিষাপাড়া পল্লীস্থ মোল্লা হাজির বাগানে তাঁহার বাস ছিল। তিনি সময় সময় মৌনব্রত অবলম্বন করিতেন। কাম, ক্রোধ, লোভাদি রিপুর আক্রমণ-মুক্ত থাকিয়া ভগবৎ-চিন্তায় দিন যাপনই তাঁহার একমাত্র কাম্য ছিল। সঞ্চয়ের স্পৃহা তাঁহার ছিল না। কথিত আছে, এক দিন মিষ্টান্ন ভক্ষণের

জন্য তাঁহার লোভ জন্মে। তিনি তখনই বন্য কচু মুখে স্মরণ করিয়া, নিজ রসনাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, ভবিষ্যতে এরূপ হইলে উহাপেক্ষা অধিকতর শাস্তির ব্যবস্থা হইবে। হনুমানদাস বাবাজির ন্যায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার সম্বন্ধেও বহু গল্প শুনা যায়। তিনি চক্ষুর অগোচর স্থানের কথা এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিতে পারিতেন; কাষ্ঠ পাদুকা পরিয়া গঙ্গাপার হইতে পারিতেন

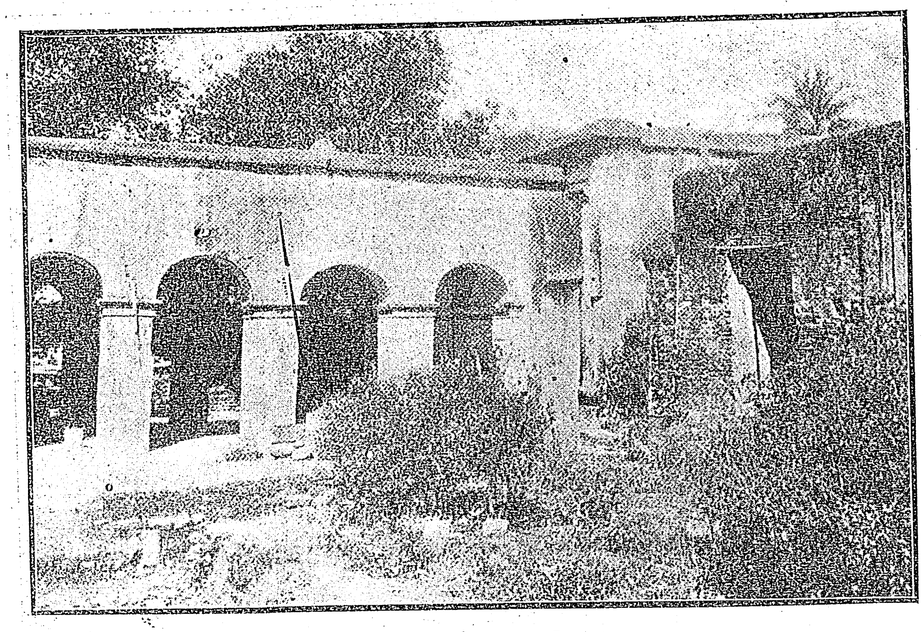

কালনার সিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজীর আশ্রম

বলিয়াও শুনা যায়। প্রায় এক শত বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি দেহ-রক্ষা করেন। তাঁহাকে হিন্দু মুসলমান সকলেই শ্রদ্ধা করিতেন। ৺বিশ্বম্ভর নায়েক নামক তাঁহার জনৈক ভক্ত ভদ্রলোক তাঁহার কৃপায় সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন এই বিশ্বাসে, তিনি শেষাবস্থায় যে স্থানে সর্ব্বদা থাকিতেন, তথায় একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া নিত্য সেবাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। উহাকে জনসাধারণে 'নিয়াজিপীরের আস্তানা' বলিয়া থাকে।

আলথু সাও একজন মুসলমান ফকির,—পাটোয়ারি পাড়ায় রাজা মুসলমানের বাড়ীতে বাস করিতেন। তিনি একজন বিশেষ পরোপকারী এবং সাধু ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ঐশী শক্তিবলে তিনি কঠিন ব্যাধি হইতে জনগণকে মুক্ত করিতে পারিতেন ও করিতেন। তাঁহার দেহত্যাগের নির্দ্দিষ্ট সময় তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন।

কানাইদাস বাবাজি নামক একজন নিরহঙ্কার, নিরভিমান প্রকৃত বৈষ্ণবের কথা জানা যায়। প্রায় ৫১ বৎসর পূর্ব্বে গোয়াবাগান নামক স্থানে ইনি বাস করিতেন। ইঁহার আদি বাস চট্টগ্রামে। বৈদ্যনাথ দে নামক এক ব্যক্তি ইঁহাকে এখানে লইয়া আইসেন। ইঁহার অসাধারণত্বের অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইনি সাধারণ ভিক্ষাবৃত্তিধারী বৈষ্ণবের মত ছিলেন। কেবল মৃত্যুর পূর্ব্বে ইনি আত্মীয়—স্বজনকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, যেন তাঁহার দেহাবসানের পর তাঁহার শবদেহ তাঁহারা কেহ স্পর্শ না করেন,—তখনকার কার্য্যের জন্য যথাসময়ে তাঁহার লোক আসিবেন। গঙ্গাতীরে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, আত্মীয়গণ পূর্ব্ব নির্দ্দেশমত আর কেহ মৃতদেহ স্পর্শ করিলেন না। এই সময় কোথা হইতে অবধূত বেশে প্রকৃতই দুইজন লোক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া মৃতকে লক্ষ্য করিয়া "এই যে ভায়া দেহত্যাগ করেছেন" —বলিয়া তাঁহারা উভয়ে ধরাধরি করিয়া সেই মুক্ত-প্রাণ দেহ ভাগীরথী-সলিলে নিক্ষেপ করিয়া তথা হইতে কোথায় তিরোহিত হইলেন, তাহা আর কেহ বলিতে পারিল না।

দাতাসাহেব ও মাখন বৈষ্ণব নামে যে দুইজনের নাম এখানে শুনা যায়, তাঁহারা এমন কি সাধুজনোচিত গুণবিশিষ্ট ছিলেন, তাহার কোন পরিচয় জানা যায় না; কিন্তু তাঁহাদিগকে অনেকেই ক্ষমতাবান সাধু বলিয়া মনে করিত।

উভয়েই কোন বিদ্যাবলে লোককে আশ্চর্য্যান্বিত করিতে পারিতেন, সেই জন্যই বোধ হয় জনগণের উপর তাঁহাদের কিছু প্রভাব প্রতিপত্তি জন্মিয়াছিল। তাঁহাদের দেখিয়াছেন এমন লোক এখানে এখনও আছেন। তাঁহারা সাধক বা সিদ্ধপুরুষ হউন বা না-ই হউন, তাঁহাদের এমন কিছু ক্ষমতা ছিল, যাহা সাধারণ লোকের মধ্যে পাওয়া যায় না। এই কারণেই তাঁহাদের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

দাতাসাহেব উত্তর-পশ্চিম দেশীয় একজন মুসলমান—প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে পাদরিপাড়ায় একজন ফকিরের ন্যায় একটি ভগ্ন কুটীরে বাস করিতেন। ইঁহার অলৌকিক ইন্দ্রজালের ন্যায় কার্য্যকলাপের কথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইনি নিজগৃহে শতগ্রন্থিযুক্ত মলিন বসন পরিধান করিয়া অতি সামান্য ভাবে থাকিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় প্রত্যহ অপরাহ্ণে সুন্দর রেশমি পোষাকে সজ্জিত হইয়া, দশ অঙ্গুলীতে দশটি হীরকাঙ্গুরীয় ধারণ করিয়া, গজদন্তনির্ম্মিত ছড়ি হস্তে রাজপুত্রের ন্যায় বেশে ভ্রমণে বাহির হইতেন। তিনি সকলের সহিত বেশ মেলা মেশা করিতেন এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বড় ভালবাসিতেন। ছেলেরাও তাঁহাকে বড় ভালবাসিত। সময় সময় তাহারা তাঁহাকে খাওয়াইবার জন্য ধরিলে, তিনি মিষ্টান্নের দোকানে লইয়া যাইয়া যাহা ইচ্ছা খাইতে বলিতেন। ছেলেরা সমস্ত মিষ্টান্ন খাইয়া ফেলিলে, তিনি সানন্দে দোকানদারকে সমস্ত দাম মিটাইয়া দিতেন। এক সময় কোন স্থানে যাত্রা হইতেছিল। তথায় তিনি এক দোনা পান কিনিয়া, সভাস্থ বহু লোককে যতক্ষণ যাত্রা হইয়াছিল, পান বিতরণ করিয়াছিলেন। কথায় কথায় তিনি অকস্মাৎ প্রচুর অর্থ উৎপন্ন করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতে পারিতেন। তাঁহার এই সব কার্য্যের জন্য রাজপুরুষগণের মনেও তাঁহার প্রতি সন্দেহ জন্মিয়াছিল। কথিত আছে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার গুপ্তধনের সন্ধানে সরকারি লোক তাঁহার কুটীরে আসিয়া সকল স্থান, এমন কি মাটির নীচে খুঁড়িয়া অনুসন্ধান করেন। বলা বাহুল্য, কিছু না পাইয়া শেষে ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া যান।

মাখন বৈষ্ণব সম্বন্ধেও কোন কোন ক্ষমতার কথা জানা যায়। তিনি এখানকার দোয়ারি যুগির যাত্রার

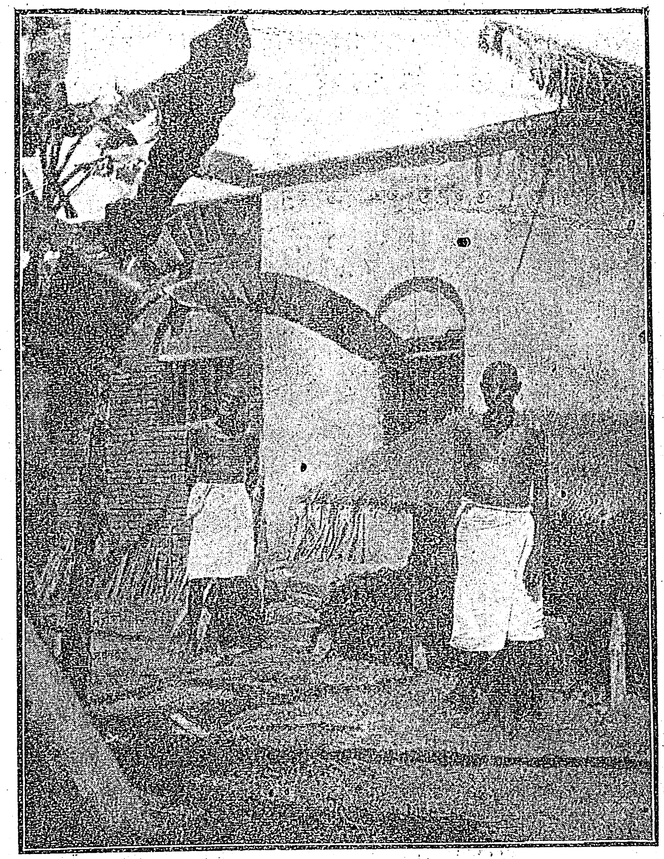

সিদ্ধ হনুমানদাস বাবাজীর আশ্রম (চন্দননগর তেঁতুলতলার ঘাট

দলে কাজ করিতেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি হনুমানের অংশ অভিনয় কালে অস্বাভাবিক রূপে লম্ফপ্রদান করিয়া দর্শকবৃন্দকে আশ্চর্য্য করিয়া দিতেন। তাঁহার লম্ফপ্রদান এতই আশ্চর্য্যজনক মনে হইত যে, তখন সে দলে যে পালাই গাওনা হইত, তাহাতে হনুমান রূপে তিনি একবার না দেখা দিলে, দর্শকগণের কিছুতেই

TIGHT BINDING.

পরিতৃপ্তি হইত না। এতদ্ভিন্ন আরও কোন কোন ক্ষমতার পরিচয় দিয়া তিনি লোককে আশ্চর্য্য করিতে পারিতেন।

স্বামী দেবপ্রসাদ চন্দননগরের একটি রত্ন। সংসার-আশ্রমে ইঁহার নাম ছিল দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। ইনি একজন প্রকৃত সাধক ছিলেন। বাঁদামতলা নামক পল্লীতে ১২৭১ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃদেব বলিতেন, তাঁহার জন্মের পর অকস্মাৎ তাঁহার বিশেষভাবে অর্থ-সৌভাগ্য সূচিত হইয়াছিল। তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কলেজে পঠদ্দশায় তাঁহার চাল-চলন সাহেবি ধরণের হইয়াছিল। এই সময়েই তাঁহার বিবাহ হয়। বাটীতে বি-এল পড়িবার জন্য, পিতা তাঁহাকে আইন পুস্তক কিনিয়া দিয়া উহার জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হন এবং ছুপ্লে কলেজে অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই কারণেই হৌক বা অন্য কোন কারণে হৌক, তিনি পিতার বিশেষ বিরাগ-ভাজন হন। এই সময় হইতেই তাঁহার সংসারের প্রতি বৈরাগ্যের ভাব পরিলক্ষিত হয়, এবং পত্নী বিয়োগের সহিত তাহা বেশ সুস্পষ্টাকারে দেখা যায়। একটি শিশু পুত্রকে রাখিয়া তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই সন্তানটিও বিনষ্ট হয়।

ইহার পরই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া কানপুরে জনৈক ব্রহ্মচারীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব্বেই সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল। তথায় তিনি শাস্ত্রচর্চ্চায় বিশেষ মনোযোগী হন। তৎপরে গুরু সমভিব্যাহারে কয়েক বৎসর ভারতের তীর্থ সকল পরিভ্রমণ করিয়া, সেতুবন্ধ রামেশ্বরে কিছুদিন অবস্থান করেন। তিনি প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। স্বামী দেবপ্রসাদ নাম তাঁহারই প্রদত্ত। গোস্বামী মহাশয়ের সহিত কাশীতে যাইয়া শ্রীমদ ভাস্করানন্দ স্বামীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তিনি তাঁহার কৃপা লাভ করেন। সম্ভবতঃ স্বামীজীর ব্যবস্থানুসারেই তিনি বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এনিবেশান্টের সহিত দেবেন্দ্রনাথের যথেষ্ট পরিচয় ছিল এবং তিনি তাঁহাকে ভালবাসিতেন। গোস্বামীজীর তাঁহার ন্যায় ভক্ত কমই ছিল। দেবপ্রসাদের কানপুরে অবস্থিতি কালে, এক দিন তিনি তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক মাথায় পাদুকা দ্বারা বিশেষ ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, ভক্তপ্রাণ মহাপুরুষ তখন কলিকাতায় ছিলেন। ইহাতে তাঁহারও মাথায় বিশেষ বেদনা ও ক্ষত হইয়াছিল। (৩)

ইনি পুরীতে বানরবধ নিবারণ কল্পে শাস্ত্রের প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া একটি বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং কতকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কিছু দিবস গোস্বামী মহাপ্রভুর নিকট বাস করিয়াছিলেন। ১৩০৫ সালের ২১শে ভাদ্র পুরীর সমুদ্রতীরে সাধনা করিতে করিতে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে। কেহ কেহ বলেন, স্বর্গদ্বারের ঘাটে সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া তিনি দেহত্যাগ করেন। স্বামীজীর এইরূপ মৃত্যুতে প্রভুপাদ অত্যন্ত কাতর হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। আর কাহারও মৃত্যুতে তাঁহাকে কখন কাতরতা প্রকাশ বা অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে দেখা যায় নাই। (৪)

শুনা যায়, গোস্বামী প্রভু এই ঘটনার কয়েক দিন পূর্ব্বে শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, যে, তিনি যেন দেখিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে ২।১ জনকে সমুদ্র ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। ঘটনার দিন স্নানের পূর্ব্বে স্বামীজী সমুদ্রতীরে উপবেশন পূর্ব্বক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্যানস্থ ছিলেন। ধ্যানভঙ্গ হইলে তিনি গোস্বামী প্রভুর অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মিত্র মহাশয়ের নিকট কথা-প্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে, তিনি ধ্যানাবস্থায় অন্তরীক্ষে বিশুদ্ধ তানলয়সংযুক্ত অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করিতেছিলেন। তাঁহার দেহান্তে গোস্বামী প্রভু এই ব্যাপার অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"শাস্ত্রে আছে যে মুক্ত পুরুষদিগের মৃত্যুকালে স্বর্গের অপ্সরা বিদ্যাধরীগণ নৃত্য গীত করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। এই ঘটনা আকস্মিক নহে। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে স্বামীজী পরমপদ লাভ করিয়াছেন।" (৫) স্বামীজীর ন্যায় আর

(৩) প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।—শ্রীজগদ্বন্ধু মৈত্র।

(৪) ঐ ঐ ঐ ঐ

(৫) শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সাধনা ও উপদেশ।—শ্রী-অমৃতলাল গুপ্ত।

কোন এতবড় সাধক চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন বলিয়া জানি না। তাঁহার তিরোভাবের পরও গোস্বামীজীউ তাঁহার আত্মার আশ্রমে আগমন জানিতে পারিতেন বলিয়া প্রকাশ আছে। (৬)

এখানে আর একটি যুবকের নাম করিয়া প্রসঙ্গ শেষ করিব। তাঁহার নাম রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি এখনও সাধু সন্ন্যাসী কিছুই নন, কিন্তু ইনি যে পথের পথিক হইয়াছেন, তাহাতে এই স্থানে ভিন্ন ইঁহার কথা বলিবার সুযোগ নাই। এই যুবকের কথা এখনও দেশের অনেকেই জানেন না; কিন্তু ইনি জীবিত থাকিলে এক দিন মাদ্রাজ প্রদেশের চিত্তুর জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ তিরুপতি মন্দিরের মোহান্ত বা অধিকারী হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। সাধুরা ইহাকে বালাজীর মন্দিরও বলিয়া থাকেন। এককালে ইহা চিত্তুরের রাজার দেবালয় ছিল। এক্ষণে রাজা গিয়াছেন, রাজ্য গিয়াছে, এই প্রাচীন সুবিশাল দেবালয়ই রাজ্যের পূর্ব্ব-গৌরবের স্মৃতি-চিহ্নরূপে বিরাজ করিতেছে এবং মোহান্তই রাজার উপাধি বহন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে লোকে মোহান্তরাজ বলিয়া থাকে। এই মন্দিরের আয় বার্ষিক ১৩ লক্ষ টাকা।

রামচন্দ্র অতি দরিদ্রের সন্তান। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কলে একটি সামান্য বেতনের চাকুরী করিয়া, হেলাপুকুর নামক পল্লীতে একখানি পর্ণকুটীরে অতি কষ্টে দিন যাপন করেন। রামচন্দ্র শৈশব কাল হইতেই অতি শান্ত-প্রকৃতি, পাঠাভ্যাসে রত, মাতা-পিতার প্রতি ভক্তিমান ও সত্যবাদী। পিতামাতা ও ভাই ভগ্নীদের নিতান্ত দৈন্যাবস্থা দেখিয়া রামচন্দ্র ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়িয়া, বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ১৪৲ টাকা বেতনে চাকুরী গ্রহণ করেন। তাঁহার পাঠেচ্ছা প্রবল, অথচ দৈন্যবশতঃ পাঠের উপায় নাই দেখিয়া, চন্দন-নগরের নবরত্ন-মন্দিরের সংস্কারক নৃসিংহ বাবাজী নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে বালাজী আশ্রমে লইয়া যান। তাঁহার ধীশক্তি ও সুপ্রকৃতির জন্য তিনি তথায় সকলের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠেন। তথাকার মোহান্তরাজ শ্রীমদ প্রয়াগদাস তাঁহার চারিটি শিষ্যের মধ্যে এক্ষণে তাঁহাকে প্রধান শিষ্য করিয়া তাঁহার সকল ব্যয় ভার গ্রহণ পূর্ব্বক লেখাপড়া শিখাইতেছেন এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে ইঁহাকেই তাঁহার গদি প্রদানের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। রামচন্দ্র এখন বি-এ পড়িতেছেন এবং ছয়টি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছেন। শুনা যায়, তাঁহার জন্মের অব্যবহিত পরেই তাঁহার মুখের উপর দিয়া একটি বিষধর সর্প চলিয়া গিয়াছিল। (৭)

(৬) প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।—শ্রীজগদ্বন্ধু মৈত্র।

(৭) "নবসুজন" ১ম বর্ষ ৪৫শ সংখ্যা হইতে এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ শেঠের নিকট হইতে রামচন্দ্রের সম্বন্ধে অবগত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত সাগরচন্দ্র কুণ্ডু, শ্রীযুক্ত নীলম্বর ঘোষ ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে এই প্রবন্ধোক্ত অন্যান্য মহাত্মাদের বিষয় লিখিতে সাহায্য পাইয়াছি। সে জন্য সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। —লেখক।

সোমনাথের মন্দির

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

হে নীলাম্বুর পদমূলে প্রহরীর মত
এ মন্দিরে ছিলে তুমি আজিও যেমন,
সৌভাগ্য-গৌরবে যবে ছিল সমুন্নত,
লুপ্তপ্রভা শোভাহীন কি দশা এখন।
দেব নাই, দেবালয় রয়েছে পড়িয়া,
ভগ্নচূড়, চূর্ণদেহ, কঙ্কালের সম,
অনুপম কান্তি তব লয়েছে হরিয়া,
আবরিয়া আছে, হায়, কি গভীর তম।
প্রভাতে মঙ্গলশঙ্খ উঠে না বাজিয়া,
মুখরিত নহে আর, ভক্ত-কলরবে;
স্তবস্তুতি, গীতবাদ্য, গিয়াছে থামিয়া;
কত শত বর্ষ শত, কেটেছে নীরবে!
সোণার মন্দির আজ, শ্মশানের প্রায়—
হেরিলে কাহার নাহি বুক ভেঙ্গে যায়!

বাউল্—দাদ্‌রা

কথা ও সুর—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

স্বরলিপি—শ্রীমতী সাহানা দেবী

যদি তোর হৃদ্‌যমুনা হোলরে উছল রে ভোলা,
তবে তুই একূল ওকূল ভাসিয়ে দিয়ে চল্‌রে ভোলা।
আজি তুই ভরা প্রাণে ছুটে যা নৃত্যে গানে
যে আসে প্রেম-প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে চল্‌রে ভোলা।
যে আসে মনের দুখে যে আসে ফুল্ল মুখে
টেনে নেঁ সবায় বুকে (তোর) থাক না চোখে জল্‌রে ভোলা।
দুধারের ফুল কুড়িয়ে চলে যা মন জুড়িয়ে
মালা তোর হ'লে বিফল করবি কি তুই বলরে ভোলা।
মিছে তোর সুখের ডালি মিছে তোর দুখের কালি
দুদিনের কান্না হাসি (সব) ছল ছল ছলরে ভোলা।
জীবনের হাটে আসি বাজা তুই বাজা বাঁশী,
থাক্ সেথা বেচা কেনার দারুণ কোলাহলরে ভোলা।
অরূপের রূপের খেলা চুপ্ করে দেখ্ দুবেলা
কাছে তোর এলে কুরূপ (তুই) মুখ ফিরায়ে চল্‌রে ভোলা॥

[ধা] ৹ + ১ +
II পা | পা পা ৷ | মা ৷ পধা | পা মগা ৷ | ৷ ৷ পা |
য দি তো র্ হৃদ্ - য় মু না - - - হো

৹ + ৹ +
পা পা পমা | পা ধা ধা | ধা ধনা র্সা | ধনা ৷ II
ল রে উ ছ ল্ রে ভো লা - -

{ পা | পা ধা র্সা | র্সা র্সা ৷ | র্সা র্সা ৷ | না র্সা না |
ত বে তু ই এ কূ ল্ ও কূ ল্ ভা সি য়ে

না ধা না | পা ধা ধা | ধা ধনা র্সা | ধনা ৷ | }
দি য়ে - চ ল্ রে ভো লা - -

৹ + ১ +
{ মা | মা মা পা | পা পা ৷ | পা পা ৷ | ৷ ৷ পা |
আ জি তু ই ভ রা - প্রা ণে - - - ছু
জী ব নে র হা টে - আ সি - - - বা

৹ + ৹ + ৹
পা পা ৷ | ধা ৷ র্সা | র্সা না র্সা | ধনা ধনর্সা না | ধা পা ৷ | ৷ ৷ }
টে যা - নৃ ত্যে গা নে - - - - - - - -
জা তুই - বা জা বাঁ শী - - - - - - - -

{ সা | সা রা গা | মা ৷ মা | গা রা ৷ | ৷ ৷ মা |
দু ধা রে র্ ফু ল্ কু ড়ি য়ে - - - চ

মা মা ৷ | গা ৷ মা | গা রা ৷ | (গরা গা) } ৷ ৷
লে যা - ম ন্ জু ড়ি য়ে - - -

৹ + ৹ + ৹
{ পা | ধা ধা ণা | ধা ৷ ণা | ধা র্সণা ধপা | পা পা ধা | পা মা
যে আ সে - প্রে ম্ প্লা ব নে - ভা সি য়ে নি য়ে
মা লা তো র্ হ লে - বি ফ ল ক র্ বি কি তু
থাক্ সে থা - বে চা - কে না দা রু ণ কো লা

+ ৹ +
পা | গমা গা মা | মা পা ৷ | ৷ ৷ }
- চ ল্ রে ভো লা - - -
ই ব ল্ রে ভো লা - - -
- হ ল্ রে ভো লা - - -

৹ + ৹ + ৹
{ পা | পা ধা না | র্সা র্সা ৷ | না ধা ৷ | ৷ ৷ র্সা | র্সা র্সা ৷ |
যে আ সে - ম নে র দু খে - - - যে আ সে
মি ছে তো র সু খে র ডা লি - - - মি ছে তো র
অ রূ পে র রূ পে র খে লা - - - চুপ ক রে -

\+ ০ + + • +
না ন সর্ণা | না ধা া | (নধা না—) } া-া-সর্ণা | র্রা র্রা া | র্রা র্রা র্রা |
ফু - ল্ল মু খে - - - টে নে নে - স বা য়
দু খে র কা লি - - - দু দি নে র কা - ন্না
দে খ্ দু বে লা - - - কা ছে তো র এ লে -

• + ০ + ০
র্রা র্রা সর্রগা | র্রা সর্ণা া | া সা সর্ণা | না া সা | না ধা না |
বু কে - - - - - ও তোর থাক্ - না চো খে -
হা সি - - - - - - তুই ছ - ল্ ছ - ল্
কু রূ - - প্ তুই মু খ্ ফি রা য়ে -

\+
পা ধা ধা | ধা পধা নর্সা | ধনা া ধা |
জ ল্ রে ভো লা - - - "য"
ছ ল্ রে ভো লা - - "য"
চ ল্ রে ভো লা - - - "য"

বরযাত্রী

শ্রীসুনীতি দেবী বি-এ

নরেশের বৈঠকখানায় সেদিন আমাদের আড্ডাটা ভাল করে জম্‌ছিল না। অতুল এক কোণে বসে চোখ বুজে ঘুমোচ্ছিল। তার কাণের কাছেই সুরেনের উদ্দেশ্যহীন তবলার চাঁটি তাকে সজাগ রাখ্‌তে পারছিল না। নরেশ আপন মনে থেকে থেকে শব্দ না করে হার্ম্মোনিয়মটার চাবির ওপর আঙ্গুল বুলিয়ে যাচ্ছিল। আর দু'একজন খবরের কাগজ নিয়ে মগ্ন ছিল। আমি চুপ করে থাক্‌তে না পেরে বল্‌লাম,—বড় চা-তেষ্টা পেয়েছে নরেশ!—নরেশ তখন নিজের জায়গায় বসে বসেই হাঁক দিল—ওরে ও জগা—। জগা তার উত্তরে কল্পতরুর মত তখনই চায়ের পেয়ালাগুলি ট্রের ওপর সাজিয়ে নিয়ে এসে ঘরে ঢুক্‌ল।

অতুলের ঘুমটুম অমনি ছুটে গেল। সে তড়াক করে সোজা হয়ে বসে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে চুমুক দিতে আরম্ভ করে দিল। চা খাওয়া শেষ হলে সুরেন বলে উঠ্‌ল—ওহে নরেশ, সেই 'কালবৈশাখী' গানটা গাও না। সেদিন বেশ লেগেছিল সুরটা। নরেশ সুর টিপে ধরতেই অতুল বল্‌ল—রাখ তোমার কালবৈশাখী। ঘরে বসে পা ছড়িয়ে অমন কালবৈশাখী গান ঢের গাওয়াও যায়, শোনাও যায়। একবার তার হাতে আমার মত যদি পড়তে ত বুঝ্‌তে মজাটা।

নরেশ বল্‌ল—শুনি ব্যাপারটা। গান থাক্। গল্পটাই চলুক।—বলে সে হার্ম্মোনিয়ম ছেড়ে উঠে পড়ল।

অতুল যেখানে বক্তা, সেখানে জমে উঠতে দেরি লাগে না। বাঙ্গালীর আসল গুণ বক্তৃতা দেওয়া—তা থেকে বিধাতা অতুলকে বঞ্চিত করেন নি।

সে আরম্ভ করল—বাবা সেবারে দারজিলিংএ বদ্‌লি হয়েছিলেন। সেখানেই আমরা সবাই ছিলাম। আমার মামাতো ভাই কিশোরী আমাদের কাছে ছিল।

নরেশ বল্‌ল—ও, সেই তালপাতার সেপাই?

অতুল বল্‌লে,—হাঁ, আমরা তাকে তালপাতার সেপাই বলেই ডাক্‌তাম বটে।—তারপর শোন না মজাটা।

কিশোরীর বাবা পাবনায় থাক্‌তেন, তিনি লিখে পাঠালেন, যে, কিশোরীর বিয়ের ঠিক্ হয়ে গেছে, অবিলম্বে সে যেন বাড়ী ফেরে। বিয়ের নামে কিশোরী মহা খুসী হয়ে উঠ্‌ল। সে চিরকালই বিয়ে-পাগ্‌লা কি না!

বলেই অতুল একচোট হেসে নিল।—এখন কিশোরীর কিন্তু একলা যেতে ঘোর আপত্তি। আমায় ধরে পড়ল—বরযাত্রী যেতে হবে। আমি কি আর করি, বাবার অনুমতি নিতে যাওয়ার ঠিক্ করে ফেল্‌লাম।

সুরেন বল্‌ল—বরযাত্রী যেতে তুমি রাজি হলে,—আশ্চর্য্য ত! সেবারে বীরুর বিয়েতে কিছুতে গেলে না। মোটে কলকাতা থেকে ব্যারাকপুর—সেই গেলে না। আর দার্জিলিং থেকে পাবনা!

অতুল বল্‌ল—আরে কেন যাই না—বোঝ না। সেই একবারে যা শিক্ষা হয়ে গেছে—তার পর থেকে গঙ্গাযাত্রী হতে রাজি আছি, কিন্তু বরযাত্রী?—ওরে বাস্‌রে—সে আর এ জন্মে অন্ততঃ নয়।

যাক্, তার পর কি হল তাই শোন।

যেদিন রওনা হলাম, সেদিন মামাবাবুর চিঠির আদেশ মত, দারজিলিংএর মাখন কিছু নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। গালিয়ে বিয়ে বাড়ীর ভোজের ঘি তৈরী করা হবে।

পোড়াদায় ট্রেণ না থাম্‌তেই, কিশোরী মাখনের হাঁড়ি হাতে দাঁড়িয়ে হাঁকডাক আরম্ভ করল—শীগ্‌গীর নেমে পড়, নইলে অন্য গাড়ী ধরতে পারবে না ইত্যাদি। ট্রেণ থামবার আগেই সে এমন হুড়মুড় করে নেমে পড়ল যে, হাত থেকে মাখনের হাঁড়ি পড়ে ভেঙ্গে গিয়ে প্লাটফর্ম্মে গড়াগড়ি! সে কি দৃশ্য! আমি, যেটুকু শক্ত মাখন ওঠাতে পারি, তার চেষ্টা করতেই, কিশোরী হাত ধরে আমায় টেনে নিয়ে অন্য ট্রেণে বসিয়ে বল্‌ল—কর কি, এখনই গাড়ী ছেড়ে দেবে যে। আমি হেসে বল্‌লাম—এমন বিয়ের তাড়া ত মানুষের দেখি নি বাপু। আর গাড়ীশুদ্ধ লোক হেসে উঠল। গাড়ী ঢের দেরিতে ছাড়্‌ল, তবু আমি একবারও নাম্‌বার অনুমতি পেলাম না। কিশোরী আমায় আঁকড়ে ধরে বসে রইল।

কুষ্টিয়া পৌঁছে হোটেলওয়ালাদের হাতে পড়ে যা অবস্থা হল, শ্রীধামের পাণ্ডাদের হাতে পড়লে বোধ হয় তার চেয়ে কিছু খারাপ হত না। কোনমতে দুটি ভাত-ডাল নাকে মুখে গুঁজে গড়াই নদীতে সুন্দরী ষ্টীমারের আশ্রয় নেওয়া গেল।

এইবারে যা হল, তা আর কি বল্‌ব ভাই। একেবারে বাঁচতে বাঁচতে মরে গেলাম।

আমরা হো হো করে হেসে বল্‌লাম—বাঁচতে বাঁচতে মরা আবার কি রকম? মরতে মরতে বেঁচে গেছ বল!—

অতুল বল্‌ল—ও একই কথা। অমন করে ভুল ধরলে কি গল্প বলা হয়?

আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্‌লাম—আচ্ছা, আর আমরা বাধা দেব না, তুমি বল।

অতুল আর এক পেয়ালা চায়ের ফরমাস করে আরম্ভ করল—

বিকেল বেলা কালবৈশাখী আরম্ভ হল। কবির গানের নয়, একেবারে সত্যিকারের—ভয়ঙ্কর। সে কি বাতাসের গর্জ্জন, আর ঢেউয়ের কি উদ্দাম উচ্ছ্বাস! সেই উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়িতে 'সুন্দরী' ত দুল্‌তে আরম্ভ করল। মেয়েদের বস্‌বার জায়গাটা মোটা ক্যানভাসে ঘেরা ছিল, সেখান থেকে আর্ত্তনাদ উঠ্‌তে লাগ্‌ল। তবু মেয়েরা তার ভিতরে বসেই কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, বাইরে বেরুলেন না। ষ্টীমার উল্টে পড়ে পড়ে,—তখন আমার মনে হল,—মেয়েদের ঘেরাও করা বস্‌বার জায়গায় বাতাস আটকাচ্ছে বলেই ষ্টীমারের এমন দশা। তখনই লাফিয়ে পড়ে দুহাতে টেনে টেনে ক্যানভাস ছিঁড়তে লাগ্‌লাম, যেই ছেঁড়া শেষ হল, বাতাস খেল্‌বার জায়গা পেল, অমনি ষ্টিমারেরও দোলা বন্ধ হল। ভাবলাম, কাপ্তেন সাহেব বুঝি বা চটে গেছেন,—যাক ভাগ্যক্রমে তিনি খুসী হয়ে আমায় ধন্যবাদই দিলেন।

প্রাণে বেঁচে বাজিৎপুর ষ্টেসন ঘাটে পৌছান গেল। পাবনায় দেখি, বরের ভাই নিতে এসেছে। কিশোরী আমার কাণে কাণে বল্‌ল—ভায়াকে জিজ্ঞেস্ করো ত, মেয়ে সুন্দরী কি না, আর লেখাপড়া জানে কি না। আমি বল্‌লাম—তুমি ত রূপে কন্দর্পকে হার মানিয়েছ,—আর তবু যদি না ম্যাট্রিক ফেল করতে। তোমার আবার এসবের খোঁজ কেন? কোন্ রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী তোমাকে

বরমাল্য দেবেন বল ? কিশোরী চটে গিয়ে বল্ল—তোমার বক্তৃতা শুনবার জন্য সঙ্গে আনি নি হে। জিগেস্ করবে ত কর নইলে নেই !

আমি মুচ্‌কে হেসে বিনোদকে কিশোরীর প্রশ্নটা বল্লাম। সে বল্ল—আর বল কেন অতুলদাদা ! বাবাকে কি করে যে রাজি করেছে, জানি না। দেখ্‌তে দাদার চেয়েও সরেস। আর লেখাপড়া ? তার 'ক' অক্ষর গোমাংস।

আমি এহেন সংবাদ কিশোরীকে কি করে দিই। শেষে ভেবে চিন্তে বল্লাম—দেখ্‌তে সে গেরস্তর ঘরের মেয়েদেরই মত,—ডানাকাটা পরী আর কোথা পাওয়া যাবে বল ? লেখাপড়া তুমি বরং শিখিয়ে নিও। পাড়াগাঁয়ে বেচারীর শিখবার সুযোগ হয় নি, কিন্তু বেশ বুদ্ধিমতী শুনছি।

কিশোরী তাদের গ্রামে চলে গেল। আমি পাবনায় আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে রইলাম। কিশোরীকে জিজ্ঞেস করে নিলাম, তারা কবে কোন ষ্টীমারে রওনা হবে। পাবনায় ছুটি বন্ধুকে রাজি করালাম—আমার সঙ্গে বরযাত্রী যেতে।

ঠিক্ দিনে বাজিৎপুর ষ্টেসন ঘাটে গিয়ে কিশোরীদের কাউকে দেখ্‌লাম না। শুন্‌লাম একটা ষ্টীমার আগের দিন ছেড়েছে। বোধ হয় তাতেই বর চলে গেছে, তার যে রকম তাড়া ! এই মনে করে আমরা তিনজন রোহিণী ষ্টীমারে উঠে পড়লাম। ষ্টীমারটা ছাতুখোরে ভরা,—একজন মাত্র বাঙ্গালী ডাক্তারকে পেয়ে যা হোক একটু খুসী হলাম।

বরযাত্রী হয়ে যাব, বরের মত আদর-যত্নে—তা না, নিজের ট্যাঁকের পয়সা খরচ করে ডেক্‌-প্যাসেঞ্জার হয়ে চল্‌লাম। বন্ধুর বাড়ীতে পাবনায় ভাল করে খাওয়াও হয়নি। ষ্টীমারে উঠে মেঠাইমোণ্ডার লোভে পেটে জায়গা রেখেছিলাম। যেই ক্ষিদে পেল, অমনি তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগ্‌লাম। সারা ষ্টীমার খুঁজে ছাতু ছাড়া আর কিছু কিন্‌তে পেলাম না,—আর পেলাম একটি আম। তাও একজন যাত্রী দয়া করে আমাদের দিয়েছিল। আমটি রেখে দিয়ে, ছাতুটুকু খেতে খেতে বিকেল হয়ে গেল।

আর কোথায় যায় ! আবার সেই কাল-বৈশাখীর ঝড় উঠ্‌ল। হঠাৎ চেঁচামেচি শুন্‌লাম, ষ্টীমারের কি একটা ভেঙ্গে গেছে। শুনেই ত আত্মারাম ভয়ে কাঠ ! ষ্টীমার নোঙ্গর করে মেরামত চল্‌তে লাগ্‌ল, আর এদিকে ঝড়ের গর্জ্জন, বৃষ্টির ঝাঁট সহ্য করে আমরা চোখ বুজে ধ্যানস্থ রইলাম।

ঝড় শেষে থাম্‌ল, আর মেরামতও শেষ হল। তখন শুনি ষ্টীমার দামুকদিয়ায় যাবে না, সারাঘাটে থাকবে। ওমা, তবে কি পদ্মা সাঁতরে পার হব না কি ?

যাক্, ভগবান কথা বল্‌বার শক্তি দিয়েছেন বলেই রক্ষে। খুব মিষ্টবাক্যে সারেংদের তুষ্ট করে বেশ ভাব জমিয়ে ফেল্‌লাম। তারা শেষে বল্‌ল, আচ্ছা, সারাঘাটে যাত্রী নামিয়ে দিয়ে আমাদের ওপারে পৌঁছে দেবে।

সারাঘাটে নেমে দৌড়ে টাকা দুয়েকের লুচি রসগোল্লা কিনে ষ্টীমারে উঠে পড়লাম। প্রচণ্ড ক্ষিদে, হাউমাউ করে তিনজন খেতে আরম্ভ করেই দেখি, লুচিতে বিকট নারকেল তেলের গন্ধ। সব ফেলে দিতে হল, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেও জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছা করছিল।

নরেশ বল্‌ল,—তা আর ইচ্ছা করবে না। খাওয়াটাই হল তোমার জীবনের সার। সেটার অভাবে জলে কি আগুনে ঝাঁপ দেওয়া বিচিত্র কি ?

সুরেন বল্‌ল—এই নরেশ থাম ! অতুল আবার চটে মটে গল্প বন্ধ করবে।

অতুল খুব উৎসাহের সঙ্গে আবার আরম্ভ করল।—দামুকদিয়াতে নেমে রাত্রে শুই কোথায়, এই হল ভাবনা। দেখি কতকগুলো গাড়ী লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফাষ্ট আর সেকেণ্ড ক্লাস চাবি বন্ধ। থার্ডক্লাসে উঠে শুয়ে পড়লাম। বন্ধুরা আমাকে খুব গালাগাল করতে লাগ্‌ল যে, আমার বুদ্ধিতে পড়ে—বরযাত্রী হয়ে নাকাল হতে হচ্ছে। আমিও মনে মনে এবং কখনও প্রকাশ্যে কিশোরীর মুণ্ডপাত করতে লাগ্‌লাম।

ছারপোকার কামড়ে সারারাত ছট্‌ফট্ করে সকালবেলা সবে চোখ বুজে এসেছে, এমন সময় মনে হল ট্রেণ চল্‌ছে। ওরে ওঠ্ ওঠ্ বলে ঠেলা দিয়ে বন্ধুদের তুল্‌লাম। তখন আর কি হবে। টিকিট কেনা হয়নি কিচ্ছু না,—আর চললামই বা কোথায়। শেষে শুনি সান্টিং হচ্ছে। বাবা, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আবার দামুকদিয়াতে গাড়ী থামতেই, নেমে পড়ে ঠিক গাড়ীতে উঠলাম। তখন ক্ষিদের চোটে সেই আমটি বার করে খেতে গিয়ে দেখি বিষম টক্। কপাল চাপড়ে বসে রইলাম।

ভেড়ামারায় পৌঁছে দেখি, কাকস্য পরিবেদনা ! বর কি বরের তিনকুলের কারও টিকি দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ এক কালো জোয়ানমদ্দ—ইয়া লাঠি কাঁধে, সাম্‌নে এসে দাঁড়াল।—মারবে না কি—বলে এক বন্ধু লাফ দিয়ে সরে গেলেন। সে দাঁত ক'পাটি বার করে পাবনা জেলার মধুর বাঙ্গাল ভাষায় বল্‌ল, সে আমাদের প্রত্যুদ্গমন করবার জন্য রয়েছে। তার ভাষা শুনে বুঝলাম, নিশ্চয়ই কিশোরীদের বাড়ীর চাকর। ভরসা করে তার সঙ্গে গিয়ে একটা মোষের গাড়ীতে চড়লাম।

কনের বাড়ী পৌঁছে বরকে খানিক উত্তম মধ্যম দেওয়া গেল। সে তখন আসন্ন বিয়ের কল্পনায় সব মার বেমালুম হজম করে ফেল্‌ল।

পরদিন সকালে খেতে বসে আমরা তিনজনে নিজেদের খাওয়া শেষ হতেই উঠে পড়লাম। অমনি কন্যাপক্ষের লোকেরা চটে লাল। একজন বৃদ্ধ বল্‌লেন—কি রকম অসভ্য ছোকরা সব। সামাজিক খাওয়াতে সবাইকে ফেলে উঠে পড়ল !

আমরা যেন কিছুই জানি না, এই ভাবে চুপ করে রইলাম। আর মনে মনে কন্যাপক্ষকে জব্দ করার ফন্দি আঁটতে লাগ্‌লাম।

পরদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় উঠানে জায়গা হল। চারদিকে আটচালা, একদিকে ছায়া, অন্যদিকে রোদ। আমরা তিনজন চট্ করে ছায়ার দিকে বসে পড়লাম। তার পর খাওয়া চল্‌ল। সকলের শেষ হয়ে গেল, আমাদের আর কিছুতে শেষ হয় না। বস্‌বার সময় যাতে সবাই শুন্‌তে পায়, এমনি করে বলে নিয়েছিলাম—সামাজিক খাওয়া মনে থাকে যেন, সব্বাইকার খাওয়া শেষ না হলে কেউ উঠ্‌তে পাবে না।

চড়চড়ে রোদে বুড়োদের টাক যখন ফেটে পড়বার যোগাড় হল,—হাত শুকিয়ে চট্‌চট্ করতে লাগ্‌ল, রাগে মুখগুলো কাল-বোশেখীর মেঘের চেয়েও গুরুগম্ভীর হয়ে উঠ্‌ল,—তখন খাওয়া শেষ করে উঠ্‌লাম।

সন্ধ্যাবেলা আবার আমাদের দুষ্টুমি চল্‌ল। একটা ঢোল জোগাড় করে এনে একজন বাজাতে লাগ্‌ল, আর একজন তার সঙ্গে করতাল জুড়ে দিল। আর আমি আরম্ভ করলাম গান।

—সে কি ! বলে আমরা সমস্বরে হেসে উঠ্‌লাম।

অতুল বল্‌ল—বুঝতেই পারছ তাহলে ব্যাপারটা—আমার এই রাসভবিনিন্দিত কণ্ঠের সঙ্গে ঢোল ও করতালের আওয়াজ মিলে কি রকম মধুর রাগিণী উঠ্‌তে লাগ্‌ল ! অনেক রাত পর্য্যন্ত এমনি চালালাম। তখন কন্যাপক্ষের লোকেরা চটে গিয়ে লেঠেল ডাকিয়ে আমাদের মারবে বলে শাসাল। আমরাও আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে গেলাম। যাহোক, বয়োবৃদ্ধ কয়েকজন এসে থামিয়ে দিলেন,—নয় ত সেদিন কি হ'ত—বলা যায় না।

তার পর দিন বিয়ের পর কিশোরী যদিও হাঁড়িমুখ করে রইল (বোধ হয় কনে দেখে)—আমরা খুব উৎসাহে ফেরবার জোগাড় করতে লাগ্‌লাম। গাড়োয়ানের আস্‌তে দেরি দেখে, নিজেরাই গরুর লেজ মলে গাড়ী ছুটিয়ে ষ্টেসনে উপস্থিত। কন্যাপক্ষের কয়েকটি ছেলে তাই দেখে 'বোম্বেটে' প্রভৃতি বিশেষণে আমাদের আপ্যায়িত করে দিলে।

এবারে কিশোরীদের গ্রামে যেতে হল। সেখানে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে দেখা গেল যে, যে ব্যাণ্ডের দলকে আগাম টাকা দেওয়া হয়েছিল, তারা এল না।—কি হল, কি হল—করে' মামাবাবু ছুটোছুটি করতে লাগ্‌লেন দেখে, আমি বল্‌লাম যে, আমি গিয়ে ব্যাণ্ডের দল ডেকে আন্‌ব।

দোগাছিতে শুধু মুচি ডোমের বাস,—তারাই ব্যাণ্ড বাজায়। এ গ্রাম থেকে দোগাছি না কি দুক্রোশ রাস্তা। হাঁট্‌তে আরম্ভ করে দেখি, পথ আর ফুরোয় না। শেষে আমার সঙ্গীটি বল্‌ল—দুক্রোশ নয়, চারক্রোশ পথ ! রাত দুটোয় যখন সে গ্রামে পৌছিলাম, তখন পথের ধূলো কাদাতে আমাদের চেহারা মুচিডোমের চেয়ে কিছুমাত্র ভাল বলে বোধ হল না।

অনেক হাঁকাহাঁকিতেও কারও সাড়া পাওয়া গেল না দেখে, একটা কুঁড়েঘরের দরজা ধাক্কা দিয়ে ভেঙ্গে ফেলবার জোগাড় করলাম। তখন একটি মেয়েমানুষ ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে বাইরে এল। তাকে জিজ্ঞেস্ করে জান্‌লাম যে, ব্যাণ্ডের দল অন্য গ্রামে বাজাতে চলে গেছে।

খুব চটেমটে, আবার সেই চারক্রোশ পথ পেরিয়ে, ভোর বেলা এসে মামাবাড়ী পৌছিলাম।

এত কাণ্ড করেও ব্যাণ্ড বাজল না, তখন আমাদের আরও রোখ চেপে গেল। বল্‌লাম, পাবনা সহরে বর নিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে তবে ছাড়ব।

পুলিসের অনুমতি নিতে গেলাম। তারা কিছুতেই রাজি হয় না। ক'দিন আগে—আমাদের এক অতিবৃদ্ধ আত্মীয় পঞ্চম পক্ষে বিয়ে করেছিলেন,—তাঁর কথা তুলে দারোগাবাবু রসিকতা করে বল্‌লেন,—রাইচরণ বাবুর বিয়ের শোভাযাত্রা হলে বরং অনুমতি দেওয়া যেত। সে একটা দ্রষ্টব্য জিনিস দেখে সহরের লোকের উপকার হত!

ঠাট্টাতেও না দমে আমরা নাছোড়বান্দা হয়ে অনুমতি নিলাম। তার পর ধূমধাম করে ব্যাণ্ড বাজিয়ে বর নিয়ে সহর ঘুরলাম।

তার পর দিনই সটাং বাড়ী মুখো রওনা হলাম,—কেন না, হঠাৎ শোনা গেল যে, সহরে বেজায় কলেরা হচ্ছে।

এ রকম অভিজ্ঞতার পর আর কেউ কি দ্বিতীয়বার বরযাত্রী হতে চায়? তোমরাই বল!

আমরা সবাই অতুলের কথায় সায় দিলাম। অতুলের জন্য আর এক পেয়ালা চায়ের ফরমাস হল। আমরাও বাদ গেলাম না।

অতুলকে তার গল্পের জন্য ও সন্ধ্যাটা ভাল ভাবে কাটিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে সভাভঙ্গ করা হল।

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২২)

মন্দির-প্রাঙ্গণের দ্বিতীয় দ্বারটি দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। দেখি, সেই দীর্ঘছন্দ গৌরবর্ণ পাণ্ডাজি আর সেই লড়ায়ে যুবকটি, বাবাকে দর্শনান্তে বাহিরে আসিয়াছেন। পাণ্ডাঠাকুর বলিতেছেন—"তীর্থক্ষেত্রে কিছু 'তেয়াগ্' করতে হয়, তাতেই তীর্থের যথার্থ ফল লাভ হয়,—সেইটাই 'প্রতক্‌ষ্' (প্রত্যক্ষ) লাভ। সেবকদের বা গরীব দুঃখীদের দু'এক পয়সা দেওয়াই ভাল; তার সার্থকতা হাতে হাতে। যুবা বিজ্ঞ বুঝদারের মত বলিল—"পয়সা না দিলে তীর্থের ফল হয় না, এ কথা পাড়াগেঁয়ে ভূতেদের বোঝানো সহজ,—আমরা ক্যাল্‌ক্যাটার ছেলে, বুঝেছ পাণ্ডাজি!"

পাণ্ডাজি হাসিমুখে বলিলেন—"এটা বুঝা একটু কঠিন আছে বাবুজি! হাওড়া টিসনে যিনি টিকস্ কোরে পশ্চিমে রওনা হন, তাঁকেই বলতে শুনি—"কলকাত্তা" ঘর আছে! কিন্তু খাতা বগলে ক'রে যখনি যজমানদের খবর নিতে গিছি—কলকাত্তায় বাসাড়ে কেরাণী বাবু ছাড়া কারুর পাত্তা পাইনি; তিরিশ মিল্, ষাট মিল্ মাঠ ভেঙ্গে, কাদা ঘেঁটে, সাঁতার দিয়ে, ঘরের সাক্ষাৎ মিলেছে বাবুজি।"

যুবক সে কথায় কাণ না দিয়া বলিয়া চলিল—"বামুনদের ও সব ব'সে ব'সে পরের মুণ্ডে পেট চালাবার ফন্দি; আমরা "গড়-পারের" ছেলে,—ও সব চাল্ এখানে খাটবেনা;—দিতে হয় অন্ধ-খঞ্জকে দেব।"

পাণ্ডাঠাকুর পূর্ব্ববৎ হাসিমাখা মুখে বলিলেন,—"ও উপদেশটা বুঝি আপনাদের ইংরাজি কিতাবে আছে! বামুনদের শাস্ত্রেও ত' তাদের দিতে বিশেষ কোনো বারণ নেই বাবুজি,—তাই দিননা। দেওয়ার একটা আনন্দ আছে—সেটা প্রাণ অনুভব করে, সেইটাকেই প্রতক্‌ষ্ লাভ বলছিলুম। দান, প্রেম, কি ভালবাসায় অতো বিচার আনতে নেই, তাতে তাদের অপমান কোরে মলিন করা হয়। প্রেমের দরবারে কাটগড়া নেই বাবুজি। আর—দান করা মানে ত' উপকার করা নয়, ওতে যদি কারুর উপকার থাকে তো সেটা দাতার নিজের।"

আমি অবাক হইয়া শুনিতেছিলাম; এখন সবিস্ময়ে পাণ্ডাজিকে দেখিতে লাগিলাম। এ'তো মামুলি পাণ্ডা নয়! যুবক বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল—"এ যুগমে বামুনদের ও সব কথায় 'ভবি' ভুলতা নেই!"

কলকেতার ছেলে যে কথাবার্ত্তায় এমন অসভ্য হইতে পারে, এটা ভাবিতেও আমার লজ্জাবোধ হইতেছিল।

পাণ্ডাঠাকুর পুনরায় সহাস্যেই বলিলেন—"'ভবিকে চিরকালই বামুনদের কথায় ভুলতে হবে বাবুজি। ব্রাহ্মণ আপনি কা'কে বলেন? ব্রাহ্মণকে একটা আলাদা জাত ভেবে ভুল করবেননা, ওটা মানুষের একটা অবস্থা। সকল জাতের ভিতরই ব্রাহ্মণ আছেন। দেশ কাল অনুসারে সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান আর বিদ্যাদান করাই তাঁদের কাজ,—সকলের মঙ্গলই তাঁদের কাম্য। তাঁরা চিরদিনই থাকবেন। আজকাল তো বহুৎ প্রাচীন জিনিস বেরুচ্ছে, কই বাবুজি অতগুলা মনু কি ব্যাস পরাশরের মধ্যে কারো অট্টালিকার এক টুকরা ইট পাওয়া গেছে কি, না তাঁদের চৌঘুড়ির ঢাকা বিল্বগ্রামের বুক চিরে লাঙ্গলের মুখে বেরিয়ে পড়েছে! ত্যাগই যাঁদের ধর্ম্ম, পর্ণ কুটীরে বাস আর ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ—তাঁদের উপর ওরূপ বিদ্রূপ করতে নেই বাবুজি। আপনার কাছ থেকে কেউ তো কিছু কেড়ে নিচ্চেনা।"

এসব কথা পাথরকে শোনান হইতেছিল বলিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইতেছিল।

কথাটা কিন্তু আর শোনা হইল না; কোথা হইতে মাতুল ব্যস্তভাবে ঝড়ের মত আসিয়া উপস্থিত! শুনিলাম, তাঁর বৈবাহিক মহাশয় (অমর বাবু) "গত রাত্রে চিঁড়ে চিনি রাবড়ী আর রম্ভার একটি বিরাট তাগাড় মারিয়া তেউড়ে 'হরেকরকম্ব' দাঁড়াইয়া গিয়াছেন, নিরেট হইয়া পড়িয়াছেন;—পেট যেন কচ্ছপের পিট—কোথাও একটু কোঁচ নাই, টিপিলে নোয়না,—একদম আধখানা সুডৌল ভূগোল-পরিচয়! চিৎ হইলে চড়্‌চড় করে, উপুড় হইলে চাপে চক্ষু বাহিরে আসিতে চায়, কাৎ হইলেই ব্যতীপাৎ! সকাল হইতে উবু হইয়া বসিয়া নাগাড় সোডা আর গুড়ুক চালাইতেছেন,—যেন কাটের জগন্নাথ!" একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন—"আমার তো মশাই হাত পা আসছেনা; যে-সে কুটুম্ব নয়,—বৈবাহিক, আবার শুধু বৈবাহিক নয়—লাট্ বৈবাহিক—জামায়ের বাপ! তায় মালদার,—এ দেনদারের বাড়ী এ কি ফ্যাশাদ মশাই! এক তো প্রথম নম্বর—পরিবারের মাথা নিয়ে বুকের মধ্যে কাঁথা শেলাই চলেছে, তার ওপর আবার 'দ্বিতীয়ে চ' উপস্থিত বৈবাহিকের পেট্!"

আমি বাস্তবিকই চিন্তিত হইয়া পড়িতেছিলাম। বৈবাহিকের রোগ বর্ণনার রুদ্র "রেটরিকের" প্রচণ্ড ঘূর্ণীর মধ্যে হাঁ করিবার ফাঁক্ ছিলনা। মাতুল যে "বার্কের" বাবা, এই তার প্রথম পরিচয় পাইলাম। এই সঙ্কট অবস্থায় সহসা 'বসন্তের হাওয়ার মত'—'বৈবাহিকের পেট্' উপস্থিত হওয়ায়, সামলাইয়া গেলাম; বলিলাম—"ভয় নেই মাতুল। ও আমি বিশ্বাস করিনা; আপনাকে আঁতুড় বাঁধতে হবেনা,—গিয়ে দেখবেন সামলে গেছেন, কিন্তু এ বেলা যেন জলস্পর্শ না করেন।"

মাতুল বলিলেন—"না—তা করবেননা বলেছেন,—কেবল ফল-স্পর্শ করবেন, তাই পেঁপের তল্লাসে ছুটেছি। বাজারে তার চিহ্নমাত্র নেই, শুনলুম—পড়তে পায়না, বাবুরা লুফে নেন্। 'এটা যত অজীর্ণ রোগীর আড়ৎ কি না,—মেয়ে মদ্দের চোঁয়া-ঢেঁকুর চলেছে,—পেঁপের পায়াও বেড়ে চলেছে। আর হবেনাই বা কেন,—চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখি—Birds of Paradiseদের পেঁপে ছাড়িয়ে ডিসে ক'রে দেওয়া হয়েছে! এখানকার শুভ-আগমনকারীদের মধ্যেও অনেকেই Birds of Paradise তো;—কি বলেন?"

আমি চুপ করিয়া থাকায় মাতুল নিজেই বলিয়া চলিলেন—"বলবেন আর কি,—পূর্ব্বজন্মের স্ক্যাভেঞ্জারভরা ভাইস্ নিয়ে আমাদের মত' পাইসহীন রাইস্-হীন birds of "হেলেডাইস্" যে কেন মরতে আসে তা বলতে পারিনা। বাড়ীতে যে-ই দুর্ম্মুস্ হ'য়ে বসলেন, বাইরে একটা পেঁপের জন্যে আমি ক্ষেপে যাবার দাখিল হলুম, ঘুরে ঘুরে পায়ের ডিমগুলো গুঁড়িয়ে গুরখা মেরে গেল;—সাত টাকা দামের নতুন জুতা জোড়াটা ধুলো মেখে যেন ভেড়ার বাচ্চা হয়ে দাঁড়ালো! চুলোয় যাক্ শালা "খ্যাংফুং" (চীনে মুচী),—আর তারই বা দোষ কি, এ কি রাস্তা মশাই—যেন খরশান্,—বেরুলেই এক পুরু

TIGHT BINDING

নিয়ে নিচ্চে! যদি খালি পায় হাঁটি তো জ্যান্তো চামড়া নেয়,—এখন করি কি বলুন! আবার বাড়ীতে বলেন—"সব দিকে নজর রাখতে হয়।" আরে শ্বশুরকা-বেটী, জুতোর তলায় নজর দি কি ক'রে! রাস্তা যদি গোরস্থান হ'ত, আর আমি যদি একখানি প্যাঁচামুখো চশমা পরে গোরে যেতুম—

আমি মাতুলের সম্বন্ধে ভীত হইয়া পড়িতেছিলাম,—তাঁর এলোমেলো কথাগুলি ছুঁতো-বাজির মত এদিক ওদিক ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়াছিল। সেটাকে প্রসঙ্গান্তরে মোড় ফিরাইয়া দিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম—"প্যাঁচা-মুখো চশমাটা আবার কি মাতুল?" মাতুল উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"ছাখেন নি, ঐ যে যা চোখে দিলে ছেলেদের অমন সুন্দর মুখগুলো কি কদাকারই দেখায়, শিশুরা বাপকে দেখে ভয়ে চীৎকার করে মার কাছে ছোটে! প্রথম দর্শনে মনে হয়েছিল—যশোরের কারখানার নূতন আবিষ্কার, ছোট ছোট মেয়েদের মাথার বাঁক্-চিরুণী! ভাইপো লাবণ্যময়ের কাছে শুনলুম—চশ্‌মা! বল্‌লেন—"ভারি সুন্দর জিনিস—এই নতুন আমদানী হয়েছে, পরলে আরামও যেমনি, উপকারও তেমনি,—মেট্যালের মত তাতেনা, নাক কি কাণ ঝল্‌সে যাবার বা ফোশ্‌কা পড়ে দাগী হবার সম্ভাবনা একদম্ নেই। কত-বড় সব মাথা এর পেছনে রয়েছে!" ভাবলুম—তা রয়েছে বই কি—আমাদের গ্রহগুলো কি শুধু আকাশেই ঘোরে! বললুম—"কাটামোটা কিসের বাবাজি?" বললেন—"ওটা রোল্‌গোল্ডের ওপর গটা-পার্চা হবে—ভেতরে সোণার ফ্রেম্ থাকে।" "ওঃ—গোকুল পিটে বলো,—রোল্ গোল্ডের গেলাপ্ বললেই হ'ত!" সেদিন সারা বিকেলটা গুড়ুক খেয়েছি আর ভেবেছি—উঃ এখনো ঝাড়া দু'শো বচর!! আসছে বচর ওইতেই চারটি লোম লাগিয়ে আন্‌বে, বাবাজীরাও পাল্লা দিয়ে পরবেন। ঐ গটাপার্চা আরো কটা বাচ্চা ছাড়বে তা ভগবানই জানেন। গয়না-গুলো কবে ঐ পোষাকটা পচন্দ করবে! বেঁচে থাক্‌তে সে সুদিন কি আসবে মশাই!"

আমার দুর্ভাবনা ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল, মাতুলের মাথায় আজ কোন্ সরস্বতী ভর করিয়াছিলেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলামনা;—তাঁহার মুখে আজ যে-কোন কথা মহাকাব্য হইয়া বাহিরে আসিতেছিল,—পাথর মাত্রেই আজ হিমালয়!—আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—"কিচ্ছু ভাববেননা মাতুল,—সুদিনটে যখন পশ্চিম থেকে ঝুঁকেছে—সে হুড়মুড় ক'রে এলো বলে। জানেন ত' অমোঘা পশ্চিমে মেঘা!"

শুনিয়া মাতুল বলিলেন—"পায়ের ধুলো দিন মশাই—তাই আসুক। কি বল্‌ব দেব্‌তা—এক ভিখোলিয়ার লুট লিয়া! আমরা হলুম ফতুর—ফিঙে বায়ু পরিবর্ত্তন কি—

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলাম—"তা'তে বটেই, পৈত্রিক পয়সা উপরি উপায় না থাকলে কি আর বায়ু পরিবর্ত্তনের ঢেউ ওঠে;—আমাদের সনাতন ব্যবস্থা মত' নিজের ঘরে শুয়ে আয়ু বর্জ্জনই বিধি। ওসব ফালতু পয়সার ফুট্—

মাতুল 'কিন্তু' হইয়া বিমর্ষ ভাবে বলিলেন—"জীবনে এই আমার প্রথম ভুল মশাই। ধর্ম্মের ঘরে পাপ সয় না; বালা জোড়াটা তো জন্মের মত গেলই, এখন বেইমশাই দয়া করে হারছড়াটা ছেড়ে দিলে যে হরিলুট দিয়ে বাঁচি!" এই কথা কয়টি তিনি ছোট অথচ সার্থক একটি নিশ্বাসের সহিত শেষ করিলেন। বুঝিলাম এতক্ষণে মাতুল ধাতে নামিয়াছেন।

আমি তাঁহার কথা শুনিয়া ও অবস্থা ভাবিয়া সত্যই ব্যথা পাইলাম। আশ্বাস দিয়া বলিলাম—"মাঝে মাঝে অমরের ও-রকম হয়ে থাকে, ওতে ভাবের কারণ কিছু নেই। ডাক্তার বদ্দি ডাকা তাঁর অভ্যাস নেই, আপনাকেও ডাকতে দেবেননা। চারটি জোনে-মুদে একটোঁক জলের সঙ্গে খেতে দিলে, তিনি খুসী হ'য়ে খাবেন, সেরেও যাবেন। তাঁকে বলতে শুনেছি—ডাক্তার বদ্দি ডাকার খরচটা বাজি পোড়াবার মত' সেরেফ্ একটা বাজে খরচ; তবে বাজিগুলো দয়া ক'রে নিজেরাই পোড়ে, ওঁরা গেরোস্তোকে পোড়ান, আর রোগীকে ত' নিশ্চয়ই,—এই যা প্রভেদ।" যাক্,—পেঁপেটা তাঁর খুব পেয়ারের জিনিস, কেউ দিয়ে গেলে খুবই খুসী হ'তে দেখেছি; এখন পাওয়া যাবে কি?"

মাতুল বোধ হয় একটু বল পাইয়া বলিলেন—"শুনেছি, মন্দিরের খুব কাছেই "পাঁড়ের বাগান" ব'লে একটা

বাগিচা আছে; তার ফলের প্রশংসা বৈবাহিকের মুখেই শুনেছি;—চলুন একবার দেখে আসি।" কথাটা শ্রীমানের মুখে আমারও শোনা হইয়াছিল। ভাবিলাম—এটা 'নার্সারির' অঞ্চল, নিশ্চয়ই জবর কিছু হ'বে—দেখা উচিত। তদ্ভিন্ন আমার 'না' বলিবার ত' পথই ছিলনা।

জয়হরি আমার ভাব বুঝিয়া, কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিল—"একটা টাকা থাকে ত' দিন, আমি ততক্ষণ একটা চৌপলে হাত লাঠান আর দুটো বাতি কিনে রাখি। মোটা একগাছা বাঁশের লাঠি পেলেও নেবো,—সন্ধ্যে তো হ'য়েই এলো!"

তাহার কথার অর্থটা বুঝিয়া হাসিও পাইল, লজ্জিতও হইলাম, কিন্তু মাতুলকে ক্ষুণ্ণ করার অভদ্রতা ও নিষ্ঠুরতা আমার নিকট সুস্পষ্ট। বলিলাম—"এই পাশেই বাগান, ফিরতে আমাদের আধঘণ্টাও লাগবে না। এখন বেলা ১০টা বেজেছে মাত্র,—চলনা, ভাল কিছু পাওয়া যায় তো পেট ভরেই ভোগ লাগানো যাবে।"

শেষ কথাটায় কাজ হইল।

(২৩)

বাগানে প্রবেশ করিয়াই দেখি—সানবাঁধানো প্রকাণ্ড এক 'কুয়া'। স্বয়ং মালিক পাঁড়েজি স্নান করিতেছিলেন; আমাদের দেখিয়া সহাস্যে বলিলেন—"আইয়ে বাবুজি—এ আপনকারই বাগিচা আছে। বাঙ্গালী বাবুরা বৈদ্যনাথজি ভি দর্শন করেন,—এ বাগিচা ভি দর্শন করেন। এই কুয়ার জল আউর এই বাগিচার ফল সক্কোলে তালাস্ করেন, আর তারিফ করকে খান। বড়া বড়া বাংগালী জজ্, ডিপ্‌টি, লাক্‌পতি সবাইকে আমিই কেলা খাওয়াই। দু' রোজ সবুর করেন—আপনাদেরও খাওয়াবো। একটু আগাড়ী ধুরন্ধর বাবু, জলন্ধর বাবু, হিড়িম্বা বাবু, রজক বাবু আউর মাকুন্দি বাবু,—কেলা ভি, পেঁপিয়া ভি বিলকুল লইয়ে গেছেন। এই ছাখেন পাঁচ টাকা দশ আনা পড়িয়ে রয়েছে। কলকাত্তা সে দুই বড়া বড়া ব্যলিস্‌চোর (ব্যারিষ্টার) সাহেব আইয়েছেন,—মছলি শিকার করবেন। এ-স্থানে দরদস্তর নেই বাবুজি,—কেলা খেয়ে খুসী হ'য়ে টাকা ফেলে ছান!" ইত্যাদি বিরক্তিকর বক্তৃতার পর পাঁড়েজি বলিলেন—"যাইয়ে একবার বাগিচা ঘুরিয়ে আসেন, যো ফল পছিন্দ হোবে, এখানে টিকস্ আছে, আপন্ দস্তখৎ করকে, তাতে লোটকে দেন; পাকলে লইয়ে যাবেন। এখানে অবিশ্বাসের কাজ নেই বাবুজি,—এ তীর্থস্থান আছে।"

বাগিচার দিকে চাহিয়া কিছুই বুঝিলাম না, কোথাও নির্দ্দিষ্ট কোন' পথও দেখিলাম না;—যিনি যে স্থান দিয়া যান—সেইটিই তাঁর পথ। সেই হিসাবেই অগ্রসর হওয়া গেল। দেখিলাম নেবু, পেঁপে, পেয়ারা আর কলাবন, বোধ হয় আম, কাঁটাল, আনারসও ছিল। অবশিষ্ট স্থান বড় বড় ঘাস আর আগাছায় ভরা;—দৃশ্য আদৌ উপভোগ্য নহে। পেঁপে গাছে পেঁপে, কলাগাছে কলা, পেয়ারা গাছে পেয়ারা (অবশ্য উল্লেখযোগ্য নহে) রহিয়াছে;—সব ফলই কাঁচা।

একটু তফাতে একটা পেঁপে গাছে একটি পেঁপেয় রং ধরিয়াছে দেখিতে পাইয়া মাতুল আগ্রহে ও সবেগে তথায় উপস্থিত হইয়া পরক্ষণেই দ্বিগুণ বেগে চেষ্টা খাইয়া পশ্চাতে (বিপরীত) লাফ্ মারিতে গিয়া, ঝাঁটি বনে মাটি লইলেন!

আমাদেরই মত' ফলান্বেষী আর দুইটি বাবুও 'চোর-কাঁটার' ভয়ে হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া সন্তর্পণে ঘুরিতে-ছিলেন। নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু হইবে ভাবিয়া, তাঁহারা চোরকাঁটার চিন্তা ত্যাগ করিয়া 'পড়ি তো মরি' ভাবে ছুটিয়া একদম গেটে (gateএ) হাজির! গেট্‌টি ছিল—আগড়ের ক্রমোন্নতির অবস্থা বিশেষ।

আমি দ্রুত গিয়া দেখি—মাতুল উঠিবার পূর্ব্বে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কেশগুলি সারিয়া লইতেছেন! বুদ্ধিটা বিচলিত হওয়ায়, কি ভদ্রতার খাতিরে ঠিক্ বলা কঠিন, একটা দুঃসাহসিক কাজ করিয়া ফেলিলাম;—তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিতে গেলাম। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথাটা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মাতুলকে তুলিতে যাওয়া মানেই নিজের পড়িতে যাওয়া; কারণ তিনি ছিলেন আমার তিন গুণ ভারি। যাহা হউক, মাতুল নিজ গুণেই উঠিয়া পড়িলেন, আমি রক্ষা পাইলাম। উঠিয়াই কোঁচা ঝাড়িতে আর চোরকাঁটা বাছিতে মন দিলেন। মাতুল আসলে ছিলেন প্রচ্ছন্ন-বিলাসী। দেহটিকে তোয়াজে রাখা, প্রসাধন-প্রীতি, পোষাকপ্রিয়তা, পরিচ্ছন্নতা, এ সব ছিল তাঁর ধাতের জিনিস; তাই সামান্য কোন আঁচ লাগিলেই তিনি অসামান্য চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। যাক্—

ওদিকে গেটের বাহিরে গিয়া পূর্ব্বোক্ত বাবু দুটি এখন 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক পাড়িতেছেন—"ওখান থেকে শীগ্‌গীর চলে আসুন মশাই, শীগ্‌গির ; আঃ, করচেন কি—ওখানে আর তিলার্দ্ধ দাঁড়াবেন না!" এ সহানুভূতির অর্থ—ব্যাপারটা ফাঁকে ফাঁকে শুনিয়া সরিয়া পড়া। না শুনিয়াও নড়িতে পারিতেছেন না।

জয়হরি তখন বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া পাঁড়েজীর পেয়ারা গাছে উঠিয়া যথালাভ হিসাবে—আস্তো একটা কোঠো পেয়ারা মুখে পুরিয়াছে, এবং আর একটা ঐ জাতীয় মেওয়া লক্ষ্য করিয়া হাত বাড়াইয়াছে। তাহার কাণে সহসা ওরূপ তাড়ার-ডাক্ প্রবেশ করিতেই,—পটাস্ করিয়া সেই নাবালক ফলটি সংগ্রহ করতঃ এক লম্ফে ভূমি স্পর্শ ও এক দৌড়ে জমি পার হইয়া কুয়াতলায় হাজির হইল। পাঁড়েজী তখন উচ্চরবে "সর্ব্ব মাঙ্গল্যে মঙ্গলা শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকা" আবৃত্তি করিতে করিতে জল তুলিতেছিলেন। জয়হরি পিপাসা জানাইয়া জল পানার্থে অঞ্জলি পাতিতেই, তিনি এক বাল্‌তি জল তুলিয়া পিপাসিতের হস্তে ঢালিতে লাগিলেন। মাতুলকে লইয়া আমিও আসিয়া পৌছিলাম।

বালতিটি খুব বড় না হইলেও বেশ মাঝারি সাইজের ছিল। তাহার সমস্ত জলটুকু নিঃশেষ করিয়া জয়হরি উটের মত গড়্ গড়্ শব্দে একটা লম্বা উদ্‌গার শেষ করিল। পাঁড়েজি অবাক হইয়া তাহাকে দেখিতেছিলেন, পরে বলিলেন—"সাবাস্ বাবুজি—গেইয়াকে ভি (গরুকেও) হারায় দিয়েছেন!" তাহার পর আরম্ভ করিলেন—"এ বাগিচার পেয়ারা কেমন মিঠা বলুন,—এক বাল্‌তি জল টানিয়েছে। পিতল বাবু (সম্ভবতঃ প্রতুলবাবু) একঠো এক আনা করকে দিয়ে যান।"

আমিও পাড়েজীর শেষের কথাগুলি শুনিয়া কম অবাক হই নাই,—তাঁহার দূরদর্শিতা তথা সূক্ষ্মদর্শিতা লক্ষ্য করিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম। জয়হরি বাগিচার এক প্রান্তে ঝোপের মধ্যে পেয়ারা-পর্ব্বে মন দিয়াছিল, কিন্তু পাড়েজীর স্তোত্র-স্তিমিত চক্ষু তাহা এড়ায় নাই। তাঁহার কথাগুলি ত' কেবল শব্দ নয়, সে যে দু' আনার বিল্ (bill)! যাক্ যে কারণেই হউক, সেটা আর তিনি লন নাই।

আমি তখন এ মধুবন হইতে বাহির হইতে পারিলে বাঁচি। পাড়েজীর বক্তৃতায় বাধা দিয়া বলিলাম—"আজ তবে নমস্কার হই—বেলা হয়েছে।" তিনি খুসী হইয়া বলিলেন,—"দু'চার রোজ বাদ আসবেন বাবুজী।" তথাস্তু।

গেটের বাহিরে আসিতেই সেই বাবু দুইটি ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং দু'ই জনেই সচিন্ত আগ্রহে মাতুলকে প্রশ্ন করিলেন—"কি সাপ্ মশাই,—গাছেই ছিল?"

মাতুল এসব বিষয়ে বেশ হুঁসিয়ার, তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"কি সাপ আবার জিজ্ঞাসা করচেন—আসল্ 'খোয়ে'"!

শুনিয়া উভয়ে শিহরিয়া বলিলেন—"বাপরে, বলেন কি!"

মাতুল ভয়-ভক্তি মিশ্রিত মুখে বলিলেন—"ভগবান রক্ষে করেছেন মশাই, খেয়েছিল আর কি!" এই বলিয়া ভগবানের উদ্দেশে শূন্যে নমস্কার করিলেন।

বাবু দুইটি প্রশ্ন করিলেন—"কত বড় হবে মশাই?"

মাতুল সেই ভাবেই বলিলেন—"কি ক'রে ব'লব মশাই—তিন চার পাক্ তো গাছেই ছিল, আর ফণা তুলে ঝুলে এসেছিল তাও তিন হাতের কম হবে না,—আর যদি এক পা বাড়াই"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া মাতুল এমন শিউরে উঠলেন যে বাবু দুটিও কাঁপিয়া গেলেন। একজন আর একজনকে বলিলেন—"আর পেঁপে খেয়ে কাজ নেই বাবা, জান্‌টা জন্মের মত যেতো আর কি! বাপ্—বাগিচা না যমের বাড়ী!"

দ্বিতীয়টি বলিলেন—"আর এক মিনিট্ এর ত্রিসীমায় নয় বাবা, সরে পড়'—সরে পড়'।" এই বলিয়াই তাঁহারা দ্রুতপদে অন্যপথ ধরিলেন।

ব্যাপারটা জানিবার জন্য আমিও মাতুলকে বার তিনেক প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তিনি বলিয়াছিলেন—"পরে বলচি"। এখন আবার উৎসুক্যের সহিত বলিলাম—"বলো কি মাতুল—সত্যি সাপ না কি?"

মাতুল বলিলেন—"সে কপাল আমার নয় মশাই—এখনো কষ্টের এরিয়ার (arear) মেটাতে পাক্কা তিরিশ ইয়ার (year) নেবে। গিয়ে যদি দেখতে হয় বৈবাহিক উদুখল্ মেরে দাওয়ায় খাড়া বসে আছেন,—তার চেয়ে আমার সর্পাঘাত ভাল ছিল মশাই!"

মাতুলের এসব কথা 'কথার কথা' মাত্র, মরিবার ভয় তাঁর অতিরিক্ত, এগুলা সাময়িক জ্বালার উচ্ছ্বাস। আমি আশ্বাস দিয়া বলিলাম,—"গিয়ে দেখবেন চা খেয়ে তিনি চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন—সে ভাব কেটে গেছে।"

মাতুল। আঃ—তাই বলুন মশাই।

বলিলাম—"ভাববেননা, ও সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। কলিতে চা'র চেয়ে আর ওষুধ নেই। মেয়েদের হিষ্টিরিয়া সেরে যায়,—অন্ততঃ চা খাবার ওক্তোটিতে হয় না। আহা—স্মরণ পড়ে, স্মৃতিতীর্থ মশাইকে গঙ্গায় নিয়ে যাওয়া গেল, তাঁর শেষ মুহূর্ত্ত প্রায় উপস্থিত, পুত্র ব্যোপদেবকে সকলে বললেন—"ফোঁটা ফোঁটা গঙ্গাজল মুখে দা'ও।" কথাটা তাঁর কাণে পৌছেছিল, তিনি অতি কষ্টে ঘাড় নেড়ে বললেন—"উহুঁ—উহুঁ, এক-টু—চা।" দু'মিনিট পরেই ছুটি! যাক্—আচ্ছা এখন বলুন তো, পেঁপে দেখতে গিয়ে অমন চম্‌কে পেছু হটেছিলেন কেন?"

মাতুল। পায়ের ধুলো দিন,—বলচি।

এটা ছিল মাতুলের ব'নেদি বিনয়।

বলিলেন—"চেয়ে দেখি—পেঁপের গায়ে টিকিট্ মারা,—তাতে লেখা রয়েছে—Right reserved—advanced annas ten (সত্ব সংরক্ষিত, দশ আনা আগাম দেওয়া হইয়াছে) তার পর ইনিশিয়াল (initial) কি একটি ছুঁচো, তা লেখা দেখে বোঝা কঠিন। দেখেই ত' মশাই মাথাটা বোঁ করে উঠলো,—মনে হ'ল—ফলটিতে ত' দু'বেলার মত' মাল নেই—মূল্য কিন্তু দশ আনা! সুতরাং এই ফল-হরি-পূজো আমাকে কিছুদিন কায়েম রাখতে হ'লে—হারছড়াটাও গেল! কপালে অমনি কে যেন চাট্ মারলে,—তার পরই বীরশয্যা!

মহাকাব্যের সূচনা দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিলাম—"বল কি মাতুল—একটা পেঁপে দশ আনা! বৈবাহিককে ত' বেদানা খাওয়ালেই হয়।"

মাতুল বলিলেন—"আমি সম্ভ্রম সামলাবার জন্যে বেদানার কথাই তুলেছিলুম। তাতে যা শুনলুম তা এই—"না—না, বেদানা আমি প্রায়ই খাচ্চি, কালও খেয়েছি। ওতে পয়সা খরচ করতে যেওনা;—পেঁপেটা যত' পাও এনো।" শুনে আমি ত' মশাই একদম এতটুকু! কখন খেলেন, কে এনে দিলে—কিছুই জানিনা; তবে কি নিজে কিনে খাচ্চেন! বড়ই অপ্রতিভভাবে বললুম—"এ কি কথা বেই—আপনি নিজে,—আমাকে একটু হুকুম করলেই .....বৈবাহিক বললেন,—"আমি বেদানা কিনে খাবো—শেষে এইটে তুমি ঠাওরালে! তা'হলে আমি পাগল হয়েছি বলো!—স্বপ্নে হে—স্বপ্নে,—স্বপ্নে খাই। তাতে আস্বাদেরও তফাৎ নেই, পেটও ভরে,—আবার কি চাই! তবে একটু সর্দ্দিভাব আসে,—বেশী খাওয়া হয়ে যায় কি না।" শুনে আমি তো মশাই "থ"! ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বন্। আমার তো মশাই এই পঁয়তাল্লিস বচরে, স্বপ্নে একটা আমড়াও জোটেনি।"

অমরের সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়, তাই এই অভিনব বেদানা খাওয়ায় আমার আশ্চর্য্য হইবার কিছুই ছিলনা। ...

(২৪)

দেখি—দুইটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক দ্রুতবেগে বাগান-মুখো আসিতেছেন। একটি বৃদ্ধ হইলেও সঙ্গী যুবকটির সহিত 'কুইক্-মার্চ' চালাইয়াছেন। আমাদের পেঁপে-প্রসঙ্গ বন্ধ হইয়া গেল।

উভয়কেই পোষ্ট-অফিসের দাঁড়া মজলিসে দেখিয়াছিলাম। সামনা সামনি হইতেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিলেন—"এই যে,—আপনার কথা রোজই হয়:—আমরা ভাবলুম চলে গেছেন,—দেখতে পাইনা যে বড়! বাগিচায় গেছলেন বুঝি,—ও যেতেই হবে। হুঁ হুঁ—আমরাও চলেছি। আহারের পর fruits (ফল) একটা important item (আবশ্যক বস্তু) কি না; যেমন উপকারী তেমনি palatable (মুখরোচক)—তালু তর্ করে দেয়। না? এখন এমন অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে—ও নাহলে যেন নেড়ানেড়া বোধ হয়!"

বলিলাম—"তা'তো হবারই কথা, ওটা যেমন বিবাহের পর বাসর। বাসরটি না থাকলে বিবাহ ব্যাপারটাই আলুনি মেরে যেত, তার স্মৃতিতে মজাই থাকতোনা।"

বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন—"ইয়াঃ! আপনি একদম ওর মর্ম্মস্থানটিতে পৌচেছেন।"

বলিলাম—"আমি আর কি পৌছুব, বৃহদারণ্যক-ঘোঁটা ডার্‌উইন্ সাহেবের মতে আমরা যাঁদের বংশাবতংস তাঁরা ফল খেয়েই থাকেন, বলও তেমনি ধরেন, বাঁচেনও

আমাদের চেয়ে বেশী, আবার বুদ্ধিতেও কম যাননা। য়ুরোপ-আমেরিকার আত্মীয়েরা ওটা বুঝে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে আরম্ভ করে দিয়েছেন,—বাঁচ্‌চেনও বেশ লম্বা।"

বৃদ্ধ সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—"very ঠিক" (খুব ঠিক) কিন্তু আমাদের দেশ ওটা ধরতে পারেনি।"

মাতুল—আমাদের এরূপ অজ্ঞতার অভিযোগ সহ্য করিতে বরাবরই নারাজ। ভারতে ছিলনা জগতে এমন কিছুর নূতন আবিষ্কার হইয়াছে, বা ভারতের লোক কোন একটা বিষয় জানিত না—যাহা অন্যদেশের লোক আগে জানিয়াছে,—এসব কথা তিনি বিশ্বাস করেননা, সহিতেও পারেননা। তাই তিনি সুরু করিলেন—"মাপ্ করবেন মশাই—একটা কথা নিবেদন করি,—ওরা কত দিনের সভ্য মশাই যে ওরা ধরে ফেললে আর আমাদের দেশ সেটা ধরতে পারলেনা,—হাঁ করে বোসে 'চোল্' ধরিয়ে ফেল্‌লে! যিনি যাই বলুন মশাই—ভাষা সুরু হয়েছে "গালাগাল্" থেকে—এটা স্বীকার করতেই হবে। আদিতে মাত্র "মুখভঙ্গী" ছিল। পরে রোকের চাড়ে গলা চিরে মুখ ছুট্‌লো বা ফুট্‌লো "গালাগালে";—আর তখন থেকেই আমরা পুরুষানুক্রমে বড়দের কাছ থেকে—"কলা পোড়া খাও," এই উপদেশটা পেয়ে আসছি। কলার গুণ ধরতে না পারলে তাঁরা কখনই এ ব্যবস্থা করতেন না!—কি বলেন?"

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আচমকা একজন অপরিচিতের challengeএর (যুদ্ধংদেহির) এই চোট্ পেয়ে, মাতুলের দিকে নির্ব্বাক চেয়ে রইলেন।

মাতুল মেতে গিছলেন। আমি মনে মনে প্রমাদ গণিলাম,—তিনিও সুরু করিলেন,—কলাটা দেবপ্রিয় ফল, আর্য্যাবর্ত্তে হনুমানজির প্রতিষ্ঠা গ্রামে গ্রামে; তদ্ভিন্ন ঐটাই আমরা পঞ্চমবর্ষে পদার্পণের পর থেকেই (অর্থাৎ পাঠশালে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই,) ঘরে বাইরে পেতে আরম্ভ করি, সে কথার আভাস পূর্ব্বেই দিয়েছি, তাই কলার সম্মান সর্ব্বাগ্রে দেওয়াই আমি উচিত মনে করি। এতে বোধ হয় কারো আপত্তি থাকবেনা, থাকা ত উচিত নয়।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বিপদে পড়িয়া বলিলেন—"বলুন"।

মাতুল বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আমাদের দেশে ওর গুণ ধরা না পোড়লে,—বরণডালায় উনি ষোল-কলায় উপস্থিত থেকে বরের কপাল স্পর্শ করে তাঁর ভাগ্য পর্য্যন্ত পৌছুবার সুযোগ পেতেন না। দেবতার নৈবেদ্যে "অষ্টরম্ভার" বিধানও আজকের নয়। গুণ জানা থাকলে তার আদর তার সম্মান সকলেই করে থাকেন, এমন কি তার নামটি প্রতিষ্ঠানাদির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে স্মরণীয় করে রাখেন, যেমন Victoria Hall, Edward's School (ভিক্‌টোরিয়া হল্, এডোয়ার্ডস্ স্কুল) ইত্যাদি। আমাদের দেশেও 'কলা'কে সেই সম্মান অজানা প্রাচীন যুগ থেকে প্রদত্ত হয়ে আসছে। দু'একটার উল্লেখ করি,—সুন্দরী স্বর্গ বিদ্যাধরীর নাম রাখা হয়েছিল—"রম্ভা", সত্যনারায়ণের কথার প্রধানা নায়িকা—"কলাবতী"; দুর্গোৎসবে—"কলা-বউ"। উপাধিতে—"কলানিধি"। স্থান সংশ্রবে—"কলা-বাড়ী জয়নগর";—"কলাগেছে"; কোথাও গৌরবার্থে—"কাঁদি"। ইত্যাদি ইত্যাদি—

জয়হরি যেন মুকিয়ে ছিল, সেও বলিয়া উঠিল—"আর অজন্তা গুহায়—পাতুরে কলা! সে-তো আজকের কথা নয় মশাই—শোনা যায় জরাসন্ধ ফলিয়ে গেছেন!

আমি তাহার উৎসাহ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। কিংকর্ত্তব্য ভাবিতেছি, দেখি সে আবার আরম্ভ করিল—"ব্যাকরণের দিকে ছেলেরা ঘেঁশতে চায়না; তাদের লোভ দেখাবার জন্যে 'গোলাপ' কথার অনুকরণে ব্যাকরণের নামকরণ হ'ল—"কলা"-প!"

কি প্রলাপ! আবার এও যে বেজায় চড়োয়া হইয়া উঠিল! বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি একবার আমার দিকে চান, একবার তার দিকে তাকান। তাঁহার যুবা সঙ্গীটি সম্ভবতঃ জামাই হইবেন, তাই B. Sc. হইয়াও নীরব হাস্যে শ্রোতা হইয়াই রহিলেন।

কি বিপদ—জয়হরি থামেনা! "বুঝলেন মশাই" বলিয়া আরম্ভ করিল—"আমাদের দেশে কলার শ্রীবৃদ্ধি দিন দিন দ্রুত বেড়ে চলেছে, এই ধরে নিন্‌না,—সব বিদ্যামন্দিরেই কলাচাষের জোর আয়োজন চলেছে, অচিরেই ছেলেরা সব কলাবিদ্যায় পেকে বেরুবে—তখন প্রেমসে কলা ভক্ষণ (উপভোগ) করুননা—কত' করবেন।"

কথাটা শুনিয়া আমি সঙ্কুচিত হইতেছি, এমন সময় বৃদ্ধ যুবা সকলেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

আলপনা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চৌধুরী

[Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

আমিও তাহাতে যোগ দিয়া বলিলাম—"জয়হরি তোমারি জিত।" সে দু'হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

মাতুল গম্ভীর ভাবেই দেশের পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন, তিনি সেই ভাবেই বলিলেন—"অত কথাতেই বা কাজ কি, এই যে আমাদের এক একটি নধর মূর্ত্তি দেখছেন, আঁতুড়ের ষেটেরাপূজো থেকে শ্রাদ্ধ-বাসরে পিণ্ডি খাওয়া পর্য্যন্ত কলায় বে-ফাঁক্ ভরাট্! আর বিশেষ করে এই জন্যেই আমাদের পুত্রের দরকার হয়, 'পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনম্' কিনা! সুপুত্রেরা বেইমানি করেন না; বুদ্ধিমানেরা, বেঁচে থাকতেই আরম্ভ করে দ্যান।"

বৃদ্ধ লোকটি সহাস্যে বলিলেন—"ঠিক্ বলেচেন।"

মাতুল উৎসাহ পাইয়া বলিলেন—"মশাই যাদের কথা পূর্ব্বে বলেছেন, তারা ক'দিনই বা কলা খাচ্চে? আমাদের হিসেবে ওরা ত' এই সেদিন সুরু করেছে! তবে ওরা যেরকম বুদ্ধিমান জাত, চট্ আমাদের টোপ্‌কে যেতে পারে। তা মশাই কারুর মন্দ চাইনা,—আশীর্ব্বাদ করি ভালই হোক্।"

পরে আমাকে লক্ষ্য করিয়া মাতুল বলিলেন—"আপনি যে চুপ করেই রইলেন, এত বড় কথাটায় একটুও যে মতামত ছাড়ছেন না।"

বলিলাম—"দু'জনে কলা সম্বন্ধে বলার ত' কিছু বাকি রাখনি, কেবল কাঁচা, মোচা আর থোড় বাদ দিয়েছ। বলা দরকার যে আমরা ওগুলির চর্চ্চাও রীতিমত রাখি।"

এতক্ষণ পরে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন—"আমার বলবার উদ্দেশ্য ছিল—ওঁরা regularly (নিয়মিত ভাবে) আহারান্তে fruitsটা (ফলটা) ব্যবহার ক'রে থাকেন,—ওটা ওঁদের চাই-ই। আমাদের তেমন কোন routineও নেই, চাড়ও নেই। তাই বলতে হয়—ওর উপকারিতা জানা থাকলেও সে উপকারটা নেওয়া সম্বন্ধে আমরা বড়ই উদাসীন।"

কিছু বলিবার ভারটা যেন আমার উপর দিয়া মাতুল আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন; বলিলাম—"আপনি যা বললেন্ তা ঠিক্—কিন্তু 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' বলে একটা বহু প্রাচীন সত্য চলে আসছে। আদি-পুরুষদের ওপর টেক্কা মেরে কাপড় পরেই সেটা ঘটিয়ে বসেছি; কাপড়-খানা ফেলতে পারলে, আবার regularity রক্ষা করে সকলের মাথার ওপর বেড়ানো যায়। তা ছাড়া এটা আমাদের হিঁদুর দেশ, আমরা হনুমানজির মন্দিরও বানাই, পূজাও করি। শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতাযুগে তাঁর পরিচয় পেয়েছিলেন। আর ডারউইন্ সাহেব অনেক খুঁজে এই সে-দিন পূর্ব্বপুরুষ বার করেচেন বটে, কিন্তু তাঁদের মুখ চাননি। বেচারারা একটি ফলে হাত বাড়ালে পটাপট্ গুলি করতেও রাজি, অথচ ও জিনিসটি যুগ-যুগান্তর ধরে ওঁদেরই ভোগদখলে ছিল! আমরা কিন্তু অমন regularly (নিয়মিত ভাবে) অন্যের অধিকার গ্রাস করতে নারাজ!"

বৃদ্ধ বলিলেন "এর ওপর আর কথা চলে না, কিন্তু (মাতুলকে দেখাইয়া) এঁকে দেখে ত' বোধ হয় স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে ইনি বেশ নজর রাখেন। উনি যা-ই বলুন, নিজে কিন্তু নিশ্চয়ই fruit (ফল) ব্যবহার করে থাকেন; digestive systemকে (পাকস্থলী) সবল না রাখলে, চেহারায় কখনই অমন লাবণ্য থাকত না। দেখলে আনন্দ হয়।"

কথাটায় মাতুল বেশ একটু আন্তরিক আনন্দ অনুভব করিলেন। চট্ রুমালখানা পকেট্ হইতে টানিয়া, মুখখানা সজোরে মুছিয়া, বিনীত ভাবে বলিলেন—"কোথায় পাবো মশাই, সবই পয়সার খেলা, তার ওপর দশজনেই দেহটা দ-পড়িয়ে দিলে!"

ভদ্রলোকটি বলিলেন—"ও আপনি কি বলচেন,—নিজের শরীরটে আগে মশাই,—পাঁচজন তার পরে।"

বুঝিলাম—এ চ্যাপটার্ (অধ্যায়) আরম্ভ হইলে জয়হরির অনুমানই ঠিক্ হইবে, সেও লাঠান না কিনিয়া ছাড়িবে না। তাড়াতাড়ি ভদ্রলোকটিকে বলিলাম "ওঁর fruit খাওয়া সম্বন্ধে আপনার অনুমানটা নির্ভুল বললেই হয়, তবে বুদ্ধি খেলিয়ে উনি সেটাকে এমন সহজ করে নিয়েছেন যে অসময়েও, এমন কি মরুভূমেও ওঁর ফল খাওয়াটা নিয়মিতই চলে।"

ভদ্রলোকটি সাগ্রহে ও সানুনয়ে বলিলেন—"বলতে যদি বাধা না থাকে ত' বড়ই উপকার করা হবে। আমার ওটা আফিংএর মতই অনিবার্য্য দাঁড়িয়ে গেছে, আমি বেঁচে যাই মশাই।"

বলিলাম—"আজ্ঞে উনি ফ্রুট্-সল্ট্ (fruit-salt) ধরেছেন!"

ভদ্রলোকটি হাসিয়া উঠিলেন ও বলিলেন—"জিত কিন্তু আমারি রইলো। আপনার সঙ্গে প্রথম দেখার পর এত আনন্দ উপভোগ একদিনও করিনি। আপনার সঙ্গী-ভাগ্য খুব জবর বটে, তা না ত' এমন সরস যোগাযোগ ঘোটত না।"

বলিলাম—"এই তেরোস্পর্শের কথা বলছেন! ওর যে একটা কারণ আছে—"

ভদ্রলোকটি বলিলেন—"সেটাও বলতে হয়েছে মশাই।"

বলিলাম—"শোনবার মত কিছু নেই, সংক্ষেপেই বলি। আবির্ভাবটা আমার খাস আর্য্যাবর্ত্তেই ঘটেছিল। ষষ্ঠীপূজার পুরোহিতও পাওয়া গিছলো খাঁটী ইক্ষ্বাকুবংশের। আমার ভাগ্যলিপি লেখবার লেখনির জন্যে মা ঐ ইক্ষ্বাকু-বংশীর ওপর খাঁকের কলম এনে দেবার ভার দেন, কারণ অন্য কলম না কি বিধাতা-পুরুষের হাতে অচল। তিনি যা এনে ছান সেটা খাঁক নয়—আক,—যে আক হাতীর খোরাক,—অপেক্ষাকৃত সরু হলেও, তাকে বাগিয়ে ধরা এক বিধাতাপুরুষেরই সম্ভব ছিল।—তাই দিয়েই তিনি আমার ভাগ্যলিপি দেগে দিয়ে যান। তাই বরাবরই আমার ভাগ্যে রসস্ত সঙ্গীই জোটে,—মন্ত্রস্তও থাকতে হয়।

ভদ্রলোকটি উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন "বাঃ বেশ,—বেশ আছেন আপনারা!"

পিয়ারী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল্

বরানগর কুটীঘাটা ফেরি-ষ্টেশনের একটু উত্তরে গঙ্গার উপর পরিচ্ছন্ন একখানি বাগান বাড়ী। তার ঠিক পাশেই কতকগুলা পুরানো ঘাটের পর বহুকালের একখানি জীর্ণ একতলা বাড়ী। এই বাড়ীর পশ্চিমের ঘরে বসিয়া অমল কবিতা লিখিতেছিল। রাত্রি তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে; আকাশে দ্বাদশীর চাঁদ, গাছপালা বাহিয়া তার জ্যোৎস্না-ধারা পৃথিবীর গায়ে ঝরিয়া পড়িয়াছে। ফাগুন-মাস। বেশ মিঠা হাওয়াও বহিতেছে। অর্থাৎ সময়টুকু কবিতা লিখিবার পক্ষে খুবই যোগ্য।

তরুণ কবির ঘরে সে একা—দ্বিতীয় জন-মানব নাই। পাড়ায় একজনের বাড়ী অমল দু' বেলা দু'টী ছেলে পড়ায়; তাদের বাড়ীতেই দুইবেলার আহার বরাদ্দ আছে—তা' ছাড়া হাত-খরচ যা মেলে, তাতেই তার চলিয়া যায়। কাজেই সে কষ্ট করিয়া আরো দুই পয়সা উপার্জ্জনের চেষ্টায় বাহিরে ছুটাছুটী করিবার দুরাশা ও শ্রম ত্যাগ করিয়া অবসর-মত ঘরে বসিয়া কবিতা লেখে। নিজের লেখা কবিতা পড়িয়া নিজেই সে তৃপ্তি পায়; স্বতন্ত্র বহি বা মাসিক-পত্রে সে সব কবিতা ছাপাইবার দুঃসাহস বুকে লইয়া সে যে ছাপাখানা বা মাসিক-সম্পাদকের দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইবে, তত বড় জানও তার ছিল না। অর্থাৎ ছাত্রদুটীকে পড়াইয়া অত্যন্ত নিরীহের মত সে বাকী সময়টুকু তার ঐই জীর্ণ গৃহ-বিবরেই পড়িয়া থাকিত; কখনো নদীর ধারে পায়চারি করিত, বাড়ীর ছাদে বসিয়া কখনো বা ও-পারে সূর্য্যাস্তের শোভা দেখিত, কখনো-বা নদীর জলে তরঙ্গের নৃত্য-ভঙ্গিমা আর নৌকার শ্রেণী লক্ষ্য করিত, আর এ-সব দেখিয়া প্রাণে ভাব আসিলে খাতা খুলিয়া কবিতা লিখিত।

তার কবিতার উৎসও ছিল...সে চপলাসুন্দরী। তা থাকিলেও, এ কথাটা পাছে বাহিরে কেহ জানিতে পারে, এইটাই ছিল তার দারুণ ভয়! আর এই ভয়ের জন্যই সে যে-সব কবিতা লিখিত, তাহা লোকচক্ষুর অগোচরেই গোপন রাখিত। যদি সেগুলি কোন দিন কাহারো চোখে পড়ে—এ কথা মনে হইলে লজ্জায় তার মাথার মধ্যে রক্তটা ছলাৎ করিয়া উঠিত। তার কারণ, এই চপলাসুন্দরী পল্লীর কোনো বালিকা বা তরুণী নয়—সে ইণ্ডিয়ান থিয়েটারের প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী। বাংলায় এমন রসিক কেহ নাই যে অভিনেত্রী চপলাসুন্দরীর নাম জানে না!

অমল বহুকাল পূর্ব্বে যখন কলিকাতায় পড়িত, অবশ্য

যখন তার এমন হীন হইয়া পড়ে নাই, তখন সে ইণ্ডিয়ান্ থিয়েটারে গিয়া চার-পাঁচ বার চপলাসুন্দরীর অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছে। প্রথম দেখে, কপালকুণ্ডলা। কাপালিকের হাতে নবকুমারের জীবনের যখন চরম-ক্ষণ উপস্থিত, তখন পৃষ্ঠে সেই মুক্ত কৃষ্ণ কেশের ঝালর দুলাইয়া, রক্ত-বস্ত্রে রূপের ছটায় চারিদিকে বিস্ময় ফুটাইয়া কপালকুণ্ডলা সেই যে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল,—তার চরণ-ভঙ্গীতে আশ্বাস ঝরিয়া পড়িতেছে, চোখে সরলতা উছলিয়া উঠিয়াছে, বিশ্বের বিস্ময় যেন কোন্ বিজন লোক হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে—সে রূপ, সে ছবি ভুলিবার নয়। তার পর হইতে কত বিনিদ্র রাত্রি যে অমলের ঐ রূপের ধ্যানে কাটিয়া গিয়াছে! আর একদিন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা গীতিনাট্যে দেখিয়াছে, ঐ চপলাসুন্দরী বিরহিণী রাধার ভূমিকা লইয়া গানে-কথায় প্রাণের মধ্যে অশ্রুর সাগর রচিয়া তুলিয়াছিল—তারপর আরো দুই-তিন বার চপলাসুন্দরীর অভিনয় সে দেখিয়াছে, যখনই দেখিয়াছে, তখনই মুগ্ধ তন্ময় হইয়া ফিরিয়াছে। নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া জগৎ ভুলিয়া সে যে তখন কি স্বপ্নে-গড়া কল্প-রাজ্যে প্রবেশ করিত! তারপর চপলাসুন্দরী হঠাৎ একদিন থিয়েটার ছাড়িয়া কোথায় যে অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল! থিয়েটার-পাগল দর্শকের হায়-হায় রবে চারিদিকে দারুণ বিশৃঙ্খলা জাগিয়া উঠিল; অমলের প্রাণটাও তার মধ্যে নিজের কাতর দীর্ঘশ্বাস মিশাইয়া হাহাকারে বিদীর্ণপ্রায় হইয়াছে!

ঠিক সেই সময়েই তার ভাগ্যাকাশে নিবিড় কালো মেঘ আসিয়া উদয় হইল, এবং সেই মেঘ প্রবল ঝড় তুলিয়া তাহারি প্রচণ্ড আবর্ত্তে তাহাকে একেবারে নিরুপায় আশ্রয়হীন করিয়া এই জীর্ণ ঘরের মধ্যে আছড়াইয়া আনিয়া ফেলিয়াছে। অর্থাৎ একটা বৈষয়িক মামলায় তার অদৃষ্ট একেবারে ছন্নছাড়া হইয়া গেছে!

এত বড় বিপদে প্রথমে সে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া কঠিন রোগে পড়িলেও বিনা-পরিচর্য্যায় একা এই ঘরে ভুগিয়া-ভুগিয়া সারিয়া উঠিল। যখন সারিয়া উঠিল, তখন মন এমন কুণ্ঠায় ভরিয়া গিয়াছে যে, এই ছোট্ট গণ্ডী ছাড়িয়া বাহির হইতে পা তার আর উঠিতে চাহিল না!...সময় কাটে কি করিয়া? পুরাতনের স্মৃতি-স্তূপ ঘাঁটিয়া নাড়াচাড়া করিতে গেলে কোথা হইতে বুকে অজস্র কাঁটা ফোটে, সে কাঁটার ঘায় বুক একেবারে রক্তে ভাসিয়া যায়। তবুও ঐ স্তূপ ঘাঁটার বিরাম নাই। এই স্তূপ ঘাঁটিতে গিয়াই চপলার ছবি একেবারে সদ্য-ফোটা তাজা গোলাপের মত একদিন হাতে ঠেকিল। সেই গোলাপটি বুকে ধরিতেই নানা ছন্দে তার প্রীতি একেবারে জীবন্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এই গোলাপের শোভায় গন্ধে সান্ত্বনাও মিলিল।

সেই অবধি সে এই চপলাকে লক্ষ্য করিয়া কবিতা লিখিয়াই নিজের রিক্ত শূন্য প্রাণকে সচেতন রাখিয়াছে। এক একবার সাধ হয়, ইণ্ডিয়ান্ থিয়েটারে গিয়া খপর নেয়, চপলা থিয়েটারে ফিরিয়াছে কি না! কিন্তু সে জায়গায় সে যাইবে কি করিয়া! আর গেলেই বা ফল কি! থিয়েটার দেখিতে যাইবার পয়সারও অভাব যে এখন।

বড়লোক না হইলেও এক দিন অমলের অবস্থা খারাপও ছিল না। বৃদ্ধ মাতামহর কাছে থাকিয়া সে পড়াশুনা করিত। এই মাতামহ তাঁর এক সরিকী মকর্দ্দমায় আজীবন কাটাইয়া দিতে দিতে হঠাৎ মামলাটা হারিয়া গেলেন। মেয়ে-জামাই মরিয়া গেলেও তাঁর যে-মন এই মামলার ফলটির দিকে আশা-তৃষ্ণায় পরিপূর্ণ হইয়া সতেজে খাড়া ছিল, মামলা হারিতে সে-মন মচকাইয়া গেল। শত্রুপক্ষ মামলা জিতিয়া ধুমধামে পূজা-ভোজ লাগাইয়া দিল; মাতামহ তখন শোকার্ত্ত মনে শয্যা লইলেন এবং পাছে মৃত্যু আসিয়া এই পৃথিবী ও এই পৃথিবীতে তাঁর প্রধান অবলম্বন মামলাটিকে তাঁর হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া যায়, এই আশঙ্কায় রোগশয্যায় পড়িয়াই তিনি আপীল জুড়িয়া দিলেন। শেষ পয়সাটিকে আদালতের হাতে তুলিয়া দিয়া আবার যখন মাতামহ আশার শেষ খেইটুকু ধরিবার জন্য হাত বাড়াইলেন, ঠিক সেইক্ষণে কঠিন নিষ্ঠুর মৃত্যু আসিয়া তাঁর সেই উদ্যত হাতদুটীকে কষিয়া ধরিয়া তাঁকে আপনার দেশে লইয়া গেল! অমল তখন কলেজের পড়া সুরু করিয়াছে। মাতামহর মৃত্যুতে চারি-দিকে অকূল সমুদ্র দেখিয়া সে অস্থির আকুল হইল; এবং এ-সব কোলাহল ছাড়িয়া সে তার স্বর্গগত পিতার বহু-কাল-পূর্ব্বে-পরিত্যক্ত জীর্ণ গৃহে আসিয়া উদ্বেগ লজ্জার হাত এড়াইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। এই ঘটনাগুলার পর তার মন ও শরীর এমন দমিয়া গেল যে ভবিষ্যতের

সম্বন্ধে কোন আকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টার এতটুকুও তার মনে রহিল না। কোনমতে বর্ত্তমানটাকে দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার হাত হইতে ঠেকাইয়া রাখাকেই সে পরম লাভ বুঝিয়া নিশ্চেষ্ট পড়িয়া রহিল। তার এই নিশ্চেষ্টতার মাঝে কবিতাদেবী আসিয়া তার স্কন্ধে ভর করিলেন। সেই অবধি অমল কবিতা লিখিতেছে।

২

বাগান-বাড়ীর একটু দূরে জীর্ণ গৃহে বসিয়া অমল যখন কবিতা লিখিতেছিল, বাগানবাড়ীর মধ্যে আলো হাসি, নাচ-গানের সমারোহের অন্তরালে তখন এক প্রকাণ্ড নাট্যের সূচনা গড়িয়া উঠিতেছিল!

সেদিন শনিবার। বাগানে কলিকাতার মধু-পিয়াসী সম্প্রদায়ের একটা দল আমোদ-প্রমোদে গা ঢালিয়া সেখানে নন্দন রচনার আয়োজন করিয়াছিল। আজিকার রাত্রে এ সমারোহের ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী এটর্নি মানগোবিন্দ রায়। আট-দশ বৎসরের প্রাক্‌টিশে মানগোবিন্দ এটর্নি-পাড়ায় বিলক্ষণ নাম কিনিয়াছে এবং সেই নামকে সর্ব্ব-বিষয়ে সকলের উপর তুলিতে হইলে যে-সব উপকরণের প্রয়োজন, সেগুলির সংগ্রহে ও সাধনায় তার এতটুকু শৈথিল্য ছিল না। তার বিলাস-লীলায় প্রধান সহচরী ছিল পাপিয়া। রূপে-গুণে পাপিয়া তখন বিলাসী সমাজের মুকুট-মণি! এই পাপিয়ার প্রসাদ-লোভে বিলাসীর দল মধু-মক্ষিকার মত অহর্নিশি গুঞ্জন-মত্ত থাকিলেও, মানগোবিন্দ বহুৎ টাকা সেলামি দিয়া পাপিয়াকে দখল করিয়া ফেলিল।

বাগানে আজিকার প্রমোদ-লীলায় পাপিয়া সম্রাজ্ঞীর আসন পাতিয়া বসিয়াছিল এবং তাহার চারিদিকে ডালিম, চাঁপা, সরোজিনী, নীহার নক্ষত্রের মত ফুটিয়া রহিয়াছে! নাচে-গানে আনন্দ-সভা যখন মশগুল, পাপিয়া তখন হঠাৎ প্রমোদ-কক্ষ ত্যাগ করিয়া গঙ্গার ধারের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে চাঁদের জ্যোৎস্না ও-পার অবধি আলোর চাদর বিছাইয়া দিয়াছে। মদির স্নিগ্ধ হাওয়া! এই চাঁদের আলো আর মদির হাওয়ার পরশে পাপিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। এমন দৃশ্য সচরাচর চোখে পড়ে না, তাই সে মুগ্ধ নেত্রে ওপারের পানে চাহিয়া বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ওপারের ঐ গাছপালা, প্রান্তর, ঘাট, বাড়ী, নিস্তব্ধ রাত্রে জ্যোৎস্নার রূপালি চাদর গায়ে দিয়া নীরব রহিয়াছে। পাপিয়ার মনে হইল, ওটা যেন স্বপ্ন-দিয়া-গড়া এক মায়ার রাজ্য,—বাস্তবের কঠিন হাত যেন ওর কোথাও পড়ে নাই! ভিতরে হল-ঘরে তখন মহাধুমে নূপুরের তালে তালে নাচ-গানের আসর ভরাট হইয়া উঠিতেছে।

পাপিয়া বারান্দার এক প্রান্তে চলিয়া গেল—আশে-পাশে এপারে ঘাট-বাট নিস্তব্ধ। দু-চারখানা গৃহ দেখা যাইতেছে, চাঁদের আলোয় সে-সব যেন স্বপ্ন দিয়া ঘেরা! সে উদাস নেত্রে জ্যোৎস্না-জড়িত সুদূরের পানে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর ঠিক নীচেকার ঘর হইতে একটা অস্ফুট ক্রন্দন ও সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ-কণ্ঠে কখনো মিনতি কখনো বা তর্জ্জনের সুর ভাসিয়া উঠিল। পাপিয়া কান পাতিয়া ভাল করিয়া সে-শব্দ শুনিল, তারপর ক্ষিপ্রগতিতে বৈঠক-কক্ষ ছাড়াইয়া সোপান বাহিয়া একেবারে সে নীচেকার ঘরে নামিয়া আসিল।

ঘরের দ্বার ভেজানো ছিল। সন্তর্পণে একটু ঠেলিতেই খোলা দ্বার-পথে সে দেখিল, ঘরে আলো জ্বলিতেছে এবং ঘরের মধ্যে একটা কৌচে এক সুন্দরী তরুণী! অত্যন্ত সঙ্কোচে সে যেন মরিয়া রহিয়াছে, চোখে তার অশ্রু! আর তার সামনে দাঁড়াইয়া একটা মোটা-সোটা লোক তার পানেই চাহিয়া—চোখে তার ক্ষুধা আর বিরক্তির রেখা! পাপিয়া চুপ করিয়া দ্বারে কাণ পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তরুণী কথা কহিল—অশ্রু-জড়িত মিনতির স্বর! সে বলিল,—আমায় দয়া করে ছেড়ে দিন। আমি বাড়ী যাই...এখনো বাড়ী ফিরতে পারলে কেউ জানবে না, আমারো উপায় থাকবে!

পুরুষ বলিল,—বাড়ী ফিরবে তো এগিয়ে এসেছিলে কেন? তোমার জন্যে আমি অনেক পয়সা খরচ করেছি...সে কি অমনি-অমনি?···অনেক দিন থেকে খেলাচ্ছ আমায়... তাছাড়া আমি তো জোর করে তোমায় আনিনি। তুমি রাজী হয়েছিলে নিজে!...

তরুণী কহিল,—আমি বুঝতে পারিনি···

পুরুষ কহিল,—ও-সব চলবে না। আমি কোন কথা শুনবো না। বলিয়াই সে তরুণীর দুই হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল ও তাকে বক্ষে গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিল।

পাপিয়া ব্যাপারটা নিমেষে বুঝিয়া ফেলিল। তার শিরায় শিরায় চকিতে যেন বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল! তেমনি বিদ্যুৎ-গতিতে দ্বার ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পুরুষটাকে সজোরে সে ধাক্কা দিল এবং তরুণীকে বাহুর ঘেরে ঘেরিয়া কহিল,—চলে এসো তুমি...

পুরুষটা এই আকস্মিক আক্রমণের বেগে টাল সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল। উঠিয়া চমক ভাঙ্গিতে সে দেখে, সামনে দাঁড়াইয়া পাপিয়া। সে বলিল,—এ কি রকম ইয়ারকি! ভালো লাগে না! ছাড়ো ওকে...

পাপিয়া বলিল,—না; ছাড়বো না।

পুরুষ বলিল,—অত আহ্লাদ ভালো নয়। তুমি যা আছ, তাই আছ! আমার ব্যাপারে হাত দিতে এসেছ কেন, বল তো? সরো, ভালো হবে না।

পাপিয়া বলিল,—এ তোমাদের দলে থাকবে না, বাড়ী যেতে চাচ্ছে,— তবু ওকে জোর করে ধরে রাখবে! এই বা কেমন কথা!

পুরুষ বলিল—সে কথা আমি বুঝবো! তোমায় সরদারী করতে হবে না। ওঃ, ঘরের বাহিরে নিজে যেচে এসে এখন সতীত্বের ধ্বজা তুলে দাঁড়াচ্ছেন! শোনো পাপিয়া, একে আমি জোর করে আনিনি—ও নিজের ইচ্ছায় এসেছে।

পাপিয়া তরুণীর পানে চাহিল, ঝড়ের মুখে তরুণ পল্লবের মত সে কাঁপিতেছিল। তার দুই চোখে অশ্রুর ধারা চোখ ছাপাইয়া উঠিয়াছে, দুই গাল বাহিয়া সে অশ্রু অঝোরে ঝরিতেছিল। তরুণী বলিল—না, না, আমি এখানে আসতে চাইনি! আমি বুঝতে পারিনি, বুঝতে পারিনি।...ওগো, আমার ঘরে রেখে এসো...

পাপিয়া কহিল,—কোথায় তোমার ঘর, বল তো··?

পুরুষ আরক্ত চোখে পাপিয়ার পানে চাহিল, কঠিন স্বরে কহিল,—ভালো হচ্ছেনা পাপিয়া—ছাড়ো ওকে—

পাপিয়াও ভ্রূকুটিপূর্ণ চোখে তার পানে চাহিয়া কহিল—ছাড়বো না!

পুরুষ কহিল—কি করবে, শুনি!

পাপিয়া কহিল—ওকে বাড়ী রেখে আসবো।

পুরুষটা ব্যঙ্গের সুরে কহিল,—যা বললেন!...অমনি··· বলিয়া সে পাপিয়ার কবল হইতে তরুণীকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে তার দিকে অগ্রসর হইল। পাপিয়া এ আক্রমণের জন্য নিজেকে আগে হইতে উদ্যত রাখিয়া ছিল—তরুণীকে দ্রুত একপাশে সরাইয়া বুক ফুলাইয়া সে পুরুষটার সামনে রুখিয়া দাঁড়াইয়া ঘরটার চারিধারে একবার নিমেষে চাহিয়া লইল,—ঘরে গরাদে-দেওয়া কয়টা জানালা, একটিমাত্র দ্বার! পুরুষটা তার সামনে আসিয়া কহিল,—তুমি ওকে ছাড়বেনা, তাহলে?

পাপিয়া কহিল,—না।

পুরুষ কহিল,—মানগোবিন্দর কোন খাতির রাখবো না আমি···জেনে রেখো...

পাপিয়া কহিল,—রাখতে হবে না।

পুরুষ কহিল—আমার দোষ নেই তবে...ওকে আমার চাই। আমায় অনেক খেলিয়েছে ও, জান্‌লার আড়ালে নিজের ঘরে বসে! আজ নিজে আসতে চেয়েছিল, তাই এনেছি এ আয়োজনে খরচও ঢের হয়েছে, কন্দী অনেক খটাতে হয়েছে...সেগুলো বকাণ্ড-প্রত্যাশার জন্য করিনি। আর এ থিয়েটারী ঢংয়ের জন্যেও না···ছাড়ো ওকে...

পাপিয়া কহিল—বলেছি তো, ছাড়বো না···

—তবে আমার দোষ নেই...বলিয়া পুরুষ পাপিয়াকে সবলে আক্রমণ করিতে গেল। পাপিয়া পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল; সে দুই পা সরিয়া গেল, আর পুরুষটা টাল সামলাইতে না পারিয়া আবার পড়িয়া গেল। যেমন পড়িয়া যাওয়া, পাপিয়া অমনি যো পাইয়া চেয়ার কয়খানা টানিয়া ফেলিয়া তার চারিধারে দ্রুত ব্যূহ রচনা করিয়া দিল এবং তরুণীর হাত ধরিয়া টানিয়া তাকে লইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল—এবং বাহিরে গিয়া দ্বারটা জোরে টানিয়া বন্ধ করিয়া দিল। বাহিরের দিকে ছিট্‌কিনী ছিল। ছিট্‌কিনী লাগাইয়া তরুণীকে টানিয়া সে একটা কুঞ্জান্তরালে লইয়া গেল। পাপিয়া হাঁপাইতেছিল। তরুণীকে কহিল,—কোথায় তোমার বাড়ী, বল শীগগির···

তরুণী ঠিকানা বলিল। পাপিয়া বলিল,—শীগ্‌গির এসো। এক মুহূর্ত্ত দেরী করা চলবে না।···এ পথে কেন এসেছিলে বোন্! ঘরের মধ্যে যত অন্ধকারই থাক্, তবু সে ঘর,···আর বাহিরে যদি কোন আলো দেখে থাকো তো জেনো, সে আলেয়ার আলো, মুহূর্ত্তের চমক্, তার পিছনে গাঢ় অন্ধকার!—তার আলোয় মজে ঘর ছেড়ে বার হয়ো না, বিপদের এখানে অন্ত নেই! এর চেয়ে ঘরের মধ্যে নৈরাশ্যে পুড়ে মর যদি তো তাও ঢের ভালো!...এসো..

তরুণীকে লইয়া পাপিয়া সতর্কভাবে বাগানের ফটকে আসিল। উদ্যান-বিলাসী বাবুদের কয়খানা গাড়ী, মোটর ফটকে দাঁড়াইয়াছিল—ট্যাক্সিও দুই-চারিখানা ছিল। তরুণীকে লইয়া একটা ট্যাক্সিতে চড়িয়া পাপিয়া সোফারকে বলিল—চলো···

ট্যাক্সি তাদের দুইজনকে লইয়া তীব্র গতিতে কলিকাতার দিকে ছুটিল। (ক্রমশঃ)

পাণ্ডুয়া

কুমার শ্রীমুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়

সপ্তগ্রামের পর পাণ্ডুয়া হুগলী জেলার মধ্যে অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান। কথিত আছে, গৌতম বুদ্ধের পিতৃব্য-পুত্র পাণ্ডু শাক্য বঙ্গ দেশে আসিয়া প্রাচীন সপ্তগ্রাম মহানগরীর পাঁচ ক্রোশ উত্তরে দামোদর নদের তীরে এক

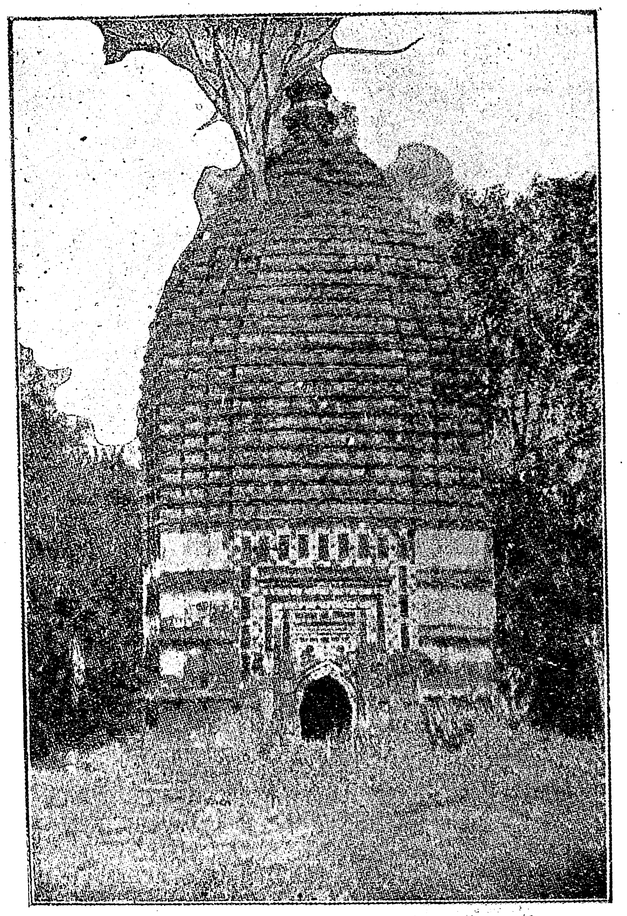

বৈঁচী মন্দির

ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন ও স্বীয় নামানুসারে রাজধানীর নাম দেন "পাণ্ডুয়া"। রাজধানী উচ্চ প্রাচীর ও প্রাকার-বেষ্টিত ছিল। সুরম্য প্রাসাদ, সুবৃহৎ অট্টালিকা, সুদৃশ্য দেব-দেউল, বৌদ্ধ বিহার ও মঠ এবং বহু সুপেয় পানীয় পূর্ণ সরোবরে রাজধানী সুশোভিত ছিল। প্রকৃতিপুঞ্জ সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। রাজ্য ধন-ধান্যে পূর্ণ ছিল। রাজ্যে পূজা-পার্ব্বন, যাগ যজ্ঞ. ধর্ম্মানুষ্ঠান, আনন্দোৎসব লাগিয়াই থাকিত। এহেন সমৃদ্ধ ও রম্য জনপদ ঘটনা-চক্রের কঠোর আবর্ত্তনে ক্রমে হতশ্রী হইয়া পড়িল। লক্ষ্মী চিরদিনই চঞ্চলা, কোথাও চিরস্থায়ীরূপে অবস্থান করেন না। পাণ্ডুয়ার ভাগ্যলক্ষ্মী এক অবোধ সুকুমার শিশু-হত্যা-জনিত পাপ-কর্ম্মের উপলক্ষ করিয়া রাজার প্রতি অপ্রসন্না হন, তাঁহার রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। হিন্দু রাজ্য বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু কীর্ত্তি-কলাপও বিলুপ্ত হইয়াছিল। যাহা কিছু নিদর্শন ছিল, তাহাও বিজয়ী বিধর্ম্মী কর্ত্তৃক রূপান্তরিত হইয়াছিল। বহু শতাব্দী পরে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় বিধর্ম্মীর ভগ্নস্তূপ হইতে আবার তাহা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। পাণ্ডুয়ার হিন্দু-রাজত্বের ইতিহাস কালের অনন্ত তিমিরে সমাচ্ছন্ন—সে তিমির ভেদ করিবার প্রয়াস পাওয়া আমার ক্ষুদ্র শক্তির অতীত।

পাণ্ডুয়া মুসলমান-অধিকারভুক্ত হওয়া সম্বন্ধে নানা প্রবাদমূলক গল্প প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে ; কয়েকটি গল্প এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইল। একটি এই—পাণ্ডুয়ার হিন্দু রাজার একটী পুত্র সন্তান হওয়ায়, রাজবাটীতে মহাভোজ দেওয়া হয়। রাজার জনৈক মুসলমান কর্ম্মচারী, সেই সময় স্বীয় বাটীতে একটী ভোজ দেয়। ভোজ উপলক্ষে গোবধ করিয়া অস্থিগুলি ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখে। রজনী যোগে শৃগালেরা গর্ত্ত খনন করিয়া অস্থিগুলি তুলিয়া

ফেলে। হিন্দু প্রজারা তাহা দেখিয়া উন্মত্তবৎ হয়। রাজা স্বীয় শিশু পুত্রকে এই অমঙ্গলের কারণ স্থির করিয়া হত্যা করেন। মুসলমান কর্ম্মচারী দিল্লীতে পলায়ন করিয়া সম্রাটের সাহায্যে বিপুল সেনা সংগ্রহ করিয়া পাণ্ডুয়া আক্রমণ এবং যুদ্ধে হিন্দুদিগকে পরাস্ত করেন। (১) আর একটী প্রবাদ এই যে, মুসলমান কর্ম্মচারী পুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে গো হত্যা করে। সেজন্য মুসলমানের পুত্রক রাজাদেশে হত্যা করা হয়। (২) শেষোক্ত বিবরণ সম্ভব বলিয়া অনুমিত হয়। তৃতীয় প্রবাদ এই যে, মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিলে, পাণ্ডুয়ার রাজা মহা-

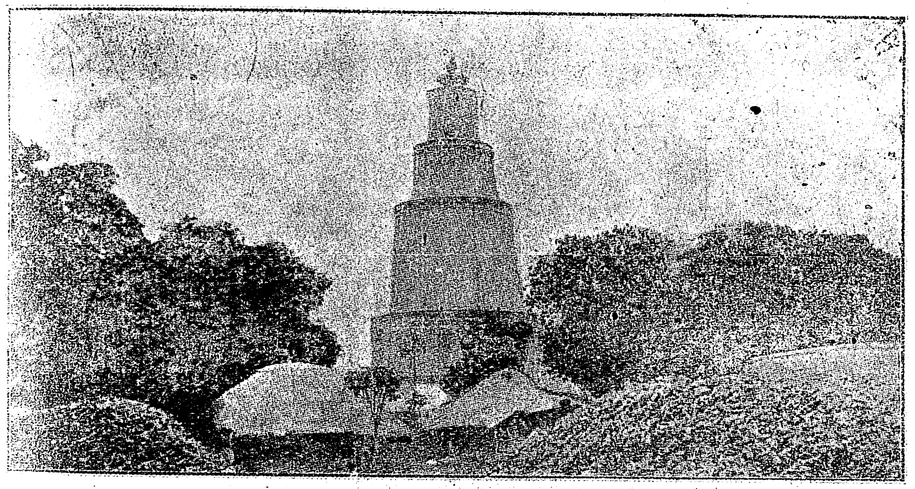

পাণ্ডুয়া মিনার—সংস্কারের পর।

নাদের রাজার সাহায্য গ্রহণ করেন। মহানাদে "জীয়চ-কুণ্ড" নামক একটী অলৌকিক সরোবর ছিল। তাহার জল স্পর্শ করিলে মৃত ব্যক্তি প্রাণ পাইত ও আহত ব্যক্তি সুস্থ হইত। ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। হিন্দু সৈন্য অটুট রহিল। আজ যাহারা হত বা আহত হইল, পরদিন তাহারা নবজীবন লাভ করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিল। মুসলমানেরা নিরুপায় হইয়া হতাশ হইয়া পড়িল। অবশেষে মুসলমান সেনাপতি "জীয়চ বা জীবন কুণ্ডের" অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনিয়া, একখণ্ড গোমাংস কুণ্ডে নিক্ষেপ করতঃ জল অপবিত্র করিয়া দিল। "জীয়চ কুণ্ডের" সঞ্জীবনী শক্তি এইরূপে নষ্ট হওয়ায়, মুসলমানেরা জয়ী হইল এবং পাণ্ডুয়া ও মহানাদ অধিকার করিল। (৩) চতুর্থ প্রবাদটি এই—মহানাদ গ্রামে যখন হিন্দু যোগী রাজগণ রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে দ্বারবাসিনী গ্রামে এক বৃদ্ধ মুসলমান দম্পতী বাস করিতেন। অপুত্রক থাকায় মুসলমান এই মানৎ করিয়াছিল যে, যদি পুত্র হয় তাহা হইলে আল্লার উদ্দেশে সে গরু কোরবাণী দিবে। পুত্র হইলে সে গরু কোরবাণী দিয়াছিল। একটা কুকুর এক খণ্ড অস্থি মুখে করিয়া বশিষ্ঠ-গঙ্গার কিনারায় আনিলে, বশিষ্ঠ-গঙ্গা হইতে ধূম নির্গত হইতে আরম্ভ হইল ও "রাম রাম" শব্দ জল মধ্যে শুনা গেল। রাজার নিকট সংবাদ পঁহুছিলে, তিনি জ্যোতিষ সাহায্যে ব্যাপার কি অবগত হইলেন। এই বশিষ্ঠ-গঙ্গা দেবগণের স্থাপিত এবং দেবগণ বাস করিতেন বলিয়া ইহার জলের সঞ্জীবনী-শক্তি ছিল—মৃত ব্যক্তি ইহার জল স্পর্শ করিলে প্রাণ পাইত। বশিষ্ঠ-গঙ্গার পূর্ব্বোক্ত অবস্থা শুনিয়া রাজা ক্রোধে অন্ধ হইলেন। তখন দেশে কেহ গোহত্যা

(১) The Travels of a Hindu by Bhola Nath Chander Vol, I. pp 141-145.

(২) Rev. J Long's article in the Calcutta Review,

(৩) Calcutta Asiatic Observer of 1824.

করিতে পারিত না। মুসলমান বাদশাহগণও গোহত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, গোধন রক্ষায় অনেক লাভ—কৃষিকার্য্যের জন্য, লোকের বিশেষতঃ শিশু, বৃদ্ধ ও রুগ্ন লোকের, প্রাণ রক্ষার জন্য গোদুগ্ধের বিশেষ প্রয়োজন। প্রচলিত বিধি অমান্য করিয়া আবার হিন্দুরাজ্য পবিত্র মহানাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে বিনা হুকুমে গোহত্যা করায় রাজা মুসলমান-দম্পতীর সমুচিত শাস্তি দিলেন। মুসলমানের শিশু সন্তানের প্রাণবধের আজ্ঞা প্রদত্ত হইল। মুসলমান-দম্পতী মৃত শিশুর শব লইয়া দিল্লী যাত্রা করিল। সেখানে বাদশাহের নিকট

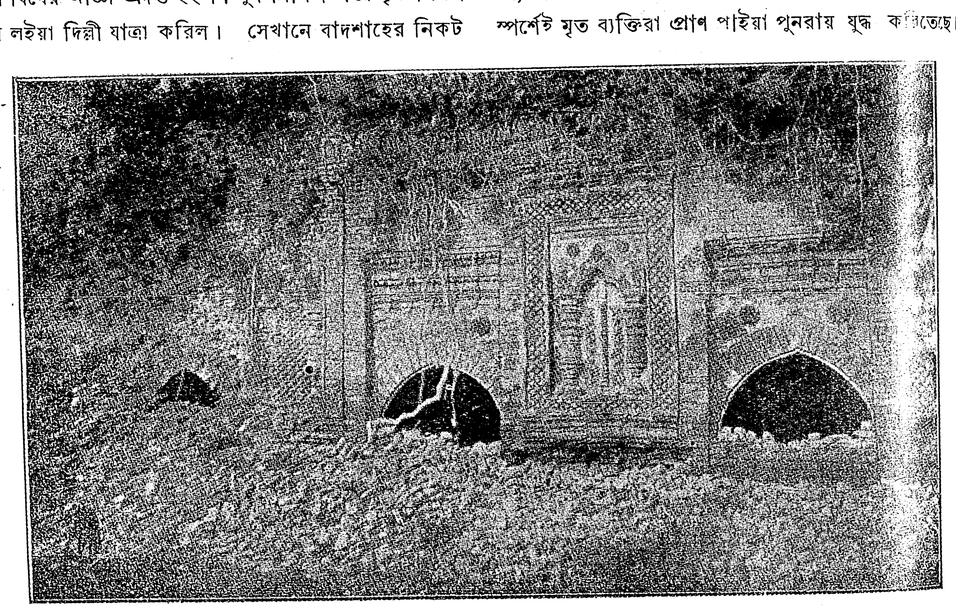

পাণ্ডুয়া মসজীদের ধ্বংসাবশেষ (১)

নালিশ হইল। বাদশাহ কিছু করিলেন না, বরং মুসলমানকেই দোষী সাব্যস্ত করিলেন। এই ঘটনার পর দিল্লীর বাহিরে আসিয়া মুসলমান-দম্পতী একদল ফকীরকে দেখিলেন এবং তাঁহাদের নিকট নালিশ করিলেন। ফকীর দলের কর্ত্তা পুনরায় বাদশাহের নিকট আবেদন করিলেন। অনেক বাদ-বিতণ্ডার পর এই স্থির হইল যে, ফকীরগণ ইচ্ছা করিলে মহানাদের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারে; কিন্তু সরকার হইতে কোন সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না। তখন ফকীরদল পাণ্ডুয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন ফকীর মালদহ জেলার বড় পাণ্ডুয়ার প্রধান পীরের অনুমতি আনিতে গেল। প্রধান পীর অনুমতি দিলেন এবং মহানাদের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য অর্থ ও সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মুসলমানেরা পাণ্ডুয়ায় শিবির স্থাপন করিয়া মহানাদের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মুসলমানদের বার বার পরাজয় হইল। মুসলমানেরা দেখিল যে, আজ যে হিন্দু সেনাপতি যুদ্ধে হত হইল, পরদিন সেই আবার যুদ্ধ করিতেছে। অনুসন্ধান দ্বারা বুঝিতে পারিল যে, বশিষ্ঠ-গঙ্গার সঞ্জীবনী-শক্তি যায় নাই; আর সেই জল স্পর্শেই মৃত ব্যক্তিরা প্রাণ পাইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিতেছে। তখন মালদহে আবার ফকীর প্রেরিত হইল। বড় পীর বলিলেন, যে-কোন উপায়ে বশিষ্ঠ-গঙ্গায় গোমাংস নিক্ষেপ করিতে হইবে, নতুবা কিছু হইবে না। এদিকে যে মুসলমান গোমাংস নিক্ষেপ করিতে যায়, সেই ধরা পড়িয়া শূলে যায়। তখন আবার মালদহে লোক গেল। পীর বলিলেন যে, ফকীরডাঙ্গার ফকীর সাহায্য না করিলে কিছুই হইবে না। সে কামরূপী—ইচ্ছা করিলে পশু পক্ষীর বেশ ধরিতে পারে, তাহার সাহায্য গ্রহণ কর। মগরা ও পাণ্ডুয়ার মধ্যস্থানে সের শাহের রাস্তার পাশে (এক্ষণে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড)

হয়েড়া গ্রামের পূর্ব্বদিকে 'ফকীর ডাঙ্গা' বলিয়া একটী স্থান আছে, সেইখানে তখন একজন ফকীর বাস করিতেন। পাণ্ডুয়ার ফকীর সম্প্রদায় সেই ফকীরকে গিয়া ধরিলেন। ফকীর অনেক সাধ্য সাধনার পর সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। বলিলেন "গোমাংস নিক্ষেপ করিব, কিন্তু তাহাতে আমার প্রাণ যাইবে। আমার দেহ যেখানে পতিত হইবে, সেইখানে তোমরা কবর দিবে। আমি পক্ষীরূপে পলাইবার চেষ্টা করিব।" যথা সময় ফকীর রাজমল্লিক যোগী বেশে, মস্তকের জটায় গোমাংস রাখিয়া, অতি গোপনে মন্ত্রবল

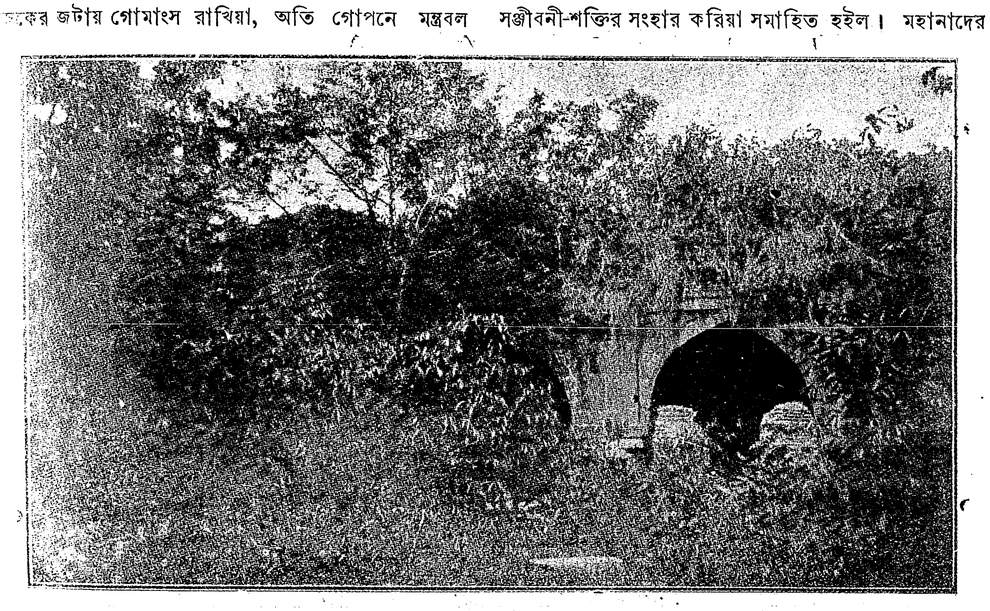

পাণ্ডুয়া মসজিদের ধ্বংসাবশেষ (২)

সাহায্যে গ্রামে প্রবেশ করিয়া বশিষ্ঠ-গঙ্গায় অবগাহন স্নান করিলেন। তৎক্ষণাৎ বশিষ্ঠ-গঙ্গা হইতে সূচীভেদ্য ধূম-স্তম্ভ উদ্গত হইল, 'রাম রাম' শব্দে দিক পূর্ণ হইল, আর ঘন ঘন ভূকম্প হইতে লাগিল। রাজা মুহূর্ত্ত মধ্যে গণক সাহায্যে ব্যাপার বুঝিয়া ভণ্ড যোগীকে সংহার করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। ফকীর বেগতিক দেখিয়া হাড়গিলা পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া আকাশে উড্ডীয়মান হইল। অমনি পক্ষীর উদ্দেশে শত ধনু হইতে তীর উৎক্ষিপ্ত হইল। পক্ষী শরবিদ্ধ হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ফকীর ডাঙ্গায় নিজ আবাস স্থানের পূর্ব্বদিকে পতিত হইল এবং সেই স্থানেই সমাহিত হইল। সেই কবর একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ পাদমূলে অবস্থিত, এবং ইষ্টক নির্ম্মিত ও একটী প্রকাণ্ড কুঠারীর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-সমন্বিত। শেরসাহ রাজবর্ত্মের অভিজ্ঞ পথিক অদ্যাপি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে ঐ স্থানকে "রাজমল্লিক তলা" বলিয়া ঘোষণা করে। স্থানটী মগরা ষ্টেশন হইতে প্রায় দুই ক্রোশ পশ্চিমে। এইরূপে ফকীর রাজমল্লিক স্বীয় দেহ সংহারের সহিত বশিষ্ঠ-গঙ্গার ও তৎসঙ্গে মহানাদের হিন্দু-রাজশক্তি-রূপ সঞ্জীবনী-শক্তির সংহার করিয়া সমাহিত হইল। মহানাদের হিন্দুরাজা সসৈন্যে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন ও মুসলমানের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। মুসলমানেরা মহানাদের লুণ্ঠন ও সর্ব্ব হত্যা কার্য্য তিন দিনে সম্পন্ন করিয়া, বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা জন্য ও ভবিষ্যৎ-বংশীয়গণকে সগর্ব্বে জানাইবার জন্য, পাণ্ডুয়ায় উচ্চ মন্দির ও বিজয়-বার-দোয়ারী প্রস্তুত করিল। তৎপরে ফকীরদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যে যেখানে পাইল চলিয়া গেল। হিন্দুরা কিন্তু এই প্রবাদ গল্প বলেন না, বা কেহ কেহ মাত্র বলেন। তাঁহাদের কথা এই—মহানাদের একজন পরম ধার্ম্মিক বিদেহ যোগীরাজ প্রত্যহ স্বীয় রাজ্য হইতে ৺বারাণসী ধামের

বিশ্বেশ্বরের মন্দির ও মা অন্নপূর্ণার মন্দির দর্শন করিবার জন্য বাসনা করিলে, সদাশিব মহাদেব বিশ্বকর্ম্মাকে ইঙ্গিত করেন। মহাদেবের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা এক রাত্রিতে পাণ্ডুয়ার মন্দির নির্ম্মাণ করেন। পাণ্ডুয়া রাজ্যের সন্নিকটে দ্বারবাসিনীতে এক সদ্‌গোপ রাজা বাস করিতেন। সেখানকার রাজা দ্বারপাল পাণ্ডুয়ার রাজাকে যুদ্ধে সাহায্য করেন। সেজন্য পাণ্ডুয়া-বিজয়ের পর সেনাপতি মহম্মদ আলীর অধীনে মুসলমান সেনা দ্বারবাসিনী আক্রমণ করে। দ্বারবাসিনীর "জীবৎ কুণ্ডে"র জীবন দানের শক্তি থাকায়, প্রথমে মুসলমানেরা যুদ্ধে সুবিধা করিতে পারে নাই। অবশেষে পীরসা জোকাইয়ের সাহায্যে গোমাংস নিক্ষেপ দ্বারা এ ক্ষেত্রেও "জীবৎকুণ্ডের" সঞ্জীবনী-শক্তি নষ্ট করিয়া মুসলমানগণ বিজয়ী হয়। পীর জোকাইয়ের সমাধি এখনও "জীবৎ কুণ্ড" সরোবরের সন্নিকটে আছে। শত্রু হস্তে নির্য্যাতিত হওয়ার আশঙ্কায় দ্বারপাল রাজ-বাটীতে অগ্নি সংযোগ করেন; এবং প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে সপরিবারে আত্মসমর্পণ করিয়া রাজবাটীর সহিত ভস্মীভূত হন। এখন সেই ভস্মস্তূপ "ধন পোতা" নামে পরিচিত।

রাঁশবেড়িয়া গড়বাটীর দুর্গাভ্যন্তরে সাত বিঘা ভূমি লইয়া পূর্ব্বোক্ত মত সঞ্জীবনী-শক্তি-সম্পন্ন একটী সুবৃহৎ সরোবর আছে; তাহার নাম "জীয়ন্তা সরোবর।" তাহার শক্তি এখন লুপ্ত হইয়া বহু কুম্ভীরের আবাস স্থান হইয়াছে।

পঞ্চম প্রবাদ মূলক গল্পটি এই—বখ্‌তিয়ার খিলিজি বঙ্গাধিকারের পর পাণ্ডুয়া অঞ্চলে মুসলমান উপনিবেশ স্থাপিত হয়। পাণ্ডুয়া ও মহানাদে একজন হিন্দু রাজা ছিলেন—উভয় গ্রামেই রাজবাটী ছিল। মুসলমান লেখকগণ তাঁহাকে পাণ্ডব রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পাণ্ডব রাজার পুত্রকে আরব্য ও পারস্য ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য একজন মুসলমান শিক্ষক নিযুক্ত হন। সেই শিক্ষকের পুত্রের ত্বকচ্ছেদ উপলক্ষে একটী ভোজে গোবধ করা হয়। রাজা রাজ্য অপবিত্র করণের জন্য মুসলমানের পুত্রকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং মুসলমানগণকে আজান ও অন্যান্য মহম্মদীয় ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন। রাজাজ্ঞায় ক্ষুব্ধ হইয়া মুসলমানগণ দিল্লীর সম্রাটের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করেন। দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় ফিরোজ সাহ পাণ্ডব রাজাকে শাসন ও

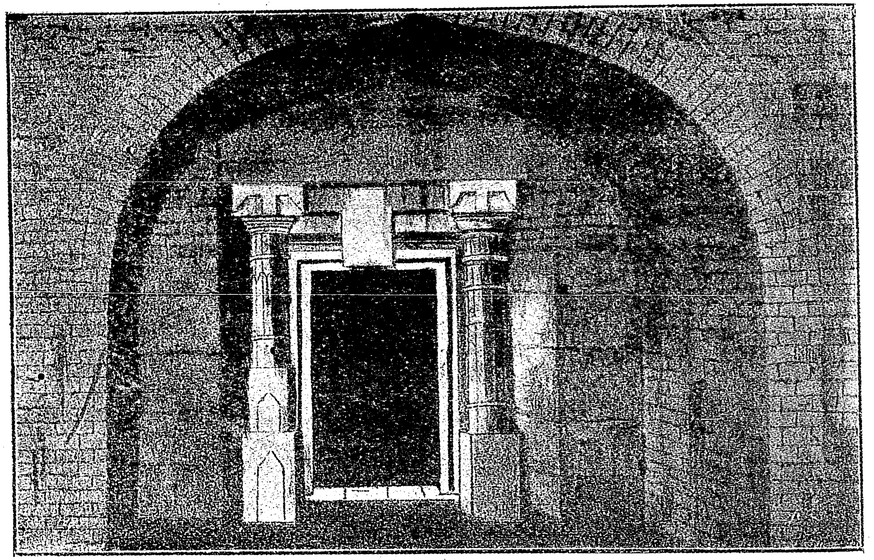

পাণ্ডুয়া বিজয় স্তম্ভের প্রবেশ-দ্বার (১৮৭০ খৃষ্টাব্দে গৃহীত ফটো)

মুসলমান ধর্ম্মানুষ্ঠান পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্য তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভাগিনেয় সাহ সুফী উদ্দীনের অধীনে একদল সেনা বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে তাঁহার সহকারী ছিলেন তাঁহার অন্যতম মাতুল—ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম বিজয়ী জাফর খাঁ গাজী ও বহরম্ সাক্কা। "সাক্কা" অর্থ ভীস্তী। তিনি যুদ্ধে পানীয় জল সরবরাহের কার্য্য করিয়া "সাক্কা" উপাধি পান। তাঁহার সমাধি বর্দ্ধমানে আছে, নাম "পীর বহরামের আস্তানা"। পাণ্ডব রাজা "জাৎ ময়দানের" যুদ্ধে পরাভূত হন এবং তাঁহার রাজবাটী মসজীদে পরিণত করা হয়। তাহাই "বাইশ-দরজা মসজীদ" নামে পরিচিত। সৈন্যগণের মধ্যে সৈয়দ বংশীয় একদল সেনা ছিল; তাহারা

পাণ্ডুয়া ফাত্ খাঁ সুরের মসজীদের শিলালিপি

যুদ্ধে অসীম বীরত্ব দেখাইয়াছিল। আর একদল ফকীর সৈন্য ছিল,—তাহারা ধর্ম্মরক্ষার্থ যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল। তাহাদের দলের কর্ত্তা ছিলেন প্রসিদ্ধ মুসলমান পীর মইনুদ্দীন চিশ্‌তির প্রধান শিষ্য সেখ শারাফুদ্দীন বু আলি কালান্দার। তিনি পাণিপথ কর্ণালে ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তিনি এই ধর্ম্মযুদ্ধে আল্লার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ফকীর সৈন্যকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া রেল ষ্টেশনের দক্ষিণে লস্কর-ডাঙ্গা হইতে নমাজ-ডাঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমতল ভূমি যুদ্ধক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া থানার সন্নিকটে গঞ্জি-ই-শাহিদানে স্বধর্ম্মার্থ প্রাণ-বিসর্জ্জনকারী মুসলমানগণ সমাহিত আছেন। এই ধর্ম্মযুদ্ধে মুসলমান পক্ষের হতাহতের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হয় নাই। তাহাদের মধ্যে সাহ সুফীর অনেক বন্ধু ও শিষ্য ছিল। পরবর্ত্তী কালে তাহারা পীর পদবীতে উন্নীত হইয়াছে। পাণ্ডুয়ার দক্ষিণে লস্কর-ডাঙ্গায় গুল বিহিশ্‌টী মানুয়ারের আস্তানা আছে। একজন ফকীর তাহার তত্ত্বাবধারণ করেন। যুদ্ধে তাঁহার দেহ খণ্ডবিখণ্ডিত হইয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার শব-দেহ-খণ্ডগুলি স্বর্গীয় পুষ্পে আবৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। সে সময় তাঁহাকে ডাকিবামাত্র তিনি উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি "স্বর্গ-কুসুমে সুশোভিত পীর" নামে পরিচিত। পল্লীর উত্তরাংশে ফকীর দরিয়া গাজীর সমাধি আছে। সেনাপতি সাহ সুফীর দুগ্ধ সরবরাহকারী নগরগুরু যুদ্ধক্ষেত্রে মস্তকে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করে। নগর-গুরু হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইলেও বিধর্ম্মী পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। মৃতের মস্তকের ক্ষতস্থান শীতল রাখিবার জন্য তাহার সমাধিতে দুগ্ধ ঢালিবার ব্যবস্থা আছে। পাণ্ডুয়ার হিন্দু অধিবাসীগণ বিজয়ী সেনার হস্তে নিগৃহীত হইবার আশঙ্কায় দেশত্যাগী হইয়া অন্যত্র বাস করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের ত্যক্ত গৃহাদিতে মুসলমান সৈন্যগণ বাস করিতে লাগিল। তদবধি পাণ্ডুয়া হুগলী জেলার মধ্যে মুসলমান-প্রধান স্থান হইয়াছে। কাহারও মতে পাণ্ডুয়া ও মহানাদে দুইজন পৃথক রাজা ছিলেন—আপদে বিপদে পরস্পরের সাহায্য করিতেন।

বখ্‌তিয়ার খিলিজির নবদ্বীপ বিজয়ের এক শতাব্দী পরে পাণ্ডুয়া মুসলমান অধিকারে আসে। এ সম্বন্ধেও নানা মত-ভেদ আছে। ত্রিবেণী মসজীদে সংরক্ষিত একখানি কুর্শিনামা আছে। তাহা হইতে জানা যায়, চাকলা মুকসুদাবাদ পরগণা কোনওয়ার পর্ত্তুপের অন্তর্গত বর্ত্তমান বীরভূম জেলার রামপুরহাটের দুই ক্রোশ পূর্ব্বদিকে মান্দগ্রাম নামক এক বর্দ্ধিষ্ণু পল্লীতে জাফর খাঁ গাজী বাস করিতেন। তাঁহার ভাগিনেয় সাহ সুফী উদ্দীনও তাঁহার সহিত বাস করিতেন। সাহ সুফী বারখুরদারের পুত্র ও দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ সাহেরও ভাগিনেয় ছিলেন। জাফর খাঁ ও সাহ সুফী হিন্দুরাজ্য বিধ্বংস ও ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার ও সংরক্ষণ মানসে সপ্তগ্রাম ও পাণ্ডুয়া প্রদেশে

আগমন করেন। ত্রিবেণীর শিলালিপিতে প্রকাশ, জাফর খাঁর প্রতিষ্ঠিত ত্রিবেণী মসজীদ ৬৯৮ হিজরা বা ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে ও মাদ্রাসা ৭১৩ হিজরা বা ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। সে সময় বঙ্গদেশে সুলতান সামসুদ্দীন আবুল মুজাফার ফিরোজ সাহ রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজত্বকাল ৭০২—৭১৮ হিজরা বা ১৩০২—১৩১৮ খৃষ্টাব্দ। পাণ্ডুয়ার প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বের আয়মা সংক্রান্ত একখানি দলিল আছে। খাদিম ও মাতোয়ালীগণের মধ্যে আস্তানা পরিচালন সম্বন্ধে আদালতে এক মামলা হয়। তাহাতে

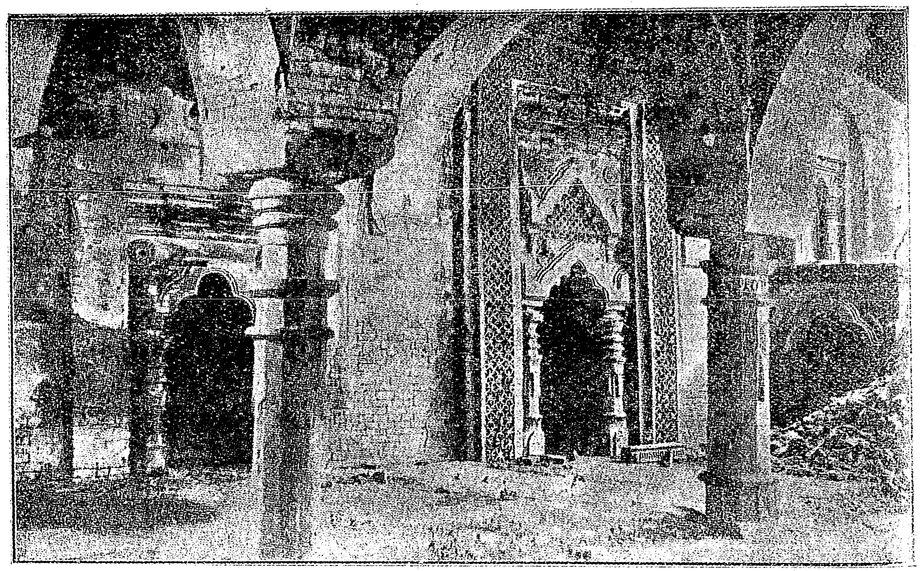

পাণ্ডুয়ার—"বাইশ দরজা" মসজীদ

সম্রাট ফিরোজ সাহ প্রদত্ত সনন্দ প্রমাণ স্বরূপ দাখিল করা হয়। সনন্দখানি দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই; নতুবা তাহা হইতে সম্ভবতঃ পাণ্ডুয়া-বিজয়ের কাল নির্ণয় করিবার সুবিধা হইত। দিল্লীতে তিন ফিরোজ সাহ রাজত্ব করেন। প্রথম ফিরোজ সাহ ১১৩৬ খৃষ্টাব্দে ও দ্বিতীয় জালালুদ্দীন খিলিজি ফিরোজ সাহ ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। শেষ ফিরোজ সাহের রাজত্ব-কাল ১৩৫১—১৩৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতেছে। পাণিপথের বিখ্যাত ফকীর শা বু আলি কালান্দার ৭২৪ হিজরা বা ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তিনি দ্বিতীয় ফিরোজ সাহের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পাণ্ডুয়া অভিযানে ফকীর-সৈন্য প্রেরণ করিয়া থাকিলে, ১৩২৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সম্রাট দ্বিতীয় ফিরোজ সাহের রাজত্বকালে পাণ্ডুয়া বিজয় হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। ত্রিবেণীর শিলালিপি ও কুর্শীনামা ও পাণ্ডুয়ার আয়মা সংক্রান্ত দলিলেও এই মতের সমর্থন করিতেছে। ভিন্ন মতবাদীরা কিন্তু সপ্তগ্রাম বিজয়ের প্রায় দুই শত বৎসর পরে ১৪৭৭—৭৮ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়া-বিজয়ের কাল নির্ণয় করেন (৪)।

প্রত্নতত্ত্ব হিসাবে পাণ্ডুয়া হুগলী জেলার মধ্যে একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান। বহু প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডুয়া মিনার বা বিজয়-স্তম্ভ বা "পেঁড়োর মন্দির", দুইটী মসজীদ, একটী সমাধি এবং দুইটি সুবৃহৎ সরোবর এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান। বিজয়-স্তম্ভটি গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দুই শত হস্ত দূরে পূর্ব্বদিকে

(৪) সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা সন ১২১৫ সাল ৩১ পৃঃ ও Bengal Past and Present Vol XIV. Part 1. P. 113 footnote

অবস্থিত। স্তম্ভটি গোলাকৃতি, উচ্চে পাঁচ তল পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। নিম্ন তলের ব্যাস ৬০ ফুট; কিন্তু তাহা ক্রমশঃ সরু হইয়া সর্ব্বোচ্চে ১৫ ফুট দাঁড়াইয়াছে। বহির্ভাগে স্তম্ভের পৃষ্ঠনালী কুজাকার। দেওয়ালের অভ্যন্তর ভাগ কাচবৎ মসৃণ মিনা করা ছিল। স্তম্ভের মধ্যভাগ গোলাকার;

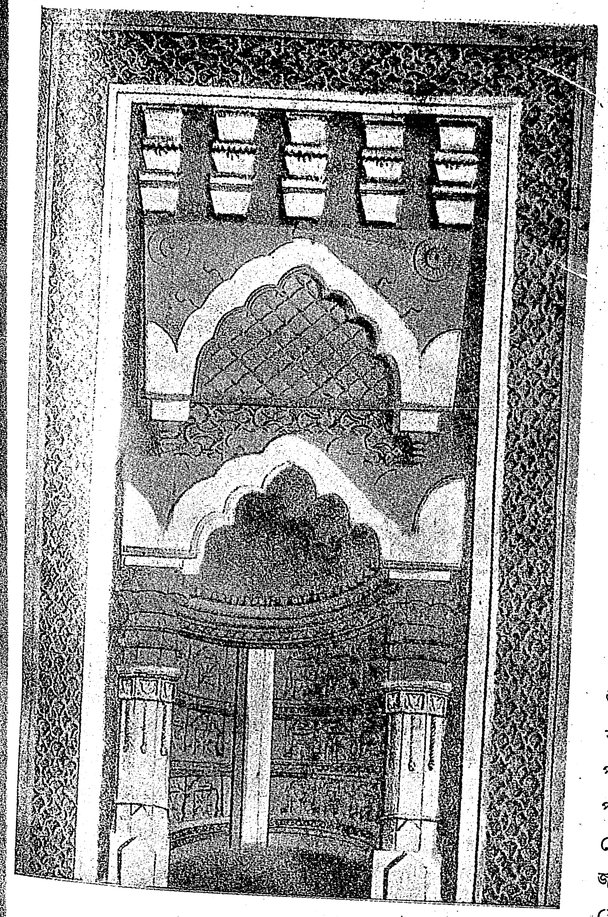

পাণ্ডুয়া মসজীদের অভ্যন্তরস্থ কুলুঙ্গী

সোপান-শ্রেণী ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়াছে। প্রত্যেক তল সংলগ্ন একটী করিয়া দ্বার আছে—তাহা দিয়া স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে অপরিসর চাতালে যাওয়া যায়। চূড়া সমেত স্তম্ভটি ১২৫ ফুট উচ্চ ছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ভূকম্পে সর্ব্বোচ্চ অংশ চূড়া সমেত ভাঙ্গিয়া পড়ে। সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী ও পাণ্ডুয়া মসজীদ ও বিজয়-স্তম্ভের সংস্কারের জন্য আমি বড়লাট লর্ড কার্জ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। হুগলীর তদানীন্তন সহৃদয় ম্যাজিষ্ট্রেট আমার পরম বন্ধু টমাস ইংলিস সাহেব (T. Inglis I.C.S.) আমার প্রস্তাব আন্তরিক ভাবে সমর্থন করেন। তাহার পর সেগুলি Ancient Monuments Preservation Act অনুযায়ী Protected Monuments তালিকাভুক্ত ও পূর্ত্তবিভাগ কর্ত্তৃক সংস্কৃত হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বিজয়-স্তম্ভের সংস্কার-কার্য্য শেষ হয়। প্রায় ২০ ফুট উচ্চ পঞ্চম তলাটি, গম্বুজ ও চূড়া পুনর্গঠিত করা হয়। সংস্কারান্তে স্তম্ভটি উচ্চতায় ১২৭ ফুট দাঁড়াইয়াছে। দেওয়াল-গুলি নূতন, বালির কাজ করিয়া কলি ফেরান হইয়াছে। বহিঃ-প্রাচীরের রন্ধ্রপথগুলি পরিষ্কৃত এবং অভ্যন্তরের সোপান-শ্রেণী নবগঠিত হইয়া স্তম্ভ অধিরোহণ সহজ-সাধ্য হইয়াছে। সংস্কারের পূর্ব্বে স্তম্ভের অভ্যন্তর ভাগ বাদুড়ের আরাম-স্থান হইয়াছিল। ক্ষুদ্র গবাক্ষের স্বল্পালোকে সোপানের গভীর অন্ধকার নাশ করিতে পারিত না। অন্ধকারে ভগ্ন সোপান দিয়া একরূপ হামাগুড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হইত। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে এক মেলার সময় ভগ্ন সোপান দিয়া বহু লোক উঠা নামা করিতেছিল। একটি লোক উপর হইতে পদস্খলিত হইয়া কয়েকজন লোকের উপর পড়ে; তাহারাও পদস্খলিত হয়। এইরূপে সেদিন লোকের চাপে স্তম্ভের অভ্যন্তরে ৭০ জন লোক মানবলীলা সম্বরণ করে। এই স্তম্ভে কোনও খোদিত লিপি সংযুক্ত নাই। ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তা কে ছিলেন—তিনি কবে কি উদ্দেশ্যে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই। মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে, স্তম্ভচূড়া হইতে ইসলামধর্ম্ম বিশ্বাসীগণকে প্রার্থনায় আহ্বান জন্য ইহা মুয়াজ্জিন্-স্তম্ভ। কেহ বলেন, পাণ্ডুয়ার হিন্দুরাজাকে পরাভূত

করিয়া সেনাপতি সাহ স্থফী উদ্দীন স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ এই বিজয়-স্তম্ভ গঠন করেন। আবার হিন্দুরা কহেন যে, স্তম্ভটি দেব-মন্দির ছিল—হিন্দু রাজা নির্ম্মাণ করেন। তিনি সূর্য্যোপাসক ছিলেন। তিনি মন্দির-চূড়া হইতে বাল-সূর্য্য দর্শন ও তাহার উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিতেন। আবার কেহ বলেন, তাঁহার একমাত্র কন্যা প্রত্যহ প্রত্যূষে গঙ্গা দর্শনের অভিলাষ করায়, সেই উদ্দেশ্যে মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়। জাত্ময়দানের যুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া সাহ স্থফী সেই মন্দির-চূড়ার উপর তুর্কীর অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বিজয়-কেতন উড্ডীন করেন। তদবধি উহা বিজয়-স্তম্ভ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এখনও সাধারণ লোকে উহাঁকে "পেঁড়োর মন্দির" বলিয়া থাকে। "পেঁড়ো" পাণ্ডুয়ার অপভ্রংশ। ভারতের নানা স্থানে এইরূপ স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। গৌড়ের ফিরোজা মিনারও পাঁচতল। তাহার নিম্নের ব্যাস ২০ ফুট এবং উচ্চতায় ৯০ ফুট। পুরাতন মালদহের অপর দিকে মহানন্দা নদীর পশ্চিমে মিনা-সরাইয়ে এইরূপ একটী স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ আছে। তাহার নিম্নের ব্যাস ও উচ্চতা উপরিউক্ত স্তম্ভের মত। দিল্লীর কুতব্ মিনারের নিম্নের ব্যাস ৪৭½ ফুট এবং উচ্চতা স্তম্ভের অগ্রভাগ বাদ দিয়া ২৩৮ ফুট।

এই স্তম্ভ হইতে ১৭৫ ফুট পশ্চিমে দ্বাবিংশতি দ্বার-সংযুক্ত "বাইশ দরজা-ওয়ালী মসজিদ" নামে এক মসজীদের ভগ্নাবশেষ আছে। মসজীদটি লম্বাকৃতি; অভ্যন্তর-ভাগের উচ্চতা অপেক্ষাকৃত কম। ছাদ এখন পড়িয়া গিয়াছে। তাহাতে অনেকগুলি অনুচ্চ গম্বুজ ছিল। ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও ৬০টী গম্বুজ ছিল। ২২টী করিয়া দুই সারি ৬ ফুট উচ্চ স্তম্ভোপরি খিলানের উপর ছাদ ছিল। স্তম্ভগুলি দৃঢ় কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরে নির্ম্মিত। তাহার মধ্যে অর্দ্ধেক স্তম্ভ-দণ্ড পুষ্পহারে দোদুল্যমান ঘণ্টা সংযুক্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ আদর্শে গঠিত। মসজীদ-প্রাচীর এবং খিলানগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈষৎ লোহিত বর্ণের ইষ্টকে গ্রথিত। পশ্চিমদিকে ভিতরের-প্রাচীর গাত্রে অনেকগুলি বিচিত্র খর্ব্বাকার কুলুঙ্গী আছে। কুলুঙ্গীগুলিতে চারিস্তর খিলান আছে। খিলানগুলির নিম্নদেশ হীরক নক্সার আদর্শে উপরি বুননের মত জালের কাজের উপর একটী করিয়া প্রস্ফুটিত কৃত্রিম গোলাপে সুচারু রূপে শোভিত। মসজীদের উত্তর-

পাণ্ডুয়া মসজীদে বৌদ্ধ ঘণ্টা সংযুক্ত কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভ।

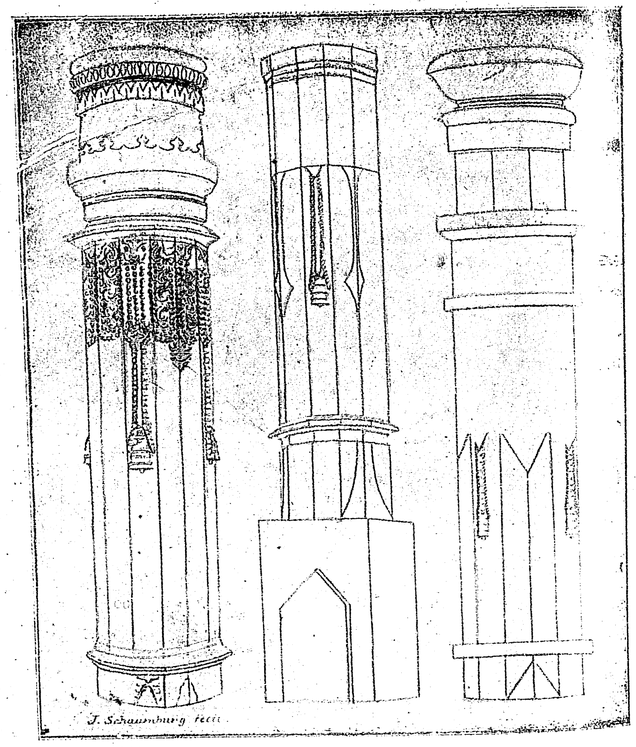

পশ্চিম কোণে দৃঢ়-গাঁথনী উচ্চ বেদী আছে। বেদীটি দেখিলে মনে হয়, যেন এই বেদীর উপর হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি বিরাজ করিত। বেদীর উপরিভাগে একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আছে। কথিত আছে, সাহ স্থফী ইহা "চিল্লাখানা" বা চল্লিশ দিবস নির্জ্জন তপস্যার স্থান রূপে ব্যবহার করিতেন। কতকগুলি দৃঢ় কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর নির্ম্মিত অসম্পূর্ণ লম্বা স্তম্ভ মসজীদের নিকট ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত

রহিয়াছে। কৃষ্ণ প্রস্তরগুলি সম্ভবতঃ গো-যানে রাজমহল পর্ব্বত হইতে আনীত হইয়াছিল। পূর্ত্ত বিভাগ ধ্বংসাবশেষের স্থানগুলি পরিষ্কৃত করিয়াছেন; কিন্তু মসজীদ-সংস্কারের ব্যবস্থা এখনও করেন নাই। এই সুবৃহৎ মসজীদ-সংস্কার বহু অর্থ-সাপেক্ষ। সম্ভবতঃ অর্থ-কৃচ্ছ্রতার জন্য গবর্ণমেন্ট এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই।

পাণ্ডুয়ার-বিজয় স্তম্ভের দক্ষিণে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের অপর দিকে সাহ স্থফী উদ্দীনের আস্তানা বা সমাধি-স্থান আছে। আস্তানাটি মুসলমানেরা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সুসংস্কৃত অবস্থায় রাখিয়াছে। এই আস্তানা সংক্রান্ত কোনও শিলালিপি নাই। ইহার সন্নিকটে মধ্যে মধ্যে মেলা

পাণ্ডুয়া মিনার

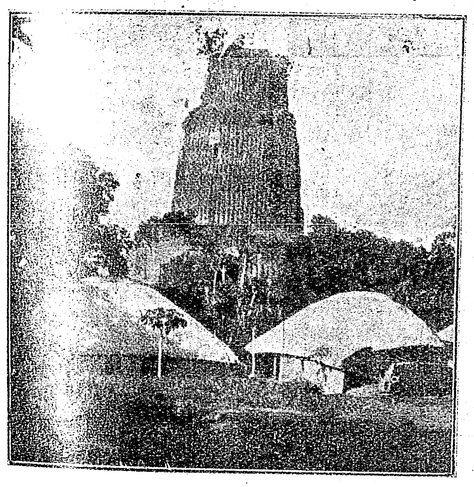

বসিয়া থাকে। সে সময় বহু লোক সমবেত হয় এবং অভীষ্ট সিদ্ধির আশায় অনেকে মানসিক পূজা দিয়া থাকে।

এই সমাধির পশ্চিমে "কেঠরিয়া মসজীদ" বা "মতী মসজীদ" নামে আর একটী মসজীদের ভগ্নস্তূপ আছে। ভগ্নস্তূপ হইতে হিন্দুদের মন্দিরের নিদর্শনসমূহ বাহির হইয়া পড়িয়া আছে। এখন বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে, হিন্দুদের মন্দিরের মাল-মশলা লইয়াই এই মসজীদটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাচীর-গাত্র কতক হিন্দু ও কতক মুসলমান আদর্শে সুশোভিত। মসজীদের অভ্যন্তরে একখানি কৃষ্ণ প্রস্তরের উপর খোদিত লিপি আছে; তাহা বড় টোগরা অক্ষরে আরব ভাষায় অঙ্কিত। তাহাতে কোরান হইতে মহম্মদের আশীর্ব্বচন "আয়াতুন কুর্শি" বা সিংহাসন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ৮৮২ হিজরায় ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে উস্থফ শাহের রাজত্বকালে এই মসজীদটি নির্ম্মিত হয়। সাহ স্থফীর আস্তানায় তিনখানি প্রস্তরখণ্ডের উপর খোদিত লিপি আছে। তাহা টোগরা অক্ষরে লিখিত থাকিলেও, ইহার বহু পূর্ব্বের অঙ্কিত ত্রিবেণীর শিলালিপির সহিত ইহার পার্থক্য দেখা যায়। ইহাতে আকবরের সময়ের নাস্তালিক অক্ষরের মত অনেকগুলি গোল রেখার বাহুল্য আছে। একখানি শিলালিপিতে প্রকাশ, ১২৭৬

পেঁড়োর মন্দির

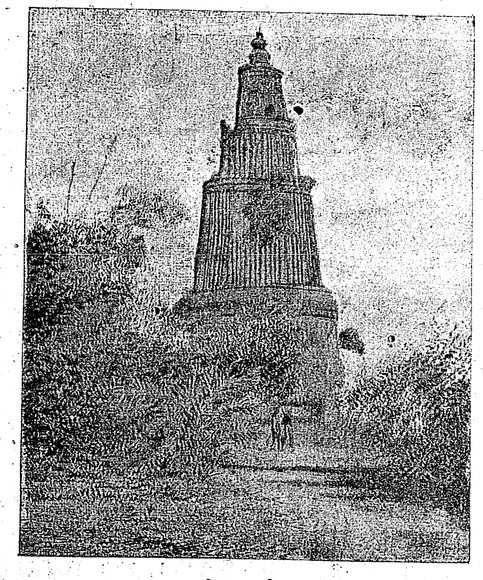

হিজরা বা ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে লালকুমার নাথ নামক জনৈক হিন্দু মসজীদটি সংস্কার করিয়া দেন। ইহাতে অনুমিত হয়, দরগাটি হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। মতী মসজীদের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে সাহ স্থফীর কুস্তী-শিক্ষক পালোয়ান মাকমদুম নূরের সমাধি আছে। আর দক্ষিণদিকে "হুজরা" বা সাহ স্থফীর নির্জ্জন আশ্রম ছিল; তাহার চিহ্ন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আস্তানায় রক্ষিত একখানি শিলালিপি লইয়া বড় গোল হইয়াছে। কাহারও মতে সেখানি কোরিয়া বা মতী মসজীদ সংক্রান্ত; আবার

কেহ কেহ তাহা "বাইশ দরজা" বড় মসজীদ সংক্রান্ত বলিয়া দ্বন্দ্ব বাধাইয়াছেন। শেষোক্ত মতাবলম্বী লেখক এই শিলা-লিপি হইতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বড় মসজীদটী ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। বিজয়-স্তম্ভও তাহার সম-সাময়িক অনুমান করিয়া তিনি, পাণ্ডুয়া-বিজয় ঐ সময় হইয়াছিল, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। শিলালিপিতে লিখিত আছে—(ভাবার্থ) সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর বলিয়াছেন—মসজীদ সকল প্রকৃতই ঈশ্বরের। অতএব তোমরা ঈশ্বরের সহিত অন্য কাহাকেও আহ্বান করিবে না এবং তিনি (মহম্মদ) বলিয়াছেন (যাঁহার উপর শান্তি বর্ষিত হউক) যিনি পৃথিবীতে একটী

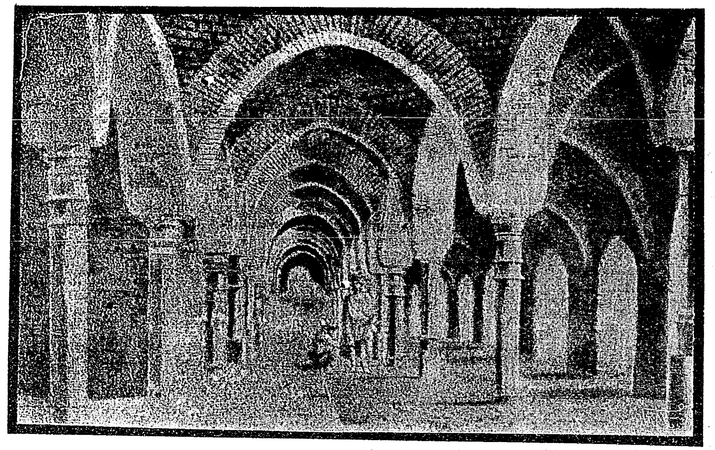

পাণ্ডুয়া মসজীদের অভ্যন্তর

মসজীদ নির্ম্মাণ করিবেন, ঈশ্বর পরলোকে তাঁহার জন্য সত্তরটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিবেন। ৮৮২ হিজরার প্রথমে মহরম মাসের চতুর্থ দিবসে (বুধবারে) সুলতান মামুদ শাহের পৌত্র, সুলতান বারবক শাহের পুত্র, প্রতি-শোধকারীর বলে বলীয়ান্ সাক্ষ্য ও প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের খালিফা, ধর্ম্ম ও পৃথ্বীর সূর্য্য স্বরূপ বিজয়ী সুলতান সামসুদ্দন্য ওয়াদ্দীন্ আবুল মোজাফার য়ুসুফ শাহের রাজত্ব-কালে (ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য ও রাজত্ব স্থায়ী রাখুন) অসি ও লেখনীর অধিপতি, কালচক্র ও যুগান্তের পালাভি উলুগ্ মজ্লিস্ই আজাম্ (সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর ইহলোকে ও পরলোকে তাঁহাকে নিরাপদে রাখুন) কর্ত্তৃক এই বৃহৎ এবং ধন্য মজলিস্ উল মজলিস্ মসজীদ নির্ম্মিত হয়।"

উপরিউক্ত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, সুলতান য়ুসুফ্ শাহের সামরিক অধ্যক্ষ এবং নাগরিক শাসনকর্ত্তা উলুগ্ মজ্লিস্ই আজাম এই মসজীদটি নির্ম্মাণ করেন। য়ুসুফ্ বিদ্বান ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি গৌড়ে দুইটি সুন্দর মসজীদ নির্ম্মাণ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। য়ুসুফ্ সাহ ৮৭৯ হইতে ৮৮৬ হিজরা বা ১৪৭৪—১৪৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাত বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তাঁহার পিতা রুকুনদ্দীন বারবক শাহ ৮৬৪—৮৭৯ হিজরা বা ১৪৫৯—১৪৭৪ খৃষ্টাব্দ ও তাঁহার পিতামহ নাসিরুদ্দীন আবুল মোজাফার মামুদ শাহ ৮৪৬—৮৬৪ হিজরা বা ১৪৪২—১৪৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। উপরিউক্ত মসজীদ নির্ম্মাণের সময় ৮৮২ হিজরা বা ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দ। সে সময় দিল্লীর সম্রাট ছিলেন লোদী বংশের বালোল লোদী।

কুতুব মহল্লায় মিরপুরে (গভরপুর) কুতুব সাহিব মস-জীদ নামে আর একটী মসজীদ আছে। পারস্য ভাষায় অঙ্কিত একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ১১৪০ হিজরাতে (১৭২৭—২৮ খৃষ্টাব্দ) সম্রাট মহম্মদ শাহের রাজ-ত্বের নবম বর্ষে ফতে খাঁ সুর নামক পাঠান কর্ত্তৃক এই মসজীদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কুতুব শাহের নামে কুতুব মহল্লার নামকরণ হইয়াছে। মসজীদের সম্মুখ ভাগে কুতুব শাহ এবং তাঁহার বন্ধু গুমা মিয়া সমাহিত আছেন। তাহা এখন জঙ্গলাবৃত। কুতুব সাহিব ও মেদিনীপুরনিবাসী দেওয়ান রাজী বা চন্দন সাহিদ ভাগলপুরের মৌলানা সাহ বাজ বা বলন্দ পারওয়াজের শিষ্য ছিলেন। এই মসজীদের শিলালিপিতে লিখিত আছে—

"পরদুঃখকাতর এবং দয়ালু ঈশ্বরের নাম গ্রহণ কর। ঈশ্বর ভিন্ন আর কোনও দেবতা নাই। মহম্মদ ঈশ্বরের দূত

পাণ্ডুয়া কোরিয়া বা সতী মসজীদের শিলালিপি—১৪৭৭ খৃঃ

মহম্মদ সাহ গাজীর রাজত্বকালে যাঁহার সৈন্য ঈশ্বরের সহায়তা লাভ করে ও আশীর্ব্বাদ ভাজন

সুজা আফগানের পুত্র সুর উপাধি বিশিষ্ট ফাত্ খাঁ ঈশ্বরের সাহায্যে যিনি পরিচালিত হইয়াছিলেন

পাণ্ডুয়াতে এমন সুন্দর মস্‌জীদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহার পবিত্রতায় সূর্য্যও তেজোময় হইয়াছিল

পাত সাহী জুলুসের নবম বর্ষে এই রম্য গৃহ জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছিল

আজাদ বলিয়াছেন হিজরী পঞ্জিকা মতে কি সুন্দর তারিখ দ্বিতীয় কাবার ন্যায় কি মনোহর মসজীদ নির্ম্মিত হইয়াছে।"

সাহ সুফীকে কেহ সাহ সুফী সুলতান কেহ পির সাফী, আবার কেহ সাফী উদ্দীন—এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন। কেহ বলেন, সাহ সুফী বিজয়ী সেনার সহিত ধর্ম্মগুরু রূপে আসিয়াছিলেন এবং সৈন্যাধ্যক্ষ অপর কোনও ব্যক্তি ছিলেন।

সাহ সুফীর সমাধির দক্ষিণে "রৌজা পুকুর" নামক পুষ্করিণী এবং পীরের নামে উৎসর্গীকৃত "পীর পুকুর" নামে একটী সুন্দর সরোবর আছে। শেষোক্তটি ৪০ ফুট গভীর। ইহাতে দুইটি বড় কুম্ভীর ছিল; তাহাদিগকে "আলে খাঁ ফতে খাঁ" বলিয়া ডাকিবামাত্র পুষ্করিণীর পাড়ে আসিয়া

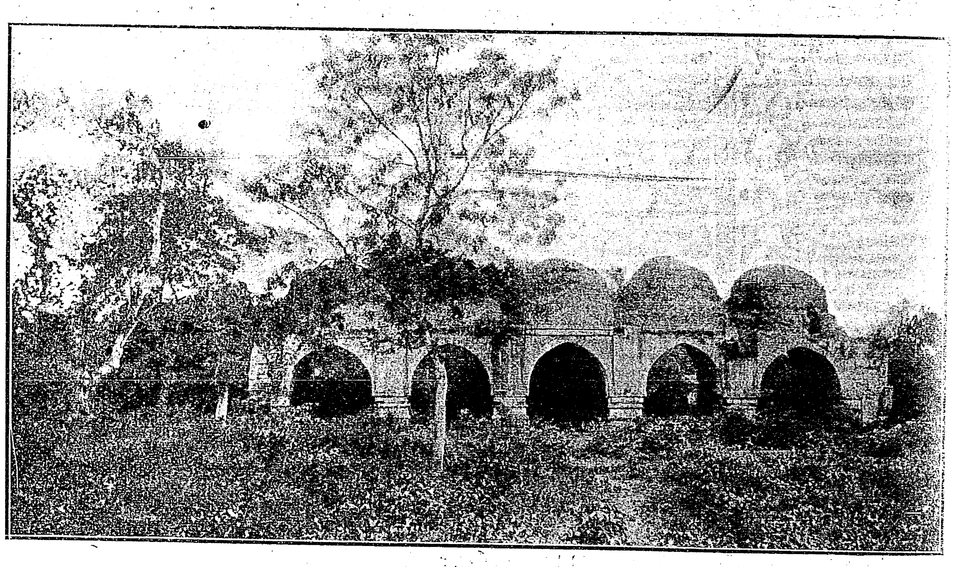

জাফর খাঁ গাজীর ত্রিবেণী মস্‌জীদ—১২৯৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত

খাদিমেরা সাহ সুফীর আস্তানার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। বর্দ্ধমান জেলার চৌঘরিয়ার মোল্লা সাহেবেরা বড় মসজীদের মাতোয়ালী। সেই মোল্লা বংশের মোল্লা হামিদ উল্লা খাঁ বাহাদুর বঙ্গদেশে কাজী উল্ কর্জ্জতের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঠাগারে বহু আরব্য ভাষার হস্তলিখিত পুস্তক সংগৃহীত ছিল।

পাণ্ডুয়া বিজয়-স্তম্ভে একটী লৌহ-দণ্ড রক্ষিত হইয়াছে। প্রবাদ, সেই লৌহ-দণ্ডটি সাহ সুফী যষ্ঠী রূপে ভ্রমণকালে ব্যবহার করিতেন।

উপস্থিত হইত। এখন একটী কুম্ভীর আছে। আস্তানার ফকীর "কাফের খাঁ মিয়া" বা কেবল "মিয়া" বলিয়া ডাকিলে জল হইতে উঠিয়া আসে। মানসিক পূজা দিবার জন্য নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানগণ এখানে মুরগী বলি দিয়া থাকে।

পাণ্ডুয়ার পূর্ব্ব গৌরব লোপ পাইলেও, ইহা এখনও একটী বর্দ্ধিষ্ণু পল্লীগ্রাম। ইহা হুগলীর সন্নিকট কেওটা হইতে ১৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে সাবেক বাদসাহী রাস্তা বর্ত্তমান গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান

রেলওয়ের পাণ্ডুয়ায় একটী ষ্টেশন আছে। এখানে একটী থানা, ইউনিয়ান কমিটি, ডাকঘর, সব্ রেজিষ্টারী আফিস ও রেল ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে পূর্ত্ত বিভাগের একটী বাংলা আছে। হুগলী জেলার মধ্যে এখানে সুন্নী মুসলমানগণের আধিক্য দেখা যায়। এখানে মুসলমান অধিবাসিগণের মধ্যে আশরফ্ বা সম্ভ্রান্ত বংশের অনেক ঘর আয়মাদার আছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মুসলমান রাজত্বকালে রাজ-কার্য্যে কৃতিত্বের জন্য বহু নিষ্কর ভূমি আয়মা স্বরূপ পাইয়াছিলেন। পাণ্ডুয়া-বিজয়ের পর সৈনিক বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারীরা পাণ্ডুয়ায় বাস করেন। এই আশরফ্ বংশ তাঁহাদেরই বংশধর। ইংরাজ রাজত্বের প্রথম আমলে বিচার-আচারের জন্য প্রধানতঃ ইহাদের মধ্য হইতে কাজী নিযুক্ত করা হইত। প্রধান কাজীর পদ (কাজী অল্ কজ্জৎ) একটী বংশে একচেটিয়া ছিল। বংশ-পরম্পরায় তাঁহাদিগকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হইত। এই বংশের শেষ প্রধান কাজী ছিলেন—কাজী মহম্মদ মোজাহার। ইঁহাদের মত্ হইতে মুফ্‌তি, সদর আমিন আলাও নিযুক্ত করা হইত। এখানে ১লা মাঘ ও ১লা বৈশাখ দুইটি বড় মেলা হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত মেলার দিন অন্যূন দশ সহস্র লোক সমবেত হয়; তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান। বহু পূর্ব্বে দামোদর নদ পাণ্ডুয়ার প্রান্তদেশ বিধৌত করিত এবং অনতি দূরে গঙ্গার সহিত যুক্ত ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ নদীর গতি পশ্চিমে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে—এখন তাহার যে খাদ আছে, তাহা কশাই নদী নামে পরিচিত। তাহাও মৃত নদীর সামিল হইয়াছে। পাণ্ডুয়া রাজধানীর চতুর্দ্দিকে পাঁচ মাইল পরিধি লইয়া পরিখা ও প্রাচীর ছিল। তাহার চিহ্ন এখন প্রায় লুপ্ত হইয়াছে—৬০ বৎসর পূর্ব্বের মানচিত্রেও তাহা অঙ্কিত ছিল। পূর্ব্বে এখানে বহু লোকের বাস ছিল। কিন্তু কাল ম্যালেরিয়ায় ইহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে এখানে "বর্দ্ধমান জ্বর" বা ম্যালেরিয়ার প্রথম আবির্ভাব হয়। দশ বৎসরের মধ্যে স্থানটি উৎসন্ন যায়। ৬৯৬১ জন অধিবাসীর মধ্যে ৫২২২ জন লোক এই জ্বরাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। প্রাচীন সপ্তগ্রামের ন্যায় এখানেও কাগজ প্রস্তুত হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও অন্যান্য জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটরা হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাঁহাদের ব্যবহারার্থ পাণ্ডুয়ার কাগজ সরবরাহ করিবার জন্য প্রায়ই লিখিতেন। হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট্ হুগলীর কাষ্টম্‌স্ কালেকটরের নিকট হইতে (Customs Collector of Hooghly) তাঁহার আবশ্যক কাগজ আমদানী করিবার জন্য বিনামূল্যে পাশ চাহিতেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি গবর্ণমেণ্টকে লেখেন যে, এই কাগজ সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যে সুলভ ও গুণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। য়ুরোপ হইতে কলে প্রস্তুত কাগজের আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুয়ার কাগজের ব্যবসায় লুপ্ত হইয়াছে। ইংরাজ রাজত্বের প্রথম আমলে পাণ্ডুয়া ডাকাতির জন্য দুর্নাম লাভ করিয়াছিল। এখানকার ডাকাত নির্ম্মূল করিবার জন্য বিশেষ সুদক্ষ পুলিশ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল।

পাণ্ডুয়া হইতে দুই ক্রোশ দূরে মহানাদ গ্রামে ব্রহ্মময়ী ও শিব মন্দির আছে। শিব চতুর্দ্দশীর দিন এখানে জাৎ বা মেলা হইয়া থাকে। এখানে ইউনাইটেড্ ফ্রীচার্চ্চ মিশনের একটী বিদ্যালয় ও ক্ষুদ্র দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। মহানাদে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ের একটী ষ্টেশন আছে। পাণ্ডুয়ার যুদ্ধে মীর কাজীমল সাহিব যুদ্ধ-ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করেন। মহানাদে তাঁহার সমাধি-স্তম্ভ আছে। এখানকার জীবন কুণ্ড বা বশিষ্ঠ গঙ্গার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে—এখনও সেই পুষ্করিণীটি বিদ্যমান আছে। এখান হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত চারি ক্রোশ ধরিয়া একটী উচ্চ বাঁধ আছে। তাহা "জামাই জাঙ্গাল" নামে পরিচিত। কথিত আছে, এখানকার রাজপুত্রের বিবাহ হইয়াছিল ত্রিবেণীর রাজকন্যার সহিত। জলাভূমি দিয়া শ্বশুরবাড়ী যাইতে কষ্ট হইত বলিয়া জামাতা ত্রিবেণী যাইতে নারাজ হন। শ্বশুর জামাতার মনস্তুষ্টির জন্য এই বাঁধটি নির্ম্মাণ করেন। তদবধি, ইহা "জামাই জাঙ্গাল" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

পাণ্ডুয়ার উত্তর-পশ্চিমে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে বৈঁচী গ্রাম অবস্থিত। সেখানেও ই, আই, রেলওয়ের একটী ষ্টেশন আছে। বৈঁচীতে স্থানীয় জমীদার ও ব্যবসাদার স্বর্গীয় বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য দেড় লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে তাঁহার বিধবা পত্নীর মৃত্যুর পর তাঁহার ত্যক্ত যাবতীয় সম্পত্তি দেশ-হিতকর কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে আসিয়াছে। তাঁহার বসত-বাটীতে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ও পূর্ব্বের স্কুল-বাটীতে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার বসত-বাটীর সীমানার মধ্যে দুইটি দেব মন্দির আছে। তন্মধ্যে একটী ১৬০৪ শকাব্দে (১৬৮২—৮৩ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে বৈঁচী ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামে অনেক ডাকাইতের বাস ছিল।

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীরেবা দেবী

অল্প বয়সেই কমলা বাপ-মার স্নেহে বঞ্চিতা। পিসিমার কাছেই সে মানুষ। পিসিমা থাক্‌তেন শিলংএ; আর সে পড়ত কলকাতার এক নামজাদা কলেজে। তাকে ঠিক সুন্দরী বলা যায় না; তবে তার মধ্যে কি একটা ভাব ছিল, যার জন্য সকলেই তার প্রতি আকৃষ্ট হ'ত। তাকে অনেকে বিয়ে কর্‌তে চায়; কিন্তু বিয়ের চেয়ে তার লেখা-পড়াতেই ঝোঁক ছিল বেশী। পিসিমা কমলাকে বিবাহ সম্বন্ধে দু' একবার উপদেশ দেবার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তাতে বেশী কিছু ফললাভ হয়নি।

এক দিন সে অচেনা হাতের একখানা চিঠি পেলে। লেখিকা তার সহপাঠিনী নীহারের মা। অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি স্থির করেছেন যে, গরীব পিতৃ-মাতৃহীন কমলাকে তিনি পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করতে রাজি আছেন। কমলা কিন্তু প্রত্যুত্তরে জানালে যে, সে তাঁর পুত্রবধূর ন্যায় লোভনীয় পদ গ্রহণে রাজি নয়। পিসিমা এই খবরে একটু চিন্তিতা হ'লেন। নীহারের মা যেমন তেমন লোক নহেন,—ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নী। আবার শোনা যায়, তিনি না কি জমিদারের কন্যা। কমলার ব্যবহারে রাগ করে যদি তিনি কোন অনিষ্ট করে বসেন, এই ভেবে, পিসিমা এই সম্বন্ধে অনেক বুঝিয়ে কমলাকে একখানা চিঠি দিলেন। চিঠি পেয়ে কমলা হেসেই অস্থির।

ছুটিতে কমলা গেল তার পিসিমার কাছে। অনেক দিন পরে মেয়ে বাড়ী এল—পিসিমা তাকে আদরে-আদরে ভরিয়ে দিলেন। কলেজের খাটুনির পর এই আরামের দিনগুলি কমলার বেশ ভালই লাগ্‌ছিল। তার গলাটা বেশ মিষ্টি ছিল; আর সে বাজাতও ভাল, তাই প্রায়ই বন্ধু মহলে তার ডাক পড়ত। এক দিন একটা পার্টিতে সে কার যেন চোখের আকর্ষণ অনুভব কর্‌লে। ফিরে দেখে, একযোড়া চোখ তারই দিকে চেয়ে আছে। তার পর ভিড়ে সে কোথায় হারিয়ে গেল। বাড়ী ফেরবার সময় তার সঙ্গে পরিচয় হ'ল,—নির্ম্মলচন্দ্র রায় এখানকারই এক বড় ডাক্তার।

নির্ম্মলের সঙ্গে আরও দু' একবার দেখা হ'ল; কিন্তু ভাল করে চেন্‌বার আগেই কমলার ছুটি ফুরিয়ে গেল। কলেজে ফেরবার শেষের ক'দিন কমলা বড়-একটা বাড়ী থেকে বেরুত না। এ ক'টা দিন সে পিসিমার কাছে-কাছেই থাক্‌তে ভালবাস্‌ত।

ফেরবার দিন ষ্টেশনে কমলা একখানা চিঠি পেলে। নির্ম্মল তার পাণিপ্রার্থী। হঠাৎ কোন্ দেবতার মায়া-মন্ত্রে তার জীবনের গতি একেবারে উল্টে গেল। সে যে কেমন করে নির্ম্মলের বাগ্‌-দত্তা পত্নী হ'ল, তা সে নিজেও ঠিক করে বুঝ্‌তে পার্‌লে না। জোর করে সে বল্‌তে পারে নি যে, সে নির্ম্মলকে ভালবাসে, তবুও দিন সুখেই কাট্‌তে লাগ্‌ল। কলেজের শেষ পরীক্ষা দিয়ে সে বাড়ী ফিরে এল।

বিয়ের যখন সব ঠিক, তখন হঠাৎ একটা বিশেষ কাজে নির্ম্মলকে কোল্‌কাতা যেতে হ'ল। কিছু দিন পরে কমলা নির্ম্মলের একখানা চিঠি পেলে। তার মর্ম্ম এই যে, নির্ম্মল তার ভুল বুঝেছে,—সে তাকে ভালবাসে না। অতএব এ বিবাহ না হওয়া উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলকর। চিঠি পেয়ে কমলা প্রথম বুঝলে যে, সে বরাবরই নির্ম্মলকে ভালবাসে—তা না হ'লে এত ব্যথা পেলে কেন?

অতীতের স্মৃতিগুলি ভোলবার জন্য কমলা নিজেকে ডুবিয়ে দিলে কাযের মধ্যে। অন্যের জন্য নিজেকে দান করে সে ধন্য হ'ল। একজন অযোগ্যের নিষ্ঠুরতায় তার ফুলের মত শুভ্র জীবনটিতে যে কালো ছায়া পড়েছিল, ছোট ছোট বালিকাদিগের নির্ম্মল ভালবাসায় তা' আস্তে আস্তে সরে গেল। প্রথম মনে হয়েছিল, জীবনের এ শূন্যতা, এ দৈন্য, কখনও ঘুচ্‌বে না; কিন্তু ধীরে ধীরে অন্যের সুখ-দুঃখকে আপন করে নিয়ে, নিজের বেদনা অনেকটা সয়ে গেল।

ইতিমধ্যে নীহারের ভাই হেম স্বয়ং একবার চেষ্টা করে দেখ্‌লে, যদি কমলাকে বধূ রূপে পাওয়া যায়। সে কমলাকে তার অনেক দুঃখ জানালে, অনেক বোঝালে; কিন্তু সেও যে মার মত অকৃতকার্য্য হ'ল, তা বলাই বাহুল্য।

কমলা একজনকে তার সর্ব্বস্ব দিয়েছে,—আজ সে রিক্তা। স্নেহ-মমতা সে বহু লোককে দুই হাতে বিতরণ করেছে,—কিন্তু ভালবাসা? কোন স্ত্রীলোক কি একবারের বেশী দু'বার ভালবাস্‌তে পারে? হোক না সে অযোগ্য, এম্‌নি ভাবে কমলার দিনগুলি কাট্‌তে লাগ্‌ল।

ছুটিতে কমলা ফের পিসিমার কাছেই গেল। সেখানে এক দিন নির্ম্মলের সঙ্গে দেখা হ'ল। এই সাক্ষাৎটাকেই সে সবচেয়ে ভয় কর্‌ত। ঐ কারণেই সে প্রথম থেকে শিলংএ আস্‌তে চায় নি। এবার কিন্তু পিসিমার বিশেষ অনুরোধ ঠেল্‌তে না পেরে অনেক দিন পরে শিলংএ এসেছিল। পিসিমা কমলার মনের অবস্থা জান্‌তেন; তাই তার হাতে সংসার ছেড়ে দিয়েছিলেন। কমলা সেই নিয়েই ভুলে থাকত। প্রতি সন্ধ্যায় সে পাইন-বনের মধ্যে বেড়াতে যেত। স্থানটি অতি নির্জ্জন। আগেকার মত আর সে লোকের বাড়ী যায় না। সে বেশ বুঝ্‌ত যে, তাকে নিয়ে অনেক হাসি-ঠাট্টা চল্‌ছে। সে তার প্রতিবাদ করতে অসমর্থ,—তাই নীরবে সব সহ্য করত। সে যে সময় বাড়ী থেকে বেরুত, সে সময় প্রায় কারু সঙ্গে তার দেখা হ'ত না। কি জানি, কেমন করে নির্ম্মল তার লুকান স্থান খুঁজে পেয়েছে। কারু মুখে কথা নেই,—কমলা প্রাণপণে আপনাকে সংযত কর্‌লে। নির্ম্মলের মুখ মড়ার মত শাদা,—চেহারা দেখলে মনে হয়, বিছানার সঙ্গে সম্পর্ক অনেক দিন ঘুচে গিয়েছে। অনেকক্ষণ পরে সে বল্লে—"ক্ষমা কর কমলা।"

পাইনের গন্ধমাখা ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে তার স্বর মিলিয়ে গেল। কমলা অবিচলিত ভাবে উত্তর দিলে—"ক্ষমা কর্‌বার তো কিছু নেই। আপনি তো ঠিক কাযই করেছেন। যেখানে ভালবাসা নেই, সেখানে বিবাহ করা পাপ। আপনি যে বিবাহের পূর্ব্বে আমাকে জানিয়েছিলেন, তার জন্য ধন্যবাদ।"

"কমলা, তুমি এই চিঠিটা পড়,—দেখ, যদি কিছু বুঝ্‌তে পার।"

কমলা চিঠি পড়্‌তে লাগ্‌ল। চিঠি হেমের লেখা।

"ভাই নির্ম্মল, আমি অপরাধী। সব শুনে যদি ক্ষমা কর্‌তে পার, তো আমার পরম সৌভাগ্য। আমি কমলাকে বিয়ে কর্‌তে চাই; কিন্তু সে আমার প্রস্তাবে নিজেকে অপমানিত মনে করে। অহঙ্কারে ঘা পড়্‌লে মনের অবস্থা কেমন হয়, বুঝ্‌তেই পাচ্ছ! সেই দিন হ'তে ঠিক কর্‌লাম, যদি আমি তাকে না পাই, তবে তাকে আর কারও হতে দেব না। ৪ঠা মাঘ মনে আছে? সেই দিন তোমার সকল সুখ ও শান্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট করে দিই। কমলার যে ছবি তোমাকে দেখিয়েছিলাম, সেটা কমলার উপহার নয়। এক দিন বোটানিক্সে বেড়াতে যাই। সেখানে একদল মেয়েকে দেখি। তার মধ্যে কমলাও ছিল। এক সময় তাকে দল-ছাড়া হয়ে একলা একরাশ পদ্মফুলের মাঝে দেখ্‌তে পেলুম। লোভ সাম্‌লাতে পারলাম না। কোডাকটা বের করে ছবি তুলে নিলাম। কমলাকে আমি সত্যই ভালবাস্‌তাম, এখনও বাসি। তবে এ ভালবাসায় স্বার্থ নাই। সুরমা এই লক্ষ্মীছাড়ার জীবনের ভার বইতে সম্মত হয়েছে। ভগবানের বিশেষ দয়া। কমলাকে লেখ্‌বার মত সাহস আমার নেই,—তুমি পার তো আমার জন্য মাপ চেও। ইতি,—হেম।"

"কমলা, আমাকে মাপ কর্‌তে পার্‌রে?"

"হেমবাবুকে মার্জ্জনা করা সহজ—কিন্তু তোমাকে—?"

"আমি জানি কমলা, তোমার প্রতি অন্যায় করেছি,—তোমাকে অবিশ্বাস করে, তোমার অপমান করেছি। আমি তোমার ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু তুমি তো নির্দ্দয় নও,—এবারের মত ক্ষমা কর।"

"যে আমাকে এতটা অবিশ্বাস কর্‌তে পারে, তাকে ক্ষমা করা অসম্ভব।"

"অপরাধ স্বীকার কর্‌লেও?" "হাঁ।"

"আমার এ অন্যায়টাকে কি কিছুতেই ভুল্‌তে পার্‌বে না?" "না।"

"কমলা, তোমার অহঙ্কারটা একবারের জন্য ভুলে গিয়ে আমাকে ক্ষমা কর।"

"সে হয় না। আমি তবে আসি, কাজ আছে।"

"তোমাকে ধরে রাখ্‌বার অধিকার আমার নেই। তবে মনে রেখ, একজনের ব্যর্থ জীবনের জন্য তুমি দায়ী। আর যদি কখনও ভগবানের চরণে অপরাধ কর, তবে সাহস করে ক্ষমা চাইতে যেও না। তুমি আর এখানে থেকে বৃথা সময় নষ্ট কর না,—যাও, বাড়ী যাও। যেখানে ভালবাসা নেই, সেখানে ক্ষমার আশা করা আমার ভুল হয়েছে।"

কমলা চুপ করে রইল,—কোন জবাব দিলে না।

ভগ্ন স্বরে নির্ম্মল বলে উঠলো—"সত্যি বল্‌ছি কমলা, আমি জান্‌তাম্ না—তুমি এত কঠিন, এত নিষ্ঠুর—"

কমলার উঁচু মাথা নুয়ে পড়ল। মুখ থেকে বের হ'ল কেবল একটি শব্দ—"নির্ম্মল!"

"কিছু বলবার আছে?"

"হাঁ।"

"বল।"

"তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ।"

"কি রকম?"

"আমি নিষ্ঠুর নই।"

"অপরাধীর প্রতি দয়া না করা যদি নিষ্ঠুরতা না হয়, তবে তুমি নিষ্ঠুর নও।"

"আর একটা ভুল শোধ্‌রাতে চাই।"

"কি?"

"ভালবাসি!"

"কমলা!"

জ্যোতির্বিজ্ঞান

শ্রীঅমিয়া বসু

আমাদের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে একটী নীলাকৃতি গোলাকার গম্বুজ দেখিতে পাই। এই নীলাকৃতি নভোমণ্ডল প্রতি অন্ধকার রাত্রিতে অসংখ্য জ্যোতিঃ-বিন্দু-চিহ্নিত দেখা যায়। এইগুলিকে নক্ষত্র আখ্যা দেওয়া হয়। এই সকল নক্ষত্রের মধ্যে আবার নানা প্রকার শ্রেণী বিভাগ আছে; ইহার মধ্যে কতকগুলিকে গ্রহ বলা হয়।

এই সকল গ্রহ-নক্ষত্রের দূরত্ব, অবস্থিতি-স্থান প্রভৃতি জানিতে হইলে, আমাদিগকে অঙ্কশাস্ত্রের কতকগুলি পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। এ নিমিত্ত কতকগুলি বৃত্ত কল্পনা করিয়া লইতে হয়। এই বৃত্তগুলির কৌণিক মাপ জানিতে পারিলেই, নক্ষত্র ও গ্রহের অবস্থিতি-স্থান জানা যায়।

যে বৃত্তগুলি কোন একটী গোলাকার গম্বুজের মধ্য-বিন্দু পথে গমন করে, তাহাদিগকে বৃহৎ বৃত্ত ও যেগুলি মধ্য-বিন্দু পথে গমন করে না, তাহাদিগকে ক্ষুদ্র বৃত্ত বলা হয়।

কোন একটী সমতল ভূমিতে দাঁড়াইলে মনে হয় যেন, উপরের আকাশ, নিম্নকার মৃত্তিকার সহিত ধীরে ধীরে একটী গোল বৃত্তাকারে মিশিয়া গিয়াছে। এই গোলাকার রেখাটীকে চক্রবাল কিম্বা দিঙ্‌মণ্ডল বলা হয়। এই পরিদৃশ্যমান দিঙ্‌মণ্ডলকে আবার দৃশ্য-দিঙ্‌মণ্ডলও বলে। এই দিঙ্‌মণ্ডল স্থানভেদে বিভিন্ন প্রকার; অর্থাৎ ইহা দর্শকের অবস্থিতি-স্থানের পরিবর্ত্তনের সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

প্রতি অন্ধকার এবং পরিষ্কার রাত্রিতে আমরা যে তারকাবৃন্দ দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশই স্থির নক্ষত্র। তাহাদের পরস্পরের সম্পর্কে অবস্থিতি-স্থানের বিশেষ কোন ব্যতিক্রম হয় না। অর্থাৎ দু'টী নক্ষত্র দর্শকের দৃষ্টিক্ষেত্রে যে কোণ প্রদান করে, তাহা সামান্য পরিবর্ত্তন ভিন্ন সর্ব্বদাই সমান থাকে। এই সামান্য পরিবর্ত্তনও আবার বহু বৎসর ধরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে তবে বুঝিতে পারা যায়। এই সকল স্থির নক্ষত্রের কতকগুলি পূর্ব্ব গগনে উদিত হয়, ও পশ্চিম গগনে অস্ত যায়, এবং পর দিন সন্ধ্যাকালে আবার পূর্ব্ব গগনে উদিত হয়। এই ভাবে

একটী সম্পূর্ণ বৃত্ত ভ্রমণ করিতে এই সকল নক্ষত্রের ঠিক ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ড সময় লাগে।

আবার কতকগুলি নক্ষত্রের কক্ষপথ কখনও দৃষ্টিপথের বাহিরে যায় না। ইহারাও একটী বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া পরিভ্রমণ করে, এবং ঠিক ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ডে সম্পূর্ণ বৃত্ত পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। এই বিন্দুটীকে ধ্রুব এবং নক্ষত্রবৃন্দকে ধ্রুবকেন্দ্রীয় নক্ষত্র বলা হয়।

এই সকল গ্রহ-তারকার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত একটী দূরবীণ রাখা হয়। ইহার মুখটী ইচ্ছামত ঘুরান ফিরান যায়। এই দূরবীণের সহিত একটী ঘড়ির কাঁটা সংযুক্ত থাকে। এই কাঁটাটী ধ্রুব বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া ধ্রুব-কেন্দ্রীয় কোন একটী নক্ষত্রের সহিত সমতালে রাখিয়া চালিত করিয়া দিলে, দূরবীণের মুখটীও সেই নক্ষত্রের সহিত চলিতে থাকে, এবং ঐ নক্ষত্রটী কখনও দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হয় না। এই ঘড়ির কাঁটাটী নক্ষত্রের সহিত সমভাবে চলিয়া ঠিক ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ডে, সম্পূর্ণ বৃত্ত রচনা করে।

যদি আমরা দূরবীণ দ্বারা দিবাভাগে নক্ষত্র এবং সূর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করি, তাহা হইলে, উভয়ের গতির কোন সাদৃশ্য আছে কি না বুঝিতে পারি। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়, উহাদের গতির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। বস্তুতঃ সূর্য্যও স্থির নক্ষত্রের ন্যায় পূর্ব্বগগনে উদিত হয়, পশ্চিম গগনে অস্ত যায়, এবং পর দিন পুনরায় পূর্ব্বগগনে উদিত হয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। সূর্য্য ঠিক ২৪ ঘণ্টায় একটী বৃত্ত পর্য্যটন করে, কিন্তু স্থির-নক্ষত্র ঠিক ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ড সময়ে বৃত্ত পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, সূর্য্য স্থির-নক্ষত্র অপেক্ষা ৪ মিনিট অধিক সময়ে পর্য্যটন শেষ করে।

যদি কোন একটী দেয়ালের প্রান্তভাগে সূর্য্যের প্রান্ত পৌঁছিলে, সে সময়টি দেখিয়া লওয়া হয়, এবং পর দিবস ঠিক ঐ স্থানে সূর্য্য পৌঁছিতে কত সময় লাগে তাহাও দেখা হয়, তবে দেখা যায় যে, ঠিক ২৪ ঘণ্টা সময়ে উহা ঠিক পূর্ব্বস্থানে আসিয়াছে। এই পরীক্ষাটী কোন একটী স্থির-নক্ষত্রের উপর প্রয়োগ করিলে দেখা যাইবে যে, উহা ঠিক ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ড সময়ে পূর্ব্ব স্থানে আসিয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে, স্থির নক্ষত্রের সহিত তুলনায় সূর্য্যের অবস্থিতি-স্থান প্রতি দিন পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সূর্য্য প্রতিদিন পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে অতি মন্থর গতিতে স্থান পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকে, অর্থাৎ প্রতি দিন পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে গমন করিবার সময় সূর্য্য স্থির-নক্ষত্র অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে।

যদি আমরা দিবাভাগে দূরবীণ ব্যতিরেকে নক্ষত্র দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে স্থির নক্ষত্রের মধ্যে সূর্য্যের এই মন্থর গতি দেখিতে পাইতাম। সূর্য্য প্রতিদিন স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া, একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে স্থির-নক্ষত্র সমূহের মধ্যে ঠিক পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসে। এই সময়কে বৎসর বলা হইয়া থাকে।

আরও অন্য উপায়েও সূর্য্যের এই মন্থর গতির প্রমাণ পাওয়া গিয়া থাকে। যদি সন্ধ্যাকালে পশ্চিমগগনস্থ কতকগুলি স্থির-নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তবে দেখা যাইবে, ঐ নক্ষত্র-পুঞ্জ সূর্য্য অস্ত যাইবার অনেকক্ষণ পরে অস্ত যাইবে। এইরূপে উপর্য্যুপরি কয়েক দিবস পর্য্যবেক্ষণ চালাইলে দেখা যাইবে, সূর্য্যের অস্ত যাইবার সময় অপেক্ষা ঐ তারকা-পুঞ্জের অস্ত যাইবার সময় ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। পরিশেষে দেখা যাইবে, উহারা সূর্য্য অস্ত যাইবার পূর্ব্বেই অস্ত যাইতেছে, এবং সন্ধ্যা রাত্রে আর উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

যদি সে সময় প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ব্বগগনে নেত্রপাত করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, ঐ নক্ষত্র-বৃন্দ সূর্য্য উদিত হইবার পূর্ব্বেই উদিত হইয়াছে।

এইরূপে যদি ৩৬৫ দিন উপর্য্যুপরি পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, স্থির নক্ষত্রের মধ্যে সূর্য্যের অবস্থিতি স্থান ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় হইয়াছে, এবং বর্ণিত তারকা-বৃন্দ ঠিক পূর্ব্বস্থানে—সন্ধ্যারাত্রিতে দেখা যাইতেছে। তাহা হইলে আমরা সূর্য্যের দুইটী গতি দেখিতে পাই:—(১) সৌরজগতস্থ প্রতি জ্যোতিষ্কের ন্যায়, প্রতি দিন পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে সূর্য্যের আহ্নিক-গতি। (২) স্থির-নক্ষত্রসমূহ মধ্যে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে সূর্য্যের বার্ষিক গতি।

পুরাকালীন হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণ এই সকল স্থির-

নক্ষত্রকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহাদিগকে রাশি কহে। সূর্য্য প্রতি মাসে যথাক্রমে এক এক রাশি সম্ভোগ করিয়া থাকে। ইহাদের নাম—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন।

চন্দ্রকেও আমরা পূর্ব্বে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যাইতে দেখিতে পাই। ইহা ভিন্ন স্থির নক্ষত্রের মধ্যে সূর্য্যের ন্যায় চন্দ্রেরও পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে একটী গতি আছে। এই গতি সূর্য্যের বার্ষিক গতি অপেক্ষা অনেক দ্রুত। চন্দ্র সূর্য্য এবং পৃথিবীর সম্পর্কে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্বীয় কক্ষপথ ভ্রমণ করিয়া থাকে। এই সময় মাস নামে কথিত হয়।

হিন্দুজ্যোতিষ শাস্ত্রমতে চন্দ্র ২৭টী নক্ষত্রভোগ করিয়া থাকে। ইহাদিগের নাম যথাক্রমে—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, আর্দ্রা, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, ইহার কতকগুলি নক্ষত্রের মাস হইতে আমাদের মাসের নামকরণ হইয়াছে।

স্থির-নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে সূর্য্যের পরিদৃশ্যমান বার্ষিক কক্ষকে ক্রান্তি-বৃত্ত বা গ্রহণ-কক্ষ বলা হয়। এই সূর্য্য কক্ষ একটী বৃহৎ বৃত্ত দ্বারা ব্যক্ত করা যায়। যদি, চন্দ্র স্বীয় মাসিক কক্ষপথ পরিভ্রমণ করিবার কালে, কোন অমাবস্যা, কিম্বা পূর্ণিমা তিথিতে, এই গ্রহণ-কক্ষ অতিক্রম করে, তবে গ্রহণ হইয়া থাকে। অমাবস্যার সময় সূর্য্যগ্রহণ, এবং পূর্ণিমার সময় চন্দ্র গ্রহণ হয়;—এই কারণে ক্রান্তি-বৃত্তের অন্যতম নাম গ্রহণ-কক্ষ।

ক্রান্তি-বৃত্ত খগৌলিক বিষুব রেখা হইতে ২৩° ডিগ্রি, ২৮ সেকেণ্ড দূরে তির্য্যকভাবে অবস্থান করে। ইহাকে সূর্য্য-কক্ষের বা ক্রান্তি-বৃত্তের সহিত বিষুব রেখার তির্য্যক মাপ বলে। এই দুইটী বৃহৎ বৃত্ত পরস্পরকে দুইটী বিন্দুতে অতিক্রম করে। এই দুইটী বিন্দুকে বিষ্ণুপদ ও হরিপদ আখ্যা দেওয়া হয়। এই দুই স্থানে আসিয়া সূর্য্যের আহ্নিকগতি-কক্ষ বিষুব রেখার সহিত প্রায় মিলিত হয়। এই স্থানে আসিয়া সূর্য্য ঠিক পূর্ব্বে উদিত হয় এবং ঠিক পশ্চিমে অস্ত যায়;—এবং উহার আহ্নিকগতি-কক্ষের অর্দ্ধভাগ দিঙ্‌মণ্ডলের উপরে এবং অপরার্দ্ধ দিঙ্‌মণ্ডলের নিম্নে অবস্থান করে। সুতরাং এই সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র দিবারাত্রি সমান হয়। এই সময়কে সায়ন বলে। যখন সূর্য্য বিষ্ণুপদে, (ইংরাজী ২১শে মার্চ্চ) আসিয়া উপনীত হয়, তখন যে সায়ন হয়, উহাকে বাসন্তী সায়ন, এবং যখন হরিপদে (ইংরাজী ২৩শে সেপ্টেম্বর) আসিয়া উপনীত হয়, তখনকার সায়নকে শারদীয় সায়ন বলে।

প্রাচীন জ্যোতিষিগণ, পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, চন্দ্র এবং গ্রহগণ কখনও ক্রান্তি বৃত্ত অপেক্ষা অধিক দূরে গমন করে না। তাঁহারা এই নিমিত্ত ক্রান্তি-বৃত্তের উভয় পার্শ্বে ৮° ডিগ্রি ব্যাপিয়া একটা বৃত্ত কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন। এই বৃত্তের মধ্যেই চন্দ্র, গ্রহ-সমষ্টি, এবং সূর্য্যকে দেখিতে পাওয়া যাইত। তাঁহারা এই চক্রকে পূর্ব্ব-বর্ণিত রাশিবর্গের অবস্থিতি স্থান বলিয়া রাশিচক্র নামে অভিহিত করিতেন।

যদি আকাশস্থ কোন জ্যোতিষ্ক হইতে একটী লম্ব বৃত্তাংশ দিঙ্‌মণ্ডলের উপর অঙ্কিত করা হয়, তাহা হইলে এই বৃত্তাংশের কৌণিক মাপকে ঐ জ্যোতিষ্কের উচ্চতা বলা হয়। এই বৃত্তাংশের পাদদেশ হইতে ধ্রুবপ্রোত বৃত্তের মধ্যবর্ত্তী দিঙ্‌মণ্ডলীকে আশাংশ বলা হয়। কোন একটী জ্যোতিষ্কের অবস্থিতি স্থান নির্ণয় করিতে হইলে, সেই জ্যোতিষ্কের উচ্চতা এবং আশাংশ জানিলেই উহা নির্ণয় করা যায়। কিন্তু দিঙ্‌মণ্ডল পৃথিবীর আহ্নিক গতির নিমিত্ত সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু ধ্রুবপ্রোতবৃত্ত এবং দিঙ্‌মণ্ডল পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার; সুতরাং উচ্চতা এবং আশাংশ কোন একটী জ্যোতিষ্কের অবস্থিতি-স্থান, কোন এক বিশেষ সময়ে এবং বিশেষ স্থানে, মাত্র নির্ণয় করিতে সক্ষম হয়।

এই নিমিত্ত কোন নক্ষত্রের অবস্থিতি-স্থান নির্ণয় করিতে হইলে দিঙ্‌মণ্ডলের পরিবর্ত্তে বিষুব রেখাকে গ্রহণ করা হয়। এই ভাবে যে মাপ লওয়া হয়, তাহা দর্শকের স্থান এবং কালের উপর নির্ভর করে না, এবং বহুকাল পরে পরিবর্ত্তিত হয়। কোন একটী জ্যোতিষ্ক হইতে বিষুব রেখার উপর যে কৌণিক মাপ লওয়া হয়, উহাকে ক্রান্তি বলে। ঐ কৌণিক মাপ লইতে হইলে, যে লম্ব বৃত্ত অঙ্কিত করা হয়, ঐ বৃত্তাংশের পাদদেশ হইতে বিষ্ণুপদ পর্য্যন্ত যে বৃত্তাংশ বিষুব রেখার উপর থাকে, উহাকে নিরক্ষোদয় বলা হয়।

ইহা ভিন্ন আরও একটী মাপ লওয়া হয়। তাহা খগৌলিক বিক্ষেপ, এবং খগৌলিক ধ্রুবক। কোন একটী জ্যোতিষ্ক হইতে ক্রান্তিবৃত্তের উপর যে কৌণিক মাপ লওয়া হয়, তাহাকে বিক্ষেপ বলে। ঐ বিক্ষেপ মাপিবার জন্য যে লম্ব বৃত্তাংশ অঙ্কিত করা হয়, ঐ বৃত্তাংশের পাদদেশ হইতে বিষ্ণুপদ পর্য্যন্ত যে ক্রান্তিবৃত্তের অংশ থাকে, তাহাকে ধ্রুবক বলে।

এই খগৌলিক বিক্ষেপ এবং ধ্রুবকের সহিত ভূগৌলিক বিক্ষেপ এবং ধ্রুবকের কোন সাদৃশ্য নাই।

ক্রান্তি এবং বিক্ষেপ ০° ডিগ্রি হইতে ৯০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত কমে বাড়ে। এদিকে নিরক্ষোদয় এবং ধ্রুবক ০° হইতে ৩৬০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত কমে বাড়ে।

বিষুব রেখার ধ্রুব বিন্দু দিয়া যে বৃহৎ বৃত্ত গমন করে, তাহাকে ক্রান্তিসূত্র বলে; কারণ, এই বৃত্তের উপরই ক্রান্তি মাপ লওয়া হয়। ধ্রুবপ্রোত বৃত্তের সহিত ক্রান্তি সূত্র যে কোণ প্রস্তুত করে, তাহাকে সময় কোণ বলা যায়; কারণ, এই কোণ জানা থাকিলে নক্ষত্রের গতির সময় নিরূপণ করা যায়। আমরা জানি যে কোন একটী নক্ষত্র ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ডে ৩৬০° ডিগ্রি গমন করে; সুতরাং এই সময় সময়-কোণ জানা থাকিলে, ঐ নক্ষত্র কখন ধ্রুব-প্রোত-বৃত্ত অতিক্রম করিবে, কিম্বা শেষ কোন সময়ে উহা অতিক্রম করিয়াছে, তাহা গণনা করিয়া বলা যায়।

যখন সূর্য্য বিষ্ণুপদ সায়নে অবস্থিতি করে, তখন উহার ক্রান্তি—শূন্য ডিগ্রি। তৎপরে উহার ক্রান্তি ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে, এবং মধ্য-গ্রীষ্মে, প্রায় ২১ শে জুন উহা সর্ব্বোচ্চ ক্রান্তিস্থানে উপনীত হয়। সেই সময় উহার ক্রান্তি—২৩° ডিগ্রি ২৮ মিনিট। এই সময়কে নিদাঘ স্থিতি বলা হয়; কারণ, এই সময় সূর্য্য কিছু দিনের জন্য স্থির থাকে বলিয়া বোধ হয়। তৎপরে সূর্য্যের ক্রান্তি আবার কমিতে থাকে, এবং প্রায় ২৩ শে সেপ্টেম্বর হরিপদ সায়নে পৌছিয়া শূন্য ডিগ্রি হয়।

ইহার পর সূর্য্যের ক্রান্তি আবার বাড়িতে থাকে, এবং মধ্য-শীতে, প্রায় ২১ শে ডিসেম্বর উহা আবার ২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট হয়—ইহাকে শৈত্য স্থিতি বলা হয়।

বলা বাহুল্য, সূর্য্য ক্রান্তি-বৃত্তের উপর থাকে বলিয়া, উহার বিক্ষেপ সর্ব্বদাই শূন্য ডিগ্রি থাকে।

যদি বিষুব রেখা হইতে ২৩° ডিগ্রি ২৮ মিনিট দূরে উহার সহিত সমান্তরাল ভাবে দুইটী বৃত্ত অঙ্কিত করা হয়, তাহা হইলে এই দুইটী বৃত্ত সূর্য্যের আহ্নিক-গতি-কক্ষের সহিত ২১শে জুন এবং ২১শে ডিসেম্বর প্রায় মিশিয়া যাইবে। ইহাদিগকে কর্কট মণ্ডল ও মকর মণ্ডল বলা যায়।

প্রেমতত্ত্ব

অধ্যাপক শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

আমরা এ সংসারে কেন যে আসিয়াছি, তাহা যথার্থ ভাবে কেহই বলিতে পারি না। তবে এক রকমে যে জীবনটা কাটিয়া যায়, সে বিষয়ে সকলেই সাক্ষ্য দিবেন। হর্ষ ও বিষাদ, সুখ ও দুঃখ আমাদের প্রাণের উপর খেলা করিয়া যায়; তাহারা কেহই আমাদের জীবনের সঙ্গী নয়; অথচ চিরন্তনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। সমুদ্রের তরঙ্গরাশি যেমন সমুদ্রের অন্তঃস্থল নহে, সেইরূপ মনের ভাবগুলি যাহা উঠিতেছে ও পড়িতেছে, তাহাও আমাদের জীবন নহে। তবে আমাদের জীবন কোথায়? এ জগতে আমাদের অবলম্বন কি?

কবিরা বন্দনা লইয়া থাকিতে পারেন, দার্শনিকগণ বুদ্ধি-বিকাশের গৌরবে ডুবিয়া থাকিতে পারেন, ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা সহজেই ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারেন। যাঁহার যাহা বিশেষত্ব, তাহাই তাঁহার নিজ জীবনের কেন্দ্র হইতে পারে। কিন্তু সমস্ত জগতের মধ্যে সকল জীবের একটি সাধারণ বিশেষত্ব আছে; এবং তাহারই উপর জীবনী-শক্তি সর্ব্বদা নির্ভর করে। সে বিশেষত্বের পীঠস্থান হৃদয়। শরীর বা মনের যে কোন স্থানে আঘাত লাগুক, মানুষ বাঁচিতে পারে। কিন্তু মানুষ যদি হৃদয়ে আঘাত পায় বা হৃদয়ের কার্য্য যদি কোন

প্রকারে থামিয়া যায়, তাহা হইলে মানুষের জীবনী-শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে ধরিয়া রাখিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। যাহা মানুষের পক্ষে সত্য, তাহা সকল জীবের পক্ষেও সত্য। হৃদয় আমাদের সমগ্র জীবনের আধার।

হৃদয়ের মধ্যে যে সকল ভাবরাশি উঠে, তাহাই আমাদের জীবনের সকল কার্য্যের মূল। হিংসা, রাগ, অভিমান, ভালবাসা সকলই হৃদয়ের ভাবপুঞ্জের রূপান্তর মাত্র। এই ভাবগুলি হৃদয়কে ধ্বংস করিতে পারে, আবার গড়িতেও পারে। আমাদের মনে হয়, ভালবাসার মধ্যে জীবনের জয়-পরাজয়ের যতটা পরিচয় পাই, এতটা আর কোন হৃদয়-বৃত্তিতে পাই না। সেইজন্য আমরা মনোজগতে হৃদয়ের কার্য্য বলিতে ভালবাসার কথাই বলিয়া থাকি। মানুষের ভালবাসা বা প্রেম যত পূর্ণ হয়, তাহার জীবনও সেই ভাবে উচ্চতর স্তরে অগ্রসর হইয়া থাকে।

ভালবাসা কাহাকে লইয়া? আমাদের মনে হয়, ভালবাসার মধ্যে তিনজন আছেন—আমি, সংসার, ও আমার প্রেমাস্পদ। আমি ও আমার প্রেমাস্পদের মধ্যে দূরত্ব ও সান্নিধ্য বোধ থাকিত না, যদি মধ্যে সংসার না থাকিত। অতএব সংসার মিলন-বিরহের সৃষ্টি করে এবং সেই হিসাবে সংসারকে বাদ দিয়া কোন প্রেমিকজন প্রেমের প্রথম সোপানগুলিতে তৃপ্ত থাকিতে পারেন না। যে সময় আমার ও আমার প্রেমাস্পদের মধ্যে ঘনিষ্টতর যোগ সম্পন্ন হয়, সে সময় সংসার আমাদের মধ্যে নাই বলিলে হয়। কিন্তু সচরাচর প্রেমের লীলা সংসার মধ্যে না থাকিলে সম্পূর্ণ হয় না।

এইবারে দেখা যা'ক্, আমার ও আমার প্রেমাস্পদের মধ্যে ভালবাসা কি ভাবে বর্দ্ধিত হইতে পারে। ভালবাসার বৃদ্ধির সম্বন্ধে আজ অবধি কোন বৈজ্ঞানিক প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কিসে ভালবাসা বাড়ে, কিসে ভালবাসা কমে, আমরা তাহা জানি না। জানিলে পর-জীবনের ভার বলিয়া কোন জিনিস থাকিত না। আমরা যদি ইচ্ছা করিলেই ভালবাসিতে পারিতাম, আবার ইচ্ছা করিলেই না বাসিতে পারিতাম, তাহা হইলে ভালবাসাকে জীবন বলিতে পারিতাম না; ভালবাসা জীবনের একটা অঙ্গমাত্র হইয়া থাকিত। আমাদের প্রেম, যাহাকে আমরা জীবনের জীবন বলিয়া জানি, তাহা ভগবৎ-প্রেম-ধারার অংশ বলিয়া উপলব্ধ হয় কি না, তাহা পরে দেখা যাইবে। আপাততঃ এইটুকু জানিতে হইবে যে, যে দিন আমরা এ জগতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, সেই দিন হইতে আমাদের অন্তঃকরণে অলক্ষ্যে প্রেম-প্রবাহ বহিতেছে ও জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বহিবে। এবং মৃত্যুর পর যদি আমাদের বিনাশ না থাকে, তাহা হইলে আমাদের জীবনের মূল ধারাটুকু অর্থাৎ ভালবাসা থাকিবে কি না, তাহাও স্থিরভাবে ভাবিবার বিষয়।

মানবজীবনের প্রধান আনন্দ, আমরা যতটুকু বুঝিয়াছি, ভালবাসায় চিরমগ্ন হওয়া। দেখা যা'ক, প্রেমের স্তরে স্তরে ইহা কি ভাবে সহজ হইয়া থাকে।

জীবনের প্রভাতে যখন আমার শরীর ও মন প্রথম অনুভব করিতে পারিয়াছি, তখন আমি সামান্য হইতে পারি, কিন্তু আমার প্রেম সামান্য নহে। সে নানা ভাবে নিজেকে ব্যক্ত করিতে চাহে। সে যে কল্পনা দ্বারা বা অপরের সঙ্কেত দ্বারা নিজ প্রেমাস্পদকে চিনিয়া লয়, তাহা সত্য নহে। আমার প্রেমাস্পদ যে আমার নিকটে আসিবার জন্য অনন্ত কাল ধরিয়া আমার কাছে ধরা দিতেছেন, এ বিশ্বাস প্রেমিকমাত্রেই করিয়া থাকেন। প্রেমের গুরু চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—

"মাটির জনম ছিল না যখন
তখন করেছি চাষ;
দিবস রজনী ছিল না যখন
তখন গণেছি মাস।"

অতএব আমার ও আমার প্রেমাস্পদের মধ্যে সম্বন্ধ অনন্তকাল ছিল; তবে কি অনন্ত কাল থাকিবে না?

তবে সংসারের মধ্যে প্রেমাস্পদের পরিচয় আমরা ধীরে ধীরে পাইয়া থাকি। আমাদের প্রেমাস্পদ ক্রমশঃ আমাদের সমস্ত বিষয়ই অধিকার করিয়া ফেলেন; এবং সেই ভাবে আমাদের প্রেমও বাড়িয়া যায়। প্রেমাস্পদ ও প্রেমের এই প্রকার অনন্ত রূপ ধারণ মানব-জীবনের এক মহাসত্য।

সাধারণ ভাবে দেখা যা'ক্, ইহা কি ভাবে সাধিত হয়। প্রেমের ইতিহাসে দুইটি বিভাগ আছে; প্রথম অবস্থায় প্রেমাস্পদ আমার কেন্দ্র; উত্তরোত্তর অবস্থায় আমার প্রেমই আমার কেন্দ্র। প্রথম অবস্থায় যখন বহির্মুখীন

প্রেম প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তখন প্রেমের কয়েকটি রূপ দেখিতে পাই—

(১) অধিকারের ইচ্ছা। ঐ যে সুন্দর ফুলটি উহা আমার হউক্। এই অবস্থায় পড়িয়া বোধ করি সেকালের নবাবগণ সুন্দর পুরুষ বা সুন্দরী রমণী দেখিলেই তাহাদের আপন প্রাসাদে দাসদাসী রূপে রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন।

(২) ফলের নিমিত্ত ভালবাসার প্রসারণ। পরীক্ষার্থী পাঠ্য পুস্তকগুলিকে যত্ন করিয়া পাঠ করিয়া থাকেন, যতদিন না তাঁহার কার্য্য সিদ্ধ হয়। তার পর অতীতের সামগ্রীর মধ্যে পুস্তকগুলি চিরদিনের জন্য অপসৃত হয়। প্রেমের এই স্তরে থাকিয়া অনেকে ভাবিয়া থাকেন "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"। ভার্য্যার সহিত যে আত্মিক যোগ আছে, সে কথা এ সময়ে মনে হয় না।

(৩) সাক্ষাতে এবং অসাক্ষাতে সকল অবস্থায় ভালবাসার টানে আত্মসমর্পণ করা। গরীব ছাত্র কবে কোন্ সময়ে একটি সত্যবাণী পাঠাগার হইতে সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা তাঁহার জীবনে চিরদিনের সম্পদ হইয়া রহিল। প্রেমের এই স্তরে একজন ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন—

"To see her is to love her;
To love her is for ever.
For Nature made what she is,
And never made another."

এই অবস্থায় পৌঁছিতে গেলে প্রেমের স্বরূপ ও অনেক রকমে বদলাইয়া যায়। ওমর খাইয়ামের কবিতার অনুবাদে দেখিতে পাই, "Heart, my heart, if you free yourself from earth, you will become soul and scale the skies." অন্তর্মুখীন প্রেমের স্তরগুলি নির্দ্দেশ করিতে প্রেমিকজন প্রাণে বড় ব্যথা পা'ন। অনেকে বিশ্লেষণ করিতে চা'ন না। আমরা শুধু মহাপ্রভু চৈতন্যের সহিত রামানন্দ রায়ের কথোপকথনের প্রসঙ্গে যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তাহাই জানাইতে চাই। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। রামানন্দ রায় যখন বলিলেন, "প্রেমভক্তি সর্ব্ব সাধ্যসার" তাহার পর লিখিত শ্লোকগুলি বিবৃত হইয়াছে:—

"প্রভু কহে, এহো বাহ্য আগে কহ আর
রায় কহে, দাস্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্যসার।
প্রভু কহে, এহো বাহ্য আগে কহ আর
রায় কহে, সখ্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্যসার।
প্রভু কহে, এহোত্তম আগে কহ আর
রায় কহে, বাৎসল্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্যসার।
প্রভু কহে, এহোত্তম আগে কহ আর
রায় কহে, কান্তভাব সর্ব্ব সাধ্যসার।
* * * *
প্রভু কহে, এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়।
রায় কহে, ইহার আগে পুছে হেন জনে
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি
যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি।"

তবেই দেখা গেল, অন্তর্মুখীন প্রেমের এই পাঁচটি স্তর আছে,—দাস্যভাব, সখ্যভাব, বাৎসল্যভাব, মধুরভাব ও রাধাভাব। মানুষ যতই উপরে উঠিতে থাকে, ততই ভাবগুলির সমন্বয় বাড়িতে থাকে। যিনি মধুরভাব সম্ভোগ করিয়াছেন তিনিই জানেন, পতি-পত্নীর প্রেমের মধ্যে দাস্যভাব, সখ্যভাব, বাৎসল্যভাব ও মধুরভাব একীভূত হইয়াছে। তিনি আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথচ তাঁকে ভালবাসি—ইহাই হ'ল দাস্যভাব। তিনি ও আমি স্বইচ্ছায় এক ও পৃথক—ইহার মধ্যে সখ্যভাব বিরাজমান। তিনি আমার আপন এবং আমি তাঁকে ভালবাসি, ইহাই বাৎসল্যভাব। তিনি ও আমি দৈব ইচ্ছায় এক ও পৃথক—ইহাই মধুর ভাব। দৈব যেখানে ছাড়াছাড়ি করিতে পারে না, আমার ইচ্ছার যেখানে স্বস্তি হইয়া গিয়াছে, সেখানে তিনি ও আমি মিলেমিশে একাকার, দেশ, কাল বা নিমিত্ত সেখানে ব্যবধান সৃষ্টি করিতে পারে না—ইহাই হ'ল রাধাভাব। বাঙালীর প্রাণ প্রেমের গুরু গৌর নিতাইকে স্মরণ করিয়া এই ভাবে চিরদিনের জন্য আত্ম-বিক্রয় করিতে চায়। বৈষ্ণব ভক্তগণ এই ভাবগুলি ভগবৎ প্রেমের স্তর বলিয়া জানিয়া থাকেন। আমাদের মনে হয়, এই বিভাগগুলি মানব-হৃদয়ের অভিব্যক্তির সোপান। ভক্তগণের মনে দুঃখ দিতে চাহি না, কিন্তু প্রেমের সম্বন্ধে সত্য রই মিথ্যা

কেমন করিয়া বলিব? আমাদের বিশ্বাস, ভগবৎ-প্রেম অন্তরে প্রগাঢ় ভাবে থাকুক বা না থাকুক, প্রেমের এই স্তরগুলি মানব-জীবনে চিরন্তন সত্য। তবে যদি কোন একটি ভাব (যথা বাৎসল্য ভাব) কেহ আত্মদান পূর্ব্বক উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তাঁহার জন্য উত্তরোত্তর ভাবগুলির প্রয়োজন না হইতে পারে। নচেৎ এই স্তরগুলি ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই। ঈশ্বরে বিশ্বাস, সেও ত ঈশ্বরের করুণা,—তাহা তিনি দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন। কিন্তু সকল প্রাণীকে যখন হৃদয় দিয়াছেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে প্রেম দিয়াছেন। প্রেমের স্তরগুলি হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারা যাইতেছে। আমার প্রেমাস্পদ যখন আমার অন্তরে অসীম হইয়া গেলেন ও তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ রাধাভাবে পরিণত হইল, তখন প্রেমই কি জীবের প্রতি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া স্বীকার করিব না?

ভগবান্‌কে টানিয়া আনিয়া বিষয়টিকে জটিল করিয়া ফেলিলাম। যখন প্রেমের মধ্যে আমি ও আমার প্রেমাস্পদ চিরমগ্ন হইয়াছি, আর কিছুই যখন ভাল লাগে না, আর কিছুই যখন হৃদয় চাহে না, তখন ঈশ্বর কি পূজার আঙিনার বাহিরে রহিয়া গেলেন? তাঁর জন্য কি স্বতন্ত্র ভাবে আসন রচনা করিতে হইবে? এ প্রেম-মন্ত্রে কি তাঁর পূজা হইবে না? ধন্য সেই প্রেমিক-যুগল—যাঁহারা নিজেদের প্রেমের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম অনুভব করিয়াছেন—পরস্পরের চক্ষে ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন ও নিজেদের প্রাণের মধ্যে ভগবৎ-প্রেমের আস্বাদ লাভ করিয়াছেন। আমরা শুধু এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে, এ অবস্থায় ধার্ম্মিক সাজিবার প্রয়োজন হয় না, চেষ্টা বা আয়োজনের ব্যর্থতা থাকে না। এখনকার মন্ত্র গীতার ভাষায়—

জানামি ধর্ম্মম্ ন চ মে প্রবৃত্তি জানাম্যধর্ম্মম্ ন চ মে নিবৃত্তি
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।

হৃষীকেশ যখন হৃদয়ে আসীন, তখন জাগতিক বা শাস্ত্র কথিত ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যাপারে আর অভিরুচি নাই। এক্ষণে প্রেম ধর্ম্ম, প্রেম কর্ম্ম, প্রেমই অনন্ত জীবন। আমাদের মনে হয়, এই প্রেম সাগরের কূলে দাঁড়াইয়া সাধু পল বলিয়াছিলেন "All things belong to me and I belong to Christ"—যেখানে যাহা কিছু আছে সকলই আমার এবং আমি খৃষ্টের। প্রেমিকগণও অহরহ আপন অন্তরে বলিয়া থাকেন, জগতের যাহা কিছু তাহা আমার পর নহে, কিন্তু আমি একান্তই আমার প্রেমাস্পদের। যাঁর প্রেমে, যাঁর কাছে আত্মদানে আমরা শুদ্ধ হই, তিনিই ত আমাদের খৃষ্ট, তিনিই ত আমাদের প্রেমাস্পদ।

তবেই দেখা গেল, প্রেমের সাহায্যে সংসার সরস হইল, প্রেমাস্পদ গৌরবান্বিত হইলেন, প্রেমিকের জীবন ধন্য হইল। কিন্তু যে প্রেম জীবনকে মধুময় করিল, তাহা কি জাগতিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে? কিছুই ত সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব না, তবে কি প্রেমও সঙ্গে যাইবে না? যাহা এ জীবনে ছাড়িয়া থাকিতে পারিলাম না, তাহা কি মরণে আমাকে ছাড়িয়া যাইবে? যাহা অনন্ত কাল ছিল, তাহা কি অনন্ত কাল থাকিবে না? যাহা জীবিত অবস্থায় আমাকে অনন্ত রূপ দেখাইল, তাহা কি মরণে আমাকে ক্ষুদ্র ও অসহায় রাখিয়া যাইবে?

এইখানে মানব-চিন্তা হার মানিয়া যায়। প্রেমকে প্রথম স্তরে হৃদয়-বৃত্তি বলিয়া জানিলাম। শেষে প্রেম আমাকে এই জগতেই মহাজীবন দান করিল। এইখানেই কি প্রেমের অন্ত? প্রেম যখন দেহের ও মনের সীমা অতিক্রম করিয়া একছত্র রাজা হইয়া বসিল, সে প্রেম কি আবার মৃত্যু সময়ে দেহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে? অথবা মনের সহিত জড়িত হইয়া বিকৃত হইয়া যাইবে? বুদ্ধি, বিবেক প্রভৃতি খর্ব্ব হইতে পারে; কারণ, যাহার সম্পর্কে তাহারা পরিচিত সেই সংসারের বন্ধ যদি মরণের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলে তাহারা সজীব ভাবে থাকিবে কিরূপে? কিন্তু যে প্রেম অন্তর্মুখীন হইয়াছে, যে প্রেম সংসারকে ছাড়াইয়া আত্মরূপ ধারণ করিতে সমর্থ, তাহার কি মৃত্যুর সহিত সমাপ্তি সম্ভব?

উপনিষদকার ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন, প্রেমই আমাদের মৃত্যু হইতে অমৃতলোকে লইয়া যাইতে সমর্থ। এ কথা আমরা বিশ্বাস করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিব না কি? আমি যদি থাকি, আমার প্রেম যদি থাকে, তবে কি আমার প্রেমাস্পদ দূরে থাকিবেন?

প্রেম পূর্ণ হইবে, আমি পূর্ণ হইব, আমার প্রেমাস্পদ পূর্ণ হইবেন। অলক্ষ্যে সংসার ও ঈশ্বর যেমন মিলেমিশে পূর্ণ আছেন, তার চেয়েও গভীর ভাবে আমার কাছে পূর্ণ হবেন। আমার প্রেম আমাকে লোকলোকান্তরে ঘিরিয়া থাকিবে।

মুরলা *

অধ্যাপক শ্রীসত্যভূষণ সেন

পার্ব্বত্য উপত্যকায় ক্ষুদ্র নগর। তিন সপ্তাহ ধরিয়া নগর শত্রু কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ। শত্রুপক্ষ এখনও নগর দখল করিয়া লয় নাই সত্য, কিন্তু নগর-সীমার চারি দিকে তাহাদের বেষ্টন ক্রমেই নিবিড়তর হইয়া আসিতেছে। রাত্রিতে মশালের দীপ্তিতে যখন শত্রুশিবির আলোকিত হইয়া উঠে, তখন যে দৃশ্য নাগরিকগণের মনে ভীতির সঞ্চার করে। শত্রুদলের সুপুষ্ট অশ্বের হ্রেষাধ্বনি শ্রবণে এবং নিশ্চিন্ত শত্রুসেনার ইতস্ততঃ সঞ্চরণ দেখিয়া তাহাদের ঈর্ষা হয়। শত্রুশিবিরে হাস্যধ্বনি ও আমোদ উল্লাসের শত কলরব নাগরিকদের প্রাণে পীড়া জন্মায়। কাহারও আনন্দ-কলরব যে অপরের প্রাণে পীড়া জন্মাইতে পারে, ইহা অস্বাভাবিক ব্যাপার হইলেও, এক্ষেত্রে সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম সম্ভবপর হইয়াছে।

শিকারী যেমন শিকার নিশ্চিত আয়ত্তের মধ্যে জানিয়াও হঠাৎ তাহা হস্তগত করে না—কিছুকালের জন্য তাহার সাফল্যের আনন্দটা উপভোগ করিয়া লয়, এস্থানে শত্রুপক্ষের ব্যবহার অনেকটা তাহারই অনুরূপ। যে স্রোতস্বতী নগরে জল সরবরাহ করে, শত্রুসেনারা তাহাতে মৃতদেহ ভাসাইয়া দিল; নগরের চারিদিকে যে দ্রাক্ষার ক্ষেত শোভা পাইত, তাহারা তাহা জ্বালাইয়া দিল; সমস্ত শস্যক্ষেত্র পদদলিত করিয়া, নগর-সীমার চারিদিককার বৃক্ষসমূহ কাটিয়া ফেলিয়া, নগরটিকে রিক্ত উন্মুক্ত করিয়া দিল।

নগরবাসীদের বাহির হইতে কোন প্রকার সাহায্যের প্রত্যাশা ছিল না। নগর-সীমার ভিতরে আবদ্ধ থাকিয়া তাহারা ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল,—তাহাদের মুখে আর হাসি দেখা যায় না। পুরুষেরা নগরের পথে পথে প্রহরা দেয়,—স্ত্রীলোকেরা ভগবানের নাম স্মরণ করে। ছেলেমেয়েরা হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায় সত্য, কিন্তু পিতামাতার মুখের দিকে চাহিয়া সহানুভূতির সাড়া পাওয়া যায় না। অদূরে পর্ব্বতশ্রেণীর বিরাট গাম্ভীর্য্য, মাথার উপরে চন্দ্রমার অস্ফুট আলো, আকাশে অগণিত নক্ষত্রের পাংশু দীপ্তি—সমস্ত প্রকৃতিই যেন নীরব।

নগরে কাহারও গৃহে প্রদীপ জ্বলে না। ঘন কুয়াসার আবরণে রাত্রির অন্ধকার যেন আরও গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। এই অন্ধকারের মধ্যে কাল পোষাকে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া একটি স্ত্রীলোক এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। রাস্তার লোকেরা দেখিলেই বলাবলি করিত—"এই না সেই?" "হাঁ, এ সে-ই।"

প্রহরীদের সঙ্গে দেখা হইলেই তাহারা স্ত্রীলোকটিকে শাসাইয়া দিত—"আবার তুমি বাহিরে এসেছ, মুরলা? খবরদার! বাহিরে এক মুহূর্ত্তও কেউ নিরাপদ নয়। কে কখন কার প্রাণ বিনাশ করে, কেউ তার খোঁজও পায় না।" কিন্তু মুরলা কাহারও কথার কোন প্রত্যুত্তর করিত না। সে যেরূপ নিঃশব্দে আসিয়া দেখা দিত, সেইরূপ নিঃশব্দেই চলিয়া যাইত। রাত্রির অন্ধকারে কাল-পোষাক-পরিহিত তাহাকে নগরের দুর্ভাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া মনে হইত।

মুরলা ছিল এই নগরের একজন পুরাতন অধিবাসিনী, এবং এক সন্তানের জননী। তাহার চিন্তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল—তাহার পুত্র এবং তাহার জন্মভূমি। তাহার সৌম্য-কান্তি পুত্র এখন উল্লাসে উন্মত্ত এবং সে-ই শত্রুদলের নেতা হইয়া বর্ত্তমানে এই নগরের ধ্বংস-কার্য্যে ব্যাপৃত। বেশী দিন হয় নাই—যখন এই পুত্রই ছিল তাহার হৃদয়ের আনন্দ,—তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বর্ণ-সিংহাসন। এই নগরের প্রতি প্রস্তরখণ্ড, প্রত্যেক গৃহ-প্রাচীরের সহিত মুরলার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তাহার পূর্ব্বপুরুষেরাই এই নগরের প্রাচীর তৈরী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার পিতৃ-পিতামহ এবং স্বর্গগত কত-শত আত্মীয়স্বজন এই বায়ু হইতেই নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। তাঁহাদের শেষ নিশ্বাস হয় ত এখনও এই বায়ুমণ্ডলে ঘুরিয়া

* রুষ উপন্যাসিক গোর্কী (Gorki) হইতে।

ফিরিতেছে,—তাঁহাদের দেহাবশেষও এই দেশের মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। এই দেশের কত কাহিনী, কত গাথা, তাহার দেশবাসীর কত আশা-আকাঙ্ক্ষা তাহার প্রাণের সহিত জড়িত। এই জন্মভূমির প্রতি মুরলার মমতা এতই গভীর ছিল যে, সে মনে করিত, তাহার পুত্র যেন জন্মভূমির কল্যাণ সাধনের জন্য তাহারই সৃষ্ট একটি মঙ্গলময় শক্তি। এই পুত্রকে সে তাহার জন্মভূমির জন্য উৎসৃষ্ট মনে করিয়া মনে মনে গৌরব বোধ করিত। এখন সেই ত তাহার জন্মভূমি পড়িয়া রহিয়াছে—কিন্তু কোথায় তাহার পুত্র!

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মুরলা পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। যাহারা অপরিচিত, তাহারা ইহার সান্নিধ্য পরিহার করিয়া চলিত—অন্ধকারে ঐ কাল মূর্ত্তি দেখিয়া উহাকে মৃত্যুর অগ্রদূত বলিয়া মনে হইত।

নগরের এক প্রান্তে একটা পরিত্যক্ত স্থানে আসিয়া মুরলা দেখিল, আর একটি স্ত্রীলোক একটি মৃতদেহের পার্শ্বে নতজানু হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে। মুরলা নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই কি তোমার স্বামী?" স্ত্রীলোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল "না,—আমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে আজ তের দিন হইল। এটি আমার পুত্র।" মুহূর্ত্তকাল উভয়ে নীরব। পরে স্ত্রীলোকটি একবার ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া যেন ভগবানকে প্রত্যক্ষ জানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল—"ভগবান, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক,—তুমি আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ গ্রহণ কর।" মুরলা চমকিয়া উঠিল, বলিল, "সে কি! তুমি কি মৃত্যুর হাতে সঁপে দেবার জন্যই পুত্র প্রসব করেছিলে?" স্ত্রীলোকটি শান্ত ভাবে জানাইল—"হউক না মৃত্যু,—এ মৃত্যু ত অর্থশূন্য উদ্দেশ্যবিহীন মৃত্যু নয়—সে যে তার দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে! অধুনা আমার পুত্র বিলাসিতায় এবং আমোদ প্রমোদে মেতে উঠেছিল। মানুষের জীবনে আমোদ প্রমোদের খুবই প্রয়োজন আছে; কিন্তু অত্যধিক চপলতার দরুণ স্থির বুদ্ধি এবং বিবেকানুবর্ত্তিতায় অনেক সময় শিথিলতা এসে পড়ে। আমার কেবলই আশঙ্কা হ'ত—পাছে আমার পুত্র এমন কোন কাজ ক'রে বসে, যাতে দেশের স্বার্থহানি হয়—যেমন মুরলার পুত্র ক'রেছে। দেশদ্রোহী কুলাঙ্গার! ধিক তার জীবনে,—ধিক তার মাতৃত্বে, যে এমন পুত্রের জন্ম দিয়েছে!"

মুরলা হঠাৎ অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

পর দিন মুরলা নগর-রক্ষকদের নিকট হাজির হইয়া বলিল—"আমার পুত্র দেশদ্রোহী হইয়া তোমাদের সহিত শত্রুতা সাধন করিতেছে। তোমরা হয় সেই অপরাধে আমাকে হত্যা কর, না হয় পথ উন্মুক্ত করিয়া দাও—আমি আমার পুত্রের নিকট চলিয়া যাই।"

"তোমার পুত্র চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তোমার দেশ আছে। এখন তোমার পুত্র যেমন আমাদের, তেমনই তোমারও শত্রুস্থানীয়।"

"কিন্তু আমি তাহার মা। তাহার শত অপরাধ হইলেও, আমিই সেজন্য অপরাধী।"

"তা হয় না,—তোমার পুত্রের পাপে তোমার হত্যা হইতে পারে না। আমরা জানি, সে কখনও তোমা হইতে এই পাপের প্রেরণা লাভ করে নাই। তোমার যে ইহাতে কত দুঃখ, তাহাও আমরা বুঝিতেছি। কিন্তু জান, তোমার পুত্র এখন আর তোমার ভাবনা ভাবিয়া নিজেকে ক্লিষ্ট করে না—সে হয় ত তোমায় ভুলিয়া গিয়াছে। যদি তোমার কোন প্রকার শাস্তির প্রয়োজন থাকে মনে কর, তবে এই তোমার শাস্তি—তোমার পুত্র তোমায় ভুলিয়া গিয়াছে। এই ত শাস্তি—মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর।"

"হাঁ, মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর।"

* * * *

নগর-দ্বার উন্মুক্ত হইল,—মুরলা বাহির হইয়া গেল। নগর-প্রাচীরের বাহিরে তাহারই দেশাধিবাসী কত বীর মৃত্যু-শয্যায় শায়িত—মুরলা তাহাদের উদ্দেশে প্রণাম করিল। ইহাদের শোণিতে ভূমি সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে,—তাহারই পুত্র স্বজাতির শোণিতে ধরণী কলঙ্কিত করিয়াছে। মুরলা চক্ষে অন্ধকার দেখিল। পথে কত প্রকার অস্ত্রশস্ত্রের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে,—দেখিয়া, মুরলার মাতৃ-হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল—ধ্বংস কার্য্যে ত মাতৃ-হৃদয় সায় দিতে পারে না। অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়া, মুরলা দৃষ্টি ফিরাইয়া, একবার দেশের দিকে দেখিয়া লইল। অপর দিক হইতে শত্রুসেনারা তাহাকে দেখিতে পাইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাহার পরিচয় পাইলে, তাহারা সসম্ভ্রমে মুরলাকে তাহার পুত্র—তাহাদের নেতার নিকট লইয়া চলিল। তাহারা তাহাদের নেতার শৌর্য্য-বীর্য্যের ও কর্ম্ম-

কুশলতার অজস্র প্রশংসা করিতে লাগিল। শত দুঃখেও মুরলার মাতৃ-হৃদয় পুত্র-গৌরবে আনন্দলাভ করিল। এই ত পুত্র শৌর্য্য-বীর্য্যের আধার,—সর্ব্বলোকের প্রশংসাভাজন, কিন্তু—

শত্রু-শিবিরে সুবা-সিং মহার্ঘ্য পরিচ্ছদে ভূষিত,—কটিতে তাহার মহামূল্য তরবারি—মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত। মুরলা তাহার মাতৃ-হৃদয়ে স্বপ্ন-দৃষ্টিতে তাহাকে যে অবস্থায় দেখিয়াছিল, এ যেন সেই মূর্ত্তি। পুত্রকে দেখিতে পাইয়া মুরলা যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইল; কারণ, এই পুত্র ত পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই তাহার স্নেহের অধিকার লাভ করিয়াছিল; এবং বর্ত্তমানে শত অপরাধ সত্ত্বেও তাহার জন্য মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহের ধারা ত এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

সুবা-সিং মাতৃ-পদে প্রণাম করিয়া বলিল—"মা, তুমি এসেছ? তুমি আমার অভিপ্রায় জান্‌তে পেরেই এসেছ নিশ্চয়। আমি এত দিন তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম—এইবার কালই এই নগরটা অধিকার করে ফেলব।"

"বিস বৎস, এই নগরই ত তোমার জন্মভূমি।"

"সমস্ত পৃথিবীই আমার জন্মভূমি। আমি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি—পৃথিবীতে একটা কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। বর্ত্তমানে এই নগরটা আমার গতিপথে কণ্টকের মত হয়ে রয়েছে; এখন আমার প্রথম কাজ—এই নগরটা শেষ করে ফেলে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হওয়া।"

"এই নগরের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড তোমার পরিচিত।"

"হউক পরিচিত। এখন প্রস্তরখণ্ডের পর্য্যন্ত সুখ-দুঃখ দেখ্‌তে গেলে আমার চল্‌বে না। প্রস্তরখণ্ডের প্রয়োজন হবে—যখন পুরাতন সমস্ত ভূমিসাৎ করে নূতন দুর্গ, নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত হবে তখন,—তার পূর্ব্বে নয়।

"দেশের লোকগুলিও কি তোমার কেউ নয়?"

"হাঁ, মানুষে আমার প্রয়োজন আছে বই কি। মানুষ না থাক্‌লে আমার কীর্ত্তিগাথা গাইবে কে—আর তা শুনবেই বা কে।"

"কিন্তু কীর্ত্তিমান সে-ই, যে জগতের দিকে দিকে নব নব বিষয়ে সৃষ্টি ফুটাইয়া তোলে—ধ্বংস ত কীর্ত্তিমানের কর্ম্ম নয়।"

"কেন নয়? আকবর ও সাজাহানের নাম যেমন সবাই জানে,—তৈমুর, চেঙ্গিজখাঁর নামও তো ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মুছে যায় নাই।"

"তৈমুর, চেঙ্গিজখাঁ ত নিজের দেশ ধ্বংস করে নাই।"

মাতা-পুত্রে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল,—পুত্রের জবাব শুনিয়া মাতার কথা বলিবার উৎসাহ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল। পুত্র-গৌরবে উন্নত মস্তক তাহার নত হইয়া আসিল।

মাতা সৃষ্টি-স্বরূপিণী, তিনি জননী,—তাঁহার নিকট প্রলয়ের কথা, ধ্বংসের কথা—তাঁহার জীবনের মূলে পর্য্যন্ত গিয়া আঘাত করে। কিন্তু পুত্র যৌবন-মদে মত্ত হইয়া এত কথা চিন্তা করিবার অবসর পায় না। যে হস্ত জগতের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত না হইয়া প্রলয় সাধনে অগ্রসর হয়, মাতার নিকট চিরদিনই তাহা অপূজ্য।

সুবা-সিং এসব কথা কোন দিন চিন্তা করিয়া দেখে নাই। এখন সে নিজ ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার চিন্তায়ই ব্যস্ত। সুবা-সিং জানিত না যে, মাতৃ-হৃদয় যে স্থলে সৃষ্টি-স্বরূপিণী জননী রূপে অভিব্যক্ত, তাহার সেই স্বাভাবিক ক্ষেত্রে বাধা পাইলে, মাতৃ-হৃদয়ও কিরূপ প্রলয়ঙ্করী হইয়া উঠিতে পারে।

মুরলা তাঁবুর ভিতরে বসিয়া ছিল। তাহার মস্তক অবনত, চক্ষে জ্যোতিঃ নাই, প্রাণে উৎসাহ নাই। তাঁবুর বাহিরে চাহিয়া দেখিল—অদূরে তাহার জন্মভূমি দেখা যাইতেছে। শুধু জন্মভূমি নয়—এই নগরেই নবীন যৌবনে সে তাহার প্রথম পুলক-স্পর্শ লাভ করে এবং যথা সময়ে তাহার প্রথম সন্তান সুবা-সিংএর জন্ম হয়। এই সেই সুবা-সিং! অস্তায়মান সূর্য্যের শেষ স্বর্ণ-রশ্মি নগরের সৌধ-চূড়ায়, গৃহে গৃহে, প্রাচীরে প্রাচীরে প্রতি-ফলিত হইল,—জানালা-দরজার কাচের উপরে পড়িয়া সমস্ত রক্তরঞ্জিত করিয়া তুলিল; মনে হইল, যেন প্রকাণ্ড নগরটা আহত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে,—আর তাহার আহত স্থানসমূহ হইতে শতধারে রক্তধারা ছুটিয়া বাহির হইতেছে। সময় কাহারও অপেক্ষা করে না। অল্পক্ষণ যাইতে না যাইতেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। সমস্ত নগরটা একটা মৃতদেহের ন্যায় পড়িয়া রহিল। শবাধারের পার্শ্বে বাতির মত মাথার উপরে একটি একটি করিয়া নক্ষত্র

জ্বলিয়া উঠিল। মুরলা মানস-নয়নে দেখিতে পাইল যে, নগরের অধিবাসীরা গৃহে বাতি জ্বালিতে ভরসা পায় না,—সকলেই অন্ধকারে আনাগোনা করিতেছে,—তাহাদের গতি শিথিল, দৃষ্টি অবনত। নগরে যত কিছু তাহার পরিচিত, সকলই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—দাঁড়াইয়া যেন তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে। চির-পরিচিত নগর যেন কিসের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আজ তাহার সহিত অধিকতর আত্মীয়তার বন্ধনে জড়িত। আজ মুরলার প্রাণে যেন বাৎসল্যের নব অনুরাগ জাগিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল যে, নগরের সকল অধিবাসীই যেন তাহার সন্তান—সে যেন এক দিনেই সকলের মাতৃস্থানীয়া হইয়া উঠিয়াছে।

পর্ব্বত-শিখর হইতে ধীরে ধীরে মেঘ নামিয়া আসিতেছিল। সুবা-সিং বলিয়া উঠিল—"রীতিমত অন্ধকার হ'লে, আজ রাত্রিতেই নগর আক্রমণ করব।" মুরলা বসিয়া ছিল, সুবা-সিং তাহার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া ছিল। পুত্রের কথা শুনিয়া মুরলার মুখে হাসি দেখা দিল—কিন্তু এ হাসি ত হাসি নয়, এ যেন উদ্গত অশ্রু রুদ্ধ হওয়াতে বিকৃত হইয়া হাসি রূপে দেখা দিল।

মাতা পুত্রের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"এখন ও-সব কথা ছেড়ে দাও; এই শান্ত, মৌন সন্ধ্যায় একটু অন্য চিন্তা কর। একবার স্মরণ কর সেই শৈশবের কথা, যখন সকলের সঙ্গে একটা প্রীতির সম্বন্ধ ছিল, সকলে তোমায় কেমন ভালবাস্‌ত!"

"এখন আর অন্য চিন্তায় আমার মন যায় না। আমি কেবল ভাবি ভবিষ্যতে আমার যশ, মান, গৌরবের কথা।"

"একটা কাজ বাকী রয়েছে,—এখন ত তোমাকে বিয়ে করে সংসারী হ'তে হবে।"

"না মা, বিয়ে করা আমার হয়ে উঠবে না। আমি ভেবে দেখেছি, পারিবারিক জীবনের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আমার মন কিছুতেই পোষ মান্‌বে না।"

"সে কি! তুমি কি সন্তান কামনা কর না?"

"সন্তান কিসের জন্য মা! আমার মত আবার কেউ এসে তাদের হত্যা করে যাবে—এই ত তার পরিণাম! তখন হয় ত হত্যার প্রতিশোধ নেবার মত সামর্থ্য আমার থাকবে না। অতএব, সন্তান শুধু দুঃখের কারণ হবে বই ত নয়।"

"দেখ, আকাশের বিদ্যুৎ দৃশ্যতঃ অতি চমৎকার, কিন্তু তার কোনরূপ সার্থকতা দেখা যায় না। তোমার জীবনেও ঐশ্বর্য্যের বিদ্যুৎ একদিন ঝল্‌সে উঠতে পারে, কিন্তু তথাপি জীবন তোমার ব্যর্থ ব'লেই গণ্য হবে।"

"হাঁ, ঠিক বলেছ মা, আমি আকাশের বিদ্যুৎ!"

মাতা-পুত্রে এইরূপ আলাপ চলিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে সুবা-সিং ঘুমাইয়া পড়িল।

মুরলা উঠিয়া দাঁড়াইল। সে নিজেকে প্রস্তুত করিয়াই আসিয়াছিল—এখন আর তাহার মনে কোন দ্বিধা রহিল না। মুরলা যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের নিকট দেশের কল্যাণ-সাধনই পরম ধর্ম্ম। প্রয়োজন হইলে স্নেহ, প্রেম সকলই তাহার নিকট বলিদান প্রাপ্ত হয়। মুরলা উঠিয়া একখানা কাল কাপড়ে সুবা-সিংএর সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিল, এবং একখানা তীক্ষ্ণধার ছোরা লইয়া পুত্রের হৃদয়ে আমূল বসাইয়া দিল। সুবা-সিংএর দেহ ঈষৎ কম্পিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবিয়োগ হইল—কারণ, মুরলা তাহার মা,—পুত্রের হৃৎস্পন্দনটুকু কোথায়, তাহা সে ভাল করিয়াই জানিত।

সুবা-সিংএর রক্ষিগণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মুরলা তাহাদিগকে বলিল—"আমি ঐ নগরের একজন অধিবাসী—সেই হিসাবে জন্মভূমির প্রতি যথাসাধ্য আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছি। আমি সুবা-সিংএর মাতা—সেই হিসাবে আমি আমার পুত্রের নিকটেই থাকিব। আর একটি সন্তানের জন্ম দেবার মত বয়স আমার নাই,—কাজেই দেখিতেছি, আমার জীবনটা বৃথাই গেল—আমার দ্বারা দেশের কোন কাজ হইল না।" এই বলিয়া একবার জন্মভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পুত্রের রক্তরঞ্জিত সেই ছোরাখানা নিজের বক্ষস্থলে বসাইয়া দিল।

শিবির-কাহিনী

কর্পোরাল শ্রীমাখনলাল সমাদ্দার

পূজোর ছুটীর দিন কয়েক আগে শুনলাম যে, আমাদের নভেম্বর মাসে Campএ যেতে হ'বে। ছুটীতে হাতুয়া বেড়াতে গেলাম, বাবার সঙ্গে সেখানকার দশহরা দেখ্‌তে। সেখানে এক দিন খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুর বেলায় শুয়ে শুয়ে রাজুদার সঙ্গে (প্রাইভেট রাজেন্দ্রলাল মিত্র) গল্প কচ্ছি, এমন সময় পিওন এসে রাজুদাকে একখানা রেজিষ্টারী চিঠি দিল। সে চিঠিটা পড়ে বল্‌লে, "ওহে Radamas, (আমার কলেজের ডাক-নাম। 'Samadar' নামটা উল্টে দিলে এই অদ্ভুত নামটা হয়।) Campএ যাচ্ছ ত?" "নিশ্চয়," বলে আমি লাফিয়ে উঠে চিঠিখানা খপ্ করে কেড়ে নিলাম। পড়ে দেখি, "You are hereby summoned to attend for training at (Station) Patna (armoury) at (hour) 07-00 on the first day of November, 1924, failing which you will render yourself liable to trial by court-martial or by criminal court. ..." ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ কি না "তুমি পয়লা নভেম্বর সকাল সাতটার সময় পাটনা অস্ত্রাগারে অবশ্য উপস্থিত থাক্‌বে, নইলে তোমার সামরিক আদালতে কিংবা ফৌজদারী আদালতে বিচার হ'বে।" এরকম চিঠি আমরা দেখলাম এই প্রথম।

নন্ কমিষণ্ড অফিসারগণ

কিছু দিন পরে হাতুয়া থেকে পাটনা ফিরে এ সে, camp এ যাবার যোগাড় কর্ত্তে লাগলাম। আমার চিঠিখানা বড়দা হাতুয়ায় redirect করে পাঠিয়েছিল, সেখানাও ঘুরে ফিরে আবার পাটনায় আমার হাতে এসে পড়্‌ল। চিঠির সঙ্গে একখানা রেলওয়ে পাশ ছিল, অবশ্য পাশখানা আমার কোনও কাজে লাগ্‌ল না। বড়দার যাবার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু হঠাৎ অসুখে পড়ায় এবার দুভায়ে না গিয়ে একলাটীই যেতে হ'ল।

পয়লা নভেম্বর ভোর বেলায় লটবহর নিয়ে পাটনা "আরমারী"তে হাজির হলাম। দেখলাম, বাঙ্গালীর সংখ্যা পূর্ব্বকার চেয়ে কম। বেহারীদের campএ যাবার

চাইতেও কোর্ট মার্শালের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার আগ্রহটা ঢের বেশী ছিল। আমার এক বিহারী বন্ধু জান্‌ত যে, কোর্ট মার্শাল মানে একেবারে "To be shot dead." এই কোর্ট মার্শালের ভুল মানে করে অনেকে এমন কি camping শেষ হবার দু তিন দিন আগে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।

আন্দাজ নটার সময় সার্জ্জেণ্ট কিংএর "Quick March"এর কমাণ্ড পেয়ে, আমরা পাটনা থেকে রওনা হলাম। সংখ্যায় ছিলাম আমরা ৬০ জন। সকলের

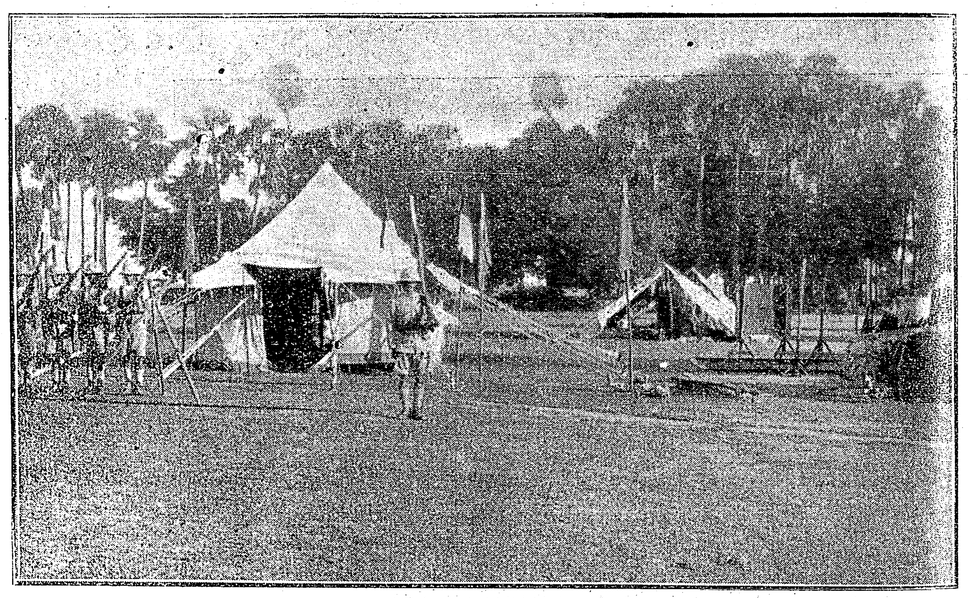

কোয়ার্টার গার্ডস্ ও শিবিরের অন্য প্রান্ত

কোমরে web equipment,—তাতে water bottle আর Haversack বাঁধা, আর কাঁধে রাইফল্। সেবারকার মত আর নয় মাইলের ধাক্কা ছিল না, তাই প্রায় ১১টার সময় আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেলাম। আমাদের camping ground ফুলওয়ারী বলে একটা যায়গায় স্থির হয়েছিল। জায়গাটা Government Houseএর মাইল আধেক দূরে। Campingর পক্ষে বেশ ভাল। চারদিকে খোলা মাঠ, মাঝে মাঝে তালের আর ছোট-বড় গাছপালার ঝাড়; তার পাশ দিয়েই ই, আই, রেলওয়ে লাইন চলে গেছে। এরই কাছে পাটনার Residential University করবার কথা হয়েছিল।

ফুলওয়ারীতে পৌঁছে N. C. O.দের (non-commissioned officer) rank দেওয়া হ'ল। দুজন আগে সার্জ্জেণ্ট ছিলেন, এখন হলেন তাঁরা Platoon Commander; আর ৪ জন কর্পোরাল হলেন সার্জ্জেণ্ট। এই Platoon Commanderদের মধ্যে সার্জ্জেণ্ট চিত্তরঞ্জন দাশ বি-এস্‌সি শীঘ্র কমিশন পাবেন। সার্জ্জেণ্ট বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল Indian Territorial forceএ যোগদান করেছেন। ইনি সেখানে হাবিলদার হয়ে যাচ্ছেন। ইনিও শীঘ্রই কমিশন পাবেন, এ রকম আশা করা যাচ্ছে। আমাদের Adjutant Major Ransford এঁদের দুজনের কাযে খুব সন্তুষ্ট। এঁরা ছাড়া (অর্থাৎ Platoon Commander ও Sergeant ছাড়া) ছ'জন কর্পোরাল ও আটজন লান্স কর্পোরাল হ'লেন। গেল বারে বেহারীদের কেউ rank পায়নি,—এবারে কয়েকজন পেয়েছে। এই সব কায শেষ হয়ে গেলে, সার্জ্জেণ্ট কিং "guard mount" করিয়ে আমাদের "dismiss"এর হুকুম দিলেন। আমরাও তাড়াতাড়ি তাঁবুগুলিকে খাড়া করে, যে যার জিনিস-পত্তর নিয়ে বিছানা অর্থাৎ খড় ও কম্বল বিছিয়ে নিলাম। এইখানে "guard mounting" ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া ভাল। রোজ দুপুর বারোটার সময় প্রাইভেটদের মধ্যে থেকে ৯ জন quarter guards নেওয়া হ'ত; তা ছাড়া দুজন N. C. O. থাকৃত—একজন guard commander, আর একজন conducting relief। Guardদের প্রত্যেকের ৮ ঘণ্টা করে Sentry duty পড়্‌ত; পালা করে ৪ ঘণ্টা অন্তর ২ ঘণ্টা করে। guardরা ২৪ ঘণ্টা পরে ছুটী পে'ত।

শিবিরের এক প্রান্ত

Campএ এবার সুন্দর বন্দোবস্ত। খাবারের ভার দেওয়া হয়েছিল "কলেজ রেস্তরাঁকে"। যে ক'দিন campএ ছিলাম, সে ক'দিন কোনরকম খাবারের অসুবিধা ভোগ করিনি। সেবারকার Patna Hotel যে কুকীর্ত্তি করেছিল, তার আর পুনরাবৃত্তি হয়নি। এবারকার হোটেলকর্ত্তারা আমাদের সুখের জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন; মাছ, মাংস, ডিম আমরা রোজ পেতাম। এমন কি, অতিবৃষ্টির দিনও আমাদের খিচুড়ী আর পোলাও বাদ পড়েনি। মধ্যে মধ্যে অবসর সময়ে এঁরা আমাদের গান বাজনা শোনাতেন।

শনিবার দিন (অর্থাৎ যে দিন ফুলওয়ারীতে পৌঁছলাম) আর প্যারেড হ'ল না। তার পরদিন রবিবার,—সে দিনও ছুটী। তাই খেয়েদেয়ে সকলেই আরামের যোগাড় দেখ্‌তে লাগলেন। সে দিনটা বেশ হেসে খেলে কাটিয়ে দেওয়া গে'ল। সোমবার থেকে সব রীতিমত সুরু হ'ল। সকাল ৭৷৷০টা থেকে ৮টা পর্য্যন্ত physical exercise হ'ত। এতে যেমন ব্যায়ামও হ'ত, তেমনি ফূর্ত্তিও ছিল। "Relay race"এ, আর "Snake trying to bite its own tail" ইত্যাদি খেলায় সবচেয়ে মজা হ'ত। আমাদের মেজর ও কাপ্টেন সব সময় উপস্থিত থাকতেন, আর স্বয়ং সার্জ্জেণ্ট কিং (আমাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতেন। একদিন খেলার সময় সার্জ্জেণ্ট কিং) চোর হলেন। মারের চোটে তাঁর যা অবস্থা হয়েছিল, তা দেখবার মতন। এমনি আমুদে কিং সাহেব যে, কর্পোরাল অরুণ

রায় তাঁকে আস্তে মেরেছিলেন ব'লে অনুযোগ করলেন, বল্‌লেন, "Why don't you beat me as hard as you can?" এ রকম আমোদ প্রায়ই হ'ত। Physical exerciseএর পর ৮৷৷০টা থেকে ১০৷৷০টা পর্য্যন্ত Full uniformএ কোন দিন arms drill, কোন দিন Platoon drill, কোন দিন Bayonet fighting, কোনও দিন Company drill, 'Company in attack' এই সব হ'ত। আবার বিকেল বেলায় ৩টা থেকে ৪৷৷টা পর্য্যন্ত ঐ রকম drillএর পরে আমরা সব খেল্‌তে যেতাম। আপন আপন রুচি অনুসারে কেউ ফুটবল, কেউ হকি খেলতেন; আবার কেউ কেউ দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াতেন। যাঁরা এ দিক দিয়ে যেতেন না, তাঁরা বেশীর ভাগই হয় হারমোনিয়াম, নয় বাঁশী নিয়ে পড়ে থাক্‌তেন। মেজর আর কাপ্টেন কল্ড-ওয়েলও মধ্যে মধ্যে আমাদের সঙ্গে হকি খেলায় যোগ দিতেন। খেলা ছাড়া আর একটা জিনিসে আমরা আমোদ পেতাম বেশী। সেটা হচ্ছে, "Targeting" বা "Musketry", অর্থাৎ লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে শেখা। এটা সকাল বেলায় কিংবা বিকেল বেলায় হ'ত। এতে সার্জ্জেণ্ট দাশ ও ল্যান্স-কর্পোরাল দীনেশচন্দ্র রায় বেশ সুনাম অর্জ্জন করেছেন; কিন্তু sportsএর দিন রাজুদা হয়েছিল ফার্ষ্ট।

বেশ সুখে দিন কাট্‌ছিল আমাদের। কিন্তু ভগবান তাতে বাদ সাধলেন। Campএ আসার প্রথম সপ্তাহের শেষ দিন (৭ই নভেম্বর) ভীষণ বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। শীত কালের বৃষ্টি, তাতে আবার অনবরত ২৪ ঘণ্টা ধ'রে। আমাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। তাঁবুর ভিতর জল ঢুক্‌তে লাগ্‌ল। খাল কেটে আর বাঁধ দিয়েও জল বন্ধ করা গেল না। বাধ্য হয়ে সমস্ত জিনিস-পত্তর নিয়ে যেতে হ'ল গর্দ্দানিবাগে। সেখানে হাইস্কুলে থাকার ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু কতকগুলি অভাগা থেকে গেল camp আর জিনিস-পত্তর পাহারা দেবার জন্য। ললাটের লিখন,—সেদিন আমি ছিলাম Guard commander। রাত্রিবাস করতে হ'ল সেই জনমানবহীন ভিজে জায়গায়। তার পর দিন চার্জ্জ বুঝিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। গর্দ্দানিবাগে এসে শুনলাম যে, স্কুলের সঙ্গে আমাদের ফুটবল ম্যাচ্। বিকেল বেলায় খেলা হ'ল, আমরা এক গোলে জিতে গেলাম। ফুর্‌তির চোটে রাত্রে আমার জ্বর হ'ল। অথ ফলম্—সকাল বেলায় হাসপাতালে গমন! জ্বর ত ভাল হয়ে গে'ল দুদিন পরে; কিন্তু গোদের উপর বিষফোড়া গোছের এক কাণ্ড হ'ল। বেয়নেটের খোঁচা খেয়ে আমার হাঁটুতে সামান্য একটু আঁচড় লেগে গিয়েছিল,—সেই কাটা যায়গা septic হয়ে অসম্ভব রকম ফুলে উঠ্‌ল। Camp শেষ হবার ৪ দিন আগে সেই ঘা operation হ'ল, আর আমিও অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়াতে বাধ্য হয়ে বাড়ী চলে এলাম।

মন কিন্তু পড়ে রইল সেইখানে। তাই একটু ভাল হয়েই ফের ফিরে গেলাম campএ। সেখানে এসে দেখি, আমাদের sports হচ্ছে। পা তখনও' একেবারে ভাল হয়নি বলে, আমি যোগ দিতে পারলাম না; আর সেইজন্য বড় আপশোষ হ'ল। Sportsএ ল্যান্স কর্পোরাল হীরেন্দ্রনাথ সেন সব বিষয়েই বাহাদুরী দেখালেন। প্রায় সবতাতেই ইনি ফার্ষ্ট হয়েছিলেন। Prize বিতরণ করলেন আমাদের Commanding Officer Captain Caldwellএর স্ত্রী।

১৫ দিনের মধ্যে দুদিন রাত্রি ১১টা থেকে ২টা পর্য্যন্ত night parade ছিল। প্রথম দিন আমরা camp থেকে ৬ মাইল দূরে একটা যায়গায় যাই। যেখানে সার্জ্জেণ্ট কিং ৪ জন লোক নিয়ে একটা মস্ত বড় মাটীর ঢিবির নিকটে ছিলেন। এই ৪ জন লোককে একটা দল বলে মেনে নেওয়া হ'ল। কথা ছিল যে, তাঁরা ঐ যায়গাটী রক্ষা করবেন, আর আমরা সেইটা আক্রমণ কর্‌ব। প্রায় রাত্রি ১১টার সময় আমরা যাত্রা করলাম। সেই যায়গা থেকে কিছু দূরে যখন আমরা, তখন আমাদের ২।১ জন হঠাৎ হোঁচোট খেয়ে পড়ায়, আর চাঁদের আলো আমাদের মুখের ওপর পড়ায়, সার্জ্জেণ্ট কিংএর দল আমাদের advanceটা ধরে ফেল্লে। আমি Scouting dutyতে ছিলাম। সার্জ্জেণ্ট কিংএর দল একটা প্রকাণ্ড কুয়ার পাশে আড্ডা গেড়েছিল। এগুতে এগুতে আমি যাঁহাতক সামনে আসা—অমনি "গুড়ুম" শব্দ। আমি মাটীতে শুয়ে পড়্‌লাম। পরে সার্জ্জেণ্ট কিং আমার কাছে এসে বল্‌লেন, "well, you are dead"। আমি গম্ভীর

ভাবে উত্তর কর্‌লাম, "Please then, inform my father!" উত্তর শুনে সার্জ্জেণ্ট ত হেসেই অস্থির। কিছুক্ষণ পরে লড়াই জমে উঠ্‌ল; কিন্তু সার্জ্জেণ্ট কিংএর চালাকিতে পড়ে, আমাদের দল হঠাৎ "between cross fire"এ পড়ে গেল; আর তার ফলে আমাদের পরাজয় ও পলায়ন। আর এক রাত্রে আমাদের "Listening

বয় স্কাউটবেশে কর্পোরাল সমাদ্দার

patrols" বা শত্রুর অগ্রসর কি করে ধরা যায় তাই শেখান হয়েছিল।

Campingএর স্মরণীয় দিন—যে দিন (বুধবার, ১২ই নভেম্বর) আমাদের দানাপুরের Cheshire Regimentএর সঙ্গে encounter বা কৃত্রিম যুদ্ধ হয়। সে দিন আমরা রাত্রি থাক্‌তে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। এক একজনকে ১০ রাউণ্ড করে blank cartridge" দেওয়া হ'ল। আমরা তিন দলে বিভক্ত হয়ে দানাপুরের দিকে এগুতে লাগলাম। Cheshireরা পাটনা আক্রমণ করবে, আর আমরা তাদের আক্রমণ repulse কর্‌ব, অর্থাৎ বাধা দেব। দুই দলে বেলা প্রায় ৮টার সময়, দানাপুর ও পাটনার মধ্যে যে শোন-নদের খাল আছে, তার দুইধারে এসে দাঁড়াল। আমরা আগেই খাল পেরিয়ে যায়গা ঠিক করে নিয়েছিলাম। আমরা সংখ্যায় মাত্র ৬০ জন; তার মধ্যে ৮ জন guard dutyতে campএ ছিল; অর্থাৎ কি না আমরা মাত্র ৫২ জন তাদের ১৮০ জনকে রুখে দাঁড়ালাম। তাদের সঙ্গে মেসিনগান, কামান থেকে sappers ও miners (ট্রেঞ্চ খুড়বার ও রাস্তা করবার জন্য লোক) পর্য্যন্ত এসেছিল। দূর থেকে তাদের পোষাকের বহর, আর ঘোড়ার ওপরে তাদের কর্ণেলকে দেখে, আমাদের চমক লাগ্‌ল। আগেই বলেছি যে, আমরা ভাল জায়গা বেছে নিয়েছিলাম। তাই তারা bridgeএর দিকে আসা মাত্র, একসঙ্গে কতকগুলি গম্ভীর আওয়াজ হ'ল—"গু-ড়্-ম্," "গু-ড়ু-ম্," "গু-ড়ু-ম", আর তারা সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়্‌ল। তার পর অনবরত "blank cartridge"এর আওয়াজ, commanderদের চীৎকার, machine gun এর পড়্ পড়্ শব্দ—এই সব মিলে যেন এক তুমুল কাণ্ডের সৃষ্টি হ'ল। কাণ প্রায় ঝালাপালা হয়ে যাবার যোগাড়। সেই শব্দে দূরে রাস্তায় লোক জমে গেল। তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। রাস্তার একদিকে ধোঁয়া আর আওয়াজ, আর একদিকে একক্কা, টম্ টম্, বগি ও মোটরে লোক কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে।

Cheshireদের machine gunএর ঠেলায় আমরা আস্তে আস্তে খাল পার হবার command পেলাম। খালের মধ্যে প্রায় গলা সমান জল—তাতে আবার পাঁকে ভরা। Bridgeএর ওপর দিয়ে পার হবার সময়ও ছিল না, আর সুবিধেও ছিল না ব'লে সকলেই খালের জল ও পাঁক মেপে অন্য পারে এলাম। আমাদের মধ্যে যারা একটু বেঁটে তাদের

দুর্দ্দশার অবধি ছিল না। প্রাইভেট বিভু ভৌমিক ও নুটু ব্যানার্জ্জির অবস্থা দেখবার মত হয়েছিল। যা'হক, খালের এপারে এসে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। আবার কিছুক্ষণ গুলি-গোলার আওয়াজে কাণ ঝালাপালা হয়ে গে'ল। হঠাৎ "Bugle" বেজে উঠ'ল—"Stop. Stand fast।" এ সঙ্কেত দুপক্ষের জন্যই ছিল; তাই চারদিকের আওয়াজ থেমে গেল। যে যেখানে ছিল, উঠে দাঁড়াল। তখন দেখা গেল যে, Cheshireরা খাল পার হয়ে এসেছে; আর আমরা প্রায় খাল থেকে ১০০ গজ দূরে। কায তখন শেষ হয়ে গিয়েছে। Cheshireরা ভেবেছিল যে, আমাদের ১০ মিনিটের মধ্যে হটিয়ে দেবে। কিন্তু তার বদলে তাদের প্রায় ১৷৷০ ঘণ্টা লেগেছিল। যুদ্ধ শেষ হ'লে Cheshire Regimentএর কর্ণেল আমাদের খুব সুখ্যাতি কর্'লেন। বল্'লেন যে, দু'বছরে আমরা আশাতীত রূপ সাফল্য লাভ করেছি। এ সাফল্যের মূলে ছিলেন—আমাদের কাপ্টেন কল্ডওয়েল, মেজর, ও বিশেষতঃ সার্জ্জেণ্ট কিং। কিং সাহেবই আমাদের শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু। আমরা যে এতক্ষণ Cheshireদের রুখে ছিলাম, তা কেবল মাত্র কিং সাহেবের জন্য। Campএ যখন ফিরে এলাম, তখন ১২টা বেজে গিয়েছে।

Sports যে দিন শেষ হ'ল, তার পর দিন (১৫ই নভেম্বর) আমাদের ফিরবার কথা। মোটের উপর বেশ সুখে ১৫টা দিন কেটে গেল। বাড়ী যাবার ইচ্ছা তখন কারুরই ছিল না। শনিবার দিন সকাল বেলায় আমাদের Inspection হ'ল। বিহার ও উড়িষ্যার এক্সিকিউটিভ্ কাউন্সিলের মেম্বর ও সহকারী সভাপতি অনারেবল সার হিউ ম্যাক্‌ফারসন, শিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রী সার মহম্মদ ফকরুদ্দিন, স্বায়ত্ত-শাসনের মন্ত্রী বাবু গণেশ দত্ত সিংহ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলর মিঃ সুলতান আহম্মদ, শিক্ষা-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর মিঃ ফকাস্ ও এখনকার ডিরেক্টর মিঃ ল্যামবার্ট আমাদের পরিদর্শন করলেন। সার ম্যাক্‌ফারসন, সার ফকরুদ্দিন ও মিঃ সুলতান আহম্মদ আমাদের কাযের প্রশংসা করে ছোটখাট বক্তৃতা দিলেন। এই সব কায শেষ হলে আমরা নাওয়া-খাওয়ার চেষ্টায় গেলাম।

বেলা প্রায় ২টার সময় আমরা মার্চ্চ আরম্ভ করি। আমি এর আগেই আর জনকতকের সঙ্গে ১১৷৷০ সময় জিনিস-পত্তর নিয়ে গরুর গাড়ীর সাথে রওনা হই। তারপর —তার পর আর কি—আরমারীতে ফিরে এসে, জিনিস পত্তর জমা দিয়ে, যে যার বাড়ীর দিকে চল্লাম। Camp lifeএর স্বপ্নরাজ্যের মায়া টুটে গে'ল। বাস্তব রাজ্যে এসে মনে পড়্'ল, একটা অপ্রীতিকর বিভীষিকাময় বাস্তব হাঁ করে রয়েছে—৮ই ডিসেম্বর আমাদের test examination।

এখন আমাদের বিষয় দু'এক কথা বলে প্রবন্ধ শেষ কর্'ব। এখন আমাদের কোরের মোট সংখ্যা এক শত। আমাদের Adjutant হচ্ছেন, Major R. M. Ramsford, Commanding Officer Captain K. S. Caldwell (ইনিই পাটনা কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক) আর Instructor, Sergeant King। সুখের কথা যে, এখন আমাদের full N. C. O. s (অর্থাৎ Sergeants and Corporals) প্রায় সকলেই বাঙ্গালী। কিন্তু একটা দুঃখের বিষয় যে, কিং সাহেব আমাদের ছেড়ে নিজের Regimentএ (Worcester) চলে গেলেন (২৪শে নভেম্বর)। তাঁর বদলে এখন অন্য একজন এসেছেন। কিন্তু আমাদের ভরসা আছে যে, এখন যিনি এসেছেন, তিনি কিং সাহেবের মত আমাদের কার্য্যের সফলতার সহায়তা কর্ব্বেন।

আজের্‌বায়জান্ ও বোখারা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

একটা ফরাসী প্রবাদ বাক্য আছে যে, "যদি তুমি একজন রুষকে আঁচ্‌ড়ে দেখ তা হ'লে দেখবে সে একজন তাতার!" এই প্রবাদ বাক্যটির মধ্যে যে কিছু সত্য আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। তাতারীরা মোঙ্গলীয়দের জ্ঞাতি। তারা রুষিয়ার পূর্ব্বাংশটা সমস্তই ঘুরে বেড়িয়েছে এবং অনাদি কাল থেকে সমগ্র দেশের সঙ্গে কারবার সম্পর্কে তাদের একটা সম্বন্ধ ছিল। অনেকে বলেন তারা চেঙ্গিস্ খাঁর আমলে তাঁর সঙ্গেই এখানে এসে পড়েছিল, কিন্তু প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, তার বহু পূর্ব্বেও রুষিয়ায় তাতারদের অস্তিত্ব ছিল।

আজের্‌বায়জানের মানচিত্র

এই তাতারীরা যে অনেক পরিমাণে রুষের জাতীয় চরিত্রকে প্রভাবান্বিত করে তুলেছিল, সে বিষয়ে এখন আর মতভেদ নাই। পারস্য ও চীন সভ্যতার শিক্ষা ও উৎকর্ষতা তারাই রুষদেশে বহন করে এনেছিল। প্রাচ্য শোণিতের সঙ্গে পাশ্চাত্য 'শ্লাভ' রক্তের সম্মিলন তাদের দ্বারাই সর্ব্বপ্রথম সংসাধিত হয়েছিল এবং প্রাচ্য রাজনীতি ও শাসনপ্রথা প্রতীচ্যে তারাই প্রথম প্রচলিত করেছিল। রুষ জাতির প্রকৃতির মধ্যে একটা হিংস্র ভীষণতার সঙ্গে যে কোমলতা ও বন্ধুত্বের ঔদার্য্যটুকু দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সে কেবল ওই তাতারী সংশ্রবের ফল।

তা ব'লে কেউ যেন না মনে করেন যে, রুষ আর তাতারী বুঝি তবে এক। এক ত তারা নয়ই,—বরং তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ও পরস্পরের অনেক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এখনও দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। তাছাড়া, এই দুটো জাত যে পরস্পরের সঙ্গে একেবারে মিশে যাবে, এরূপ কোনও প্রয়োজনীয়তাও কখনও উপস্থিত হয়নি। তার প্রধান কারণ হচ্ছে, তাদের পরস্পরের ধর্ম্ম ছিল পৃথক। তাতারীরা পুরাকালে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। বৌদ্ধ শ্রমণ

দু'জন তাতারী যোদ্ধা

বেশেই তারা প্রথমে এদেশে পদার্পণ করে; কিন্তু পরে মুসলমানদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের যুগে তারা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়; এবং সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত তারা মুসলমানই র'য়ে গেছে।

রুষ-বিদ্রোহের ফলে যে আজের্‌বায়জান্ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল, তার ইতিহাস একটু বিশেষ রকম চিত্তগ্রাহী; কারণ, এইটিই হ'চ্ছে সর্ব্বপ্রথম মুসলমান গণতন্ত্রমূলক রাজ্য। বাকুপ্রদেশ, ইলাইজাবেতোপোল, কাশ্যপ হ্রদের তীরবর্ত্তী কতকটা স্থান এবং পশ্চিম ক্যাকেসুশ্ পর্ব্বত ও

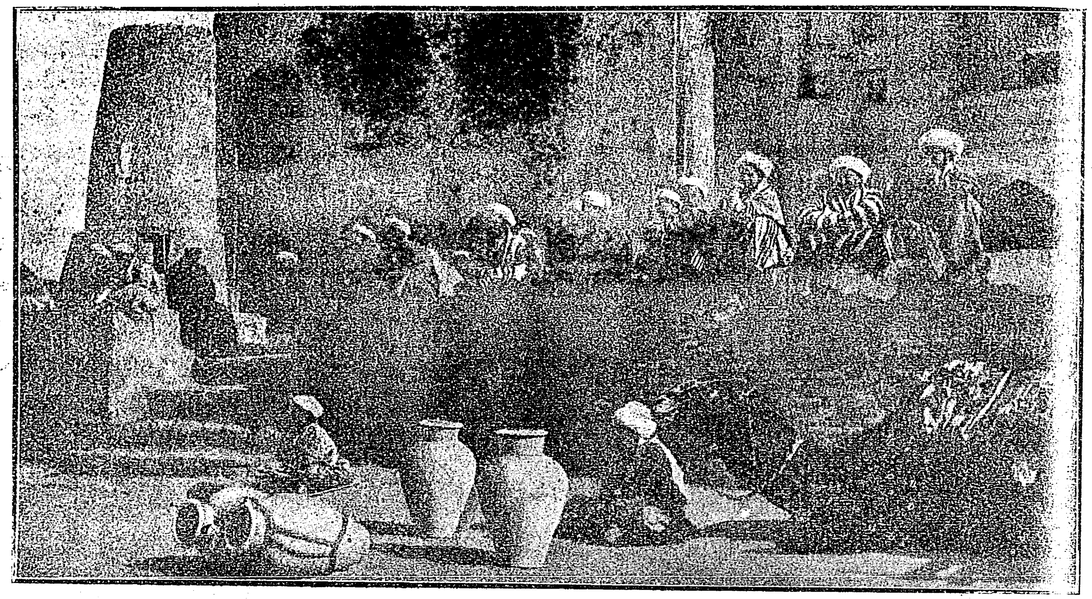

মীর আরব মাদ্রাসা (এটি মধ্য-এশিয়ার একটী প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়)

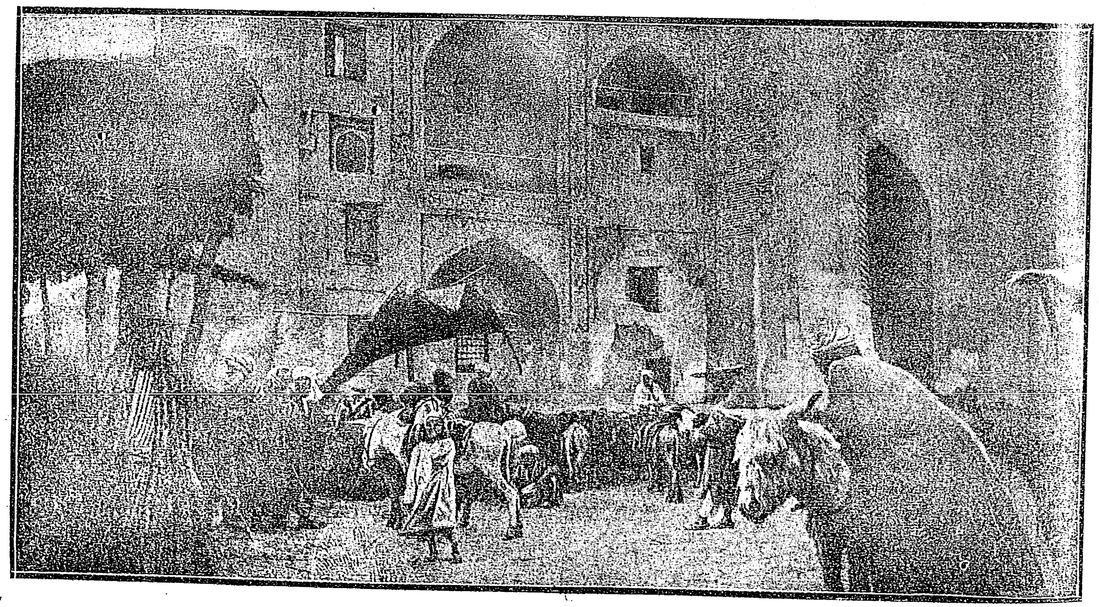

বোখারার চৌরাস্তা

দক্ষিণে পারস্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত এই রাজ্যের বিস্তৃতি। এদেশের অধিবাসীরা অধিকাংশই তাতারী।

এদের চ্যাপ্টা চওড়া মুখ, পীতবর্ণ, ছোট ছোট বাঁকা চোখ, উঁচু চোয়াল, পাতলা চুল, এবং শ্মশ্রুহীন দাড়ী দেখলেই সহজেই এদের রুষ, আর্মেনীয়ান বা জর্জ্জিয়ান নয় বলে চিন্‌তে পারা যায়। মোঙ্গলীয়দের আকৃতি যদিও অনেকটা এই রকমেরই, তবু তাদের চেহারার এই বিশেষত্ব-গুলো এত বেশী রকম সুস্পষ্ট যে, তারা তাতারী নয়—এটা

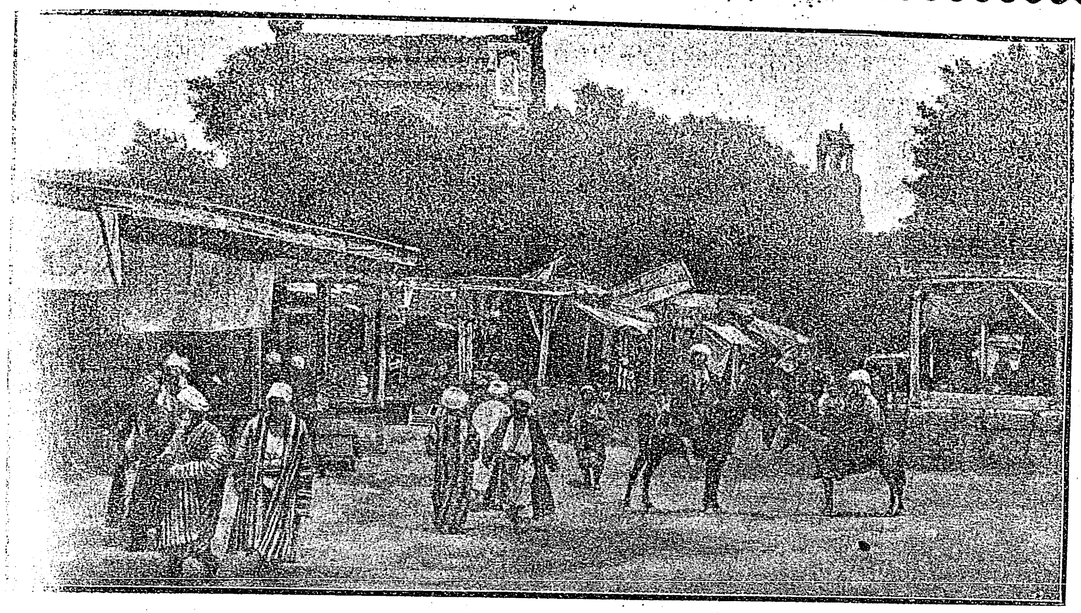

রেজিস্থান বা বোখারার বড়্‌বাজার

পশুলোম ব্যবসায়ীদের বাজার

বেশ বোঝা যায়। তাতারীদের চেহারা মোঙ্গলীয়দের কিম্বা বিদেশী খৃষ্টানদের সঙ্গে তোফা মিলে মিশে চেয়ে সুশ্রী। তারা সকলেই কঠোর পরিশ্রমী, বিশ্বাসী, চতুর ও তৎপর। তাদের সঙ্গে শত্রুতা না করলে তারা বেশ ঠাণ্ডা হ'য়ে তাদের স্বধর্ম্মীদের সঙ্গে থাকতে পারে।

এদের কোনদিনই খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করবার চেষ্টা করা হয়নি। রুষের চাষাভুষো লোকেরা বলে "ভগবান আমাদের

জন্য যেমন খৃষ্টধর্ম্ম দিয়েছেন, তেমনি ওদের জন্য মুসলমান ধর্ম্ম দিয়েছেন।" কেবল জারের রাজত্বকালে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মাঝে মাঝে গুপ্তচর ও ভাড়াটে প্রচারকদের দ্বারা তাদের মধ্যে একটা খৃষ্টান-বিদ্বেষ জাগিয়ে দিয়ে, তাদের ক্ষেপিয়ে তুলে; একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা

ক্যকশীয় দম্পতী।—(এরা বাকুর উত্তরের পাহাড়ের উপর কাঠের ঘর বেঁধে বাস করে। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে একটি ঘোড়াতে চড়েই বেড়াতে যায়।)

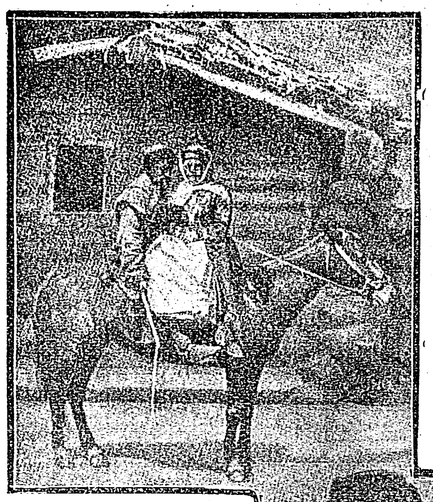

বোখারার তিনজন মোল্লা

সভ্যতার পথে। (এই দুটী তাতারী শিশুর জর্জ্জিয়ান মাতা এদের মাতুলগোষ্ঠীর বেশে সাজিয়ে দিয়েছে। এদের পিতা একজন ধনী ও শিক্ষিত তাতারী।)

বাধিয়ে তাদের হীনবল করে দেওয়া হতো। দুর্ভাগ্যক্রমে তাতারীদের মধ্যে যারা বেশ শিক্ষিত, তারাই ছিল বেশী ধর্ম্মের গোঁড়া। কেবলমাত্র ধর্ম্মপুস্তকের সাহায্যে ও আশ্রম-পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ফলে তাদের হৃদয় উদার, উন্নত ও মন প্রসারিত না হ'য়ে বরং নানা কুসংস্কারের কুটিল আবর্ত্তে পড়ে নীচ ও সঙ্কুচিত হয়ে উঠতো। তার ফলে বিধর্ম্মীদের সঙ্গে তাদের বিরোধ আরও দিন দিন বেড়ে উঠে, পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের পরিখাটাকে উত্তরোত্তর গভীর ও অলঙ্ঘ্য ক'রে তুলেছিল। তাতারী মুসলমান ছাত্রেরা খৃষ্টান ছেলেদের কাফের বলে ঘৃণা করে; আবার খৃষ্টান বালকেরাও মুসলমান ছেলেদের ঈশ্বরে অবিশ্বাসী বলে অশ্রদ্ধা করে। তারা পরস্পর কোন দিনই প্রাণ খুলে মেলা মেশা করে না। সৌভাগ্যবশতঃ তাতারীদের মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম, কাজেই বিরোধ কেবল মুষ্টিমেয় মাত্র লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হ'য়ে আছে। অশিক্ষিত মূর্খ তাতারীরা বেশ দিলদরিয়া, খোসমেজাজী; জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সবাইয়ের তারা সমান খাতির যত্ন করে। কাউকে ঘৃণা করে না।

তাতারীদের মধ্যে অনেকেই এখনও ভবঘুরের মতো দেশ দেশান্তরে বেড়িয়ে বেড়ায়। মেষ পালন তাদের একমাত্র উপজীবিকা। তারা সেই ভেড়ার দল তাড়িয়ে নিয়ে চির জীবনটা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। যারা এক জায়গায় স্থির হয়ে বসবাস ক'রছে, তারা সকলেই কৃষিজীবি। কোনও তাতারপল্লীতে গিয়ে যদি কেউ একরাত্রি আতিথ্য গ্রহণ করে, তাহলে সে কম্বল মুড়ি দিয়ে মোটা পশমী গদীর ওপর বেশ আরামে

বোখারার একটি প্রাচীন গলিপথ

নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিদ্রা যেতে পারবে, কেননা ওদের মধ্যে অতিথির সম্মানটা বড্ড বেশী। অতিথির ধন প্রাণের তারা কিছুতেই ক্ষতি করে না। অতিথিকে দেবতার মত আদর অভ্যর্থনা করে। একটি আস্ত ভেড়া জবাই ক'রে অতিথি সেবার জন্য রেঁধে দেয়, রুটী ও শাক সব্জী ঘরে থাকলে তাও দিতে কার্পণ্য করে না। বাড়ীর কর্ত্তা নিজে পাত্র থেকে উৎকৃষ্ট মাংসের টুকরো বেছে তুলে নিয়ে স্বহস্তে অতিথির মুখে তুলে দেন। এটা হ'চ্ছে অতিথির আগমনে তাঁর আনন্দ জ্ঞাপন করা। তার পর ঘোড়ার দুধ, যাকে বলে তারা "কৌমিস্" পাত্রের পর পাত্র পূর্ণ হ'য়ে অতিথির তৃষ্ণার্ত্ত অধরের সম্মুখে উত্তোলিত হয়।

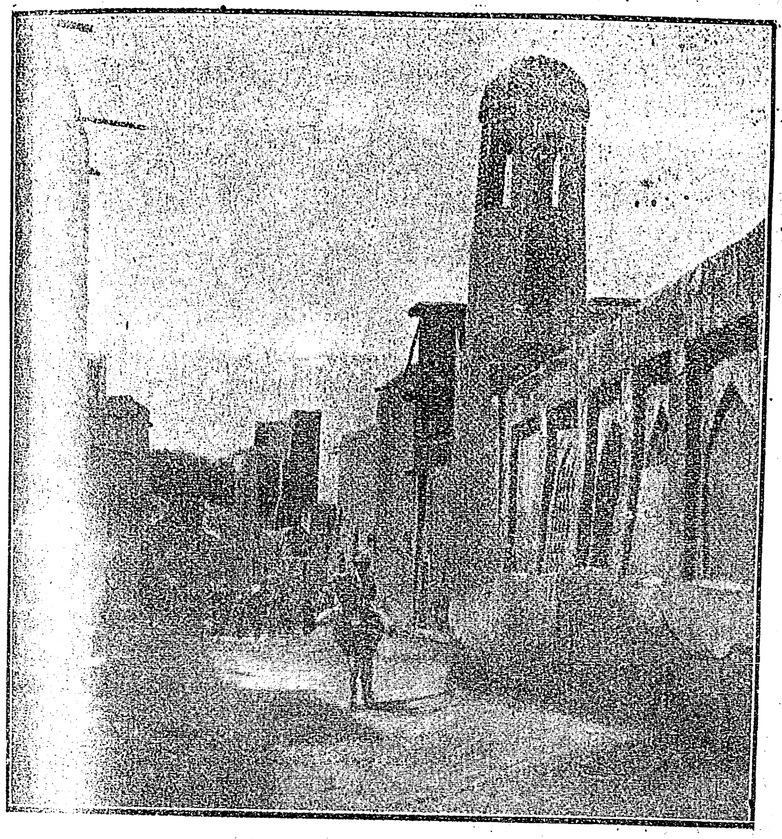

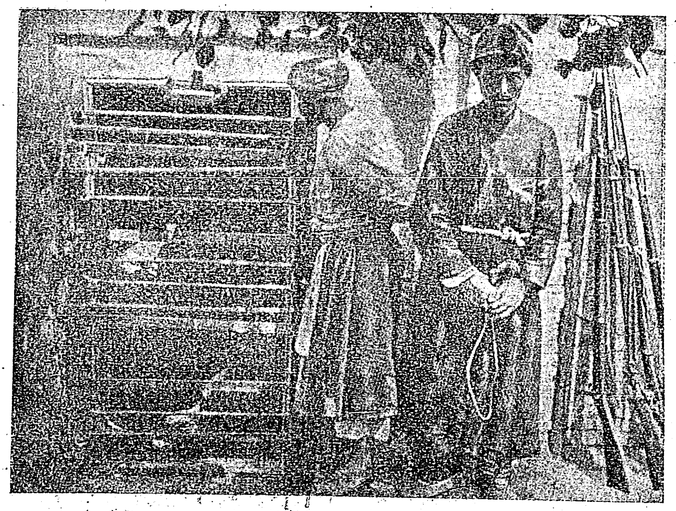

তাতারী মেয়েরা মুসলমানদের চির-প্রচলিত প্রথা অনুসারে বোরখা প'রে মুখ ঢেকে পর্দ্দার আড়ালে থাকে। পুরুষ অতিথির সেবায় তাদের যোগ দেবার কোনও উপায় নেই। সে জন্য অতিথির বিশেষ ক্ষুণ্ণ হবার কোনও কারণ নেই। কেন না তাতারী মেয়ে দেখতেও তেমন সুন্দরী নয় এবং মনোরঞ্জনেও তারা সম্পূর্ণ অপটু। অতিথি সৎকারের পর তাঁর চিত্তবিনোদনের জন্য গীত বাদ্যের আয়োজনও হয়ে থাকে। বাঁশীটাই হচ্ছে তাদের প্রধান বাদ্যযন্ত্র। বাঁশীর সুরের সঙ্গে সঙ্গে তারা নৃত্যও করে, অতিথিরাও সৌজন্য রক্ষার জন্য তাদের সঙ্গে নৃত্যে যোগ দিতে বাধ্য হয়।

আজের্‌বায়জানের প্রধান সহর হ'চ্ছে বাকু। কাস্পিয় হ্রদের একটী সুন্দর তীরে এই সহরটি প্রতিষ্ঠিত। জলের উপর থেকে এই সহরের শাদা বাড়ীগুলি কোন্‌টি পাহাড়ের উপর, কোনটী বাগানে ঘেরা,

আমীরের প্রাসাদ অভ্যন্তরস্থ কারাগার (দ্বারের বহির্দ্দেশে প্রহরী ও ঘাতক দাঁড়িয়ে)

বড় চমৎকার দেখায়। পেট্রোলিয়ম তেলের কারবারে যাঁরা বহু অর্থ উপার্জ্জন ক'রে লক্ষপতি হ'য়েছেন, তাঁদের

মধ্যে অনেকেই এই বাকু সহরে ইন্দ্রভবন তুল্য সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেছেন। তা ছাড়া বড় বড় সরকারী বাড়ীও বাকুতে অনেকগুলি আছে।

বাকুর উত্তরে মাইল দশেক দূরে একটি অগ্নিপূজকদের মন্দির আছে। এই মন্দিরটি পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম। পারস্যের প্রাচীনতম অগ্নি-পূজা-পদ্ধতি এখনও সেই মন্দিরে পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে। দূর দেশ বিদেশ থেকে বহু তীর্থযাত্রী এই মন্দিরে কোন্ অজ্ঞাতকাল থেকে প্রজ্বলিত সেই অগ্নিশিখা দর্শন করতে আসে। বাকু এককালে পারস্যের শাহ সম্রাটদেরই সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রুষেরা পারস্যের নিকট হ'তে বাকু জয় ক'রে নিয়েছিল। সেই থেকে বাকু যদিও রুষের অধিকারেই ছিল তথাপি এর নাম বড় একটা কেউ শুন্‌তে পেতো না। তার পর ঊন-বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন প্রকাশ হ'ল যে, বাকুতে পেট্রোলিয়ম তেলের খনির সন্ধান পাওয়া গেছে, তখন জগতের দৃষ্টি এই বাকুর উপর এসে পড়ে। রুষ গভর্ণমেণ্ট সেই সময় বাকুর কতকটা জমী ইজারা দিয়ে প্রায় পনের লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করেছিলেন। তখন লোকের ধারণা ছিল যে, বুঝি কেবলমাত্র ওই বিশেষ স্থানগুলিতেই তৈলের খাদ আছে। কিন্তু শীঘ্রই জান্‌তে পারা গেল যে, বাকুর তৈল ভাণ্ডার অফুরন্ত ও অতল-স্পর্শী। এমন কি আমেরিকার জগদ্বিখ্যাত তৈলখনিগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাকুই

জনৈক দরবেশ

আজেরবায়জানের কয়েকজন বিভিন্ন জাতীয় স্ত্রীপুরুষ
(এদের পোষাকের পার্থক্য থেকে জাতিভেদ বোঝা যাচ্ছে)

শেষে শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী বলে প্রতিপন্ন হ'ল। তার পর থেকে অসংখ্য ব্যবসায়ীর দল সেখানে এসে পড়ে, বাকু অঞ্চলটাকে একেবারে তেলের কারখানার একটা বিকট মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করে ফেলেছে। বাকু প্রদেশের অনেকেটা স্থান এমন বীভৎস দেখতে হয়েছে যে, বাকু-বাসীরা সে জায়গাটার নাম রেখেছে 'শয়তানের বাজার।' কেবলমাত্র এই তেলের খনির জন্য আজেরবায়জান্ অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর একটা সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী রাজ্যে পরিণত হবে। তৈলখনি আবিষ্কৃত না হ'লেও বাকু কোনও দিন দরিদ্র দেশ বলে পরিগণিত হ'ত না; কারণ,

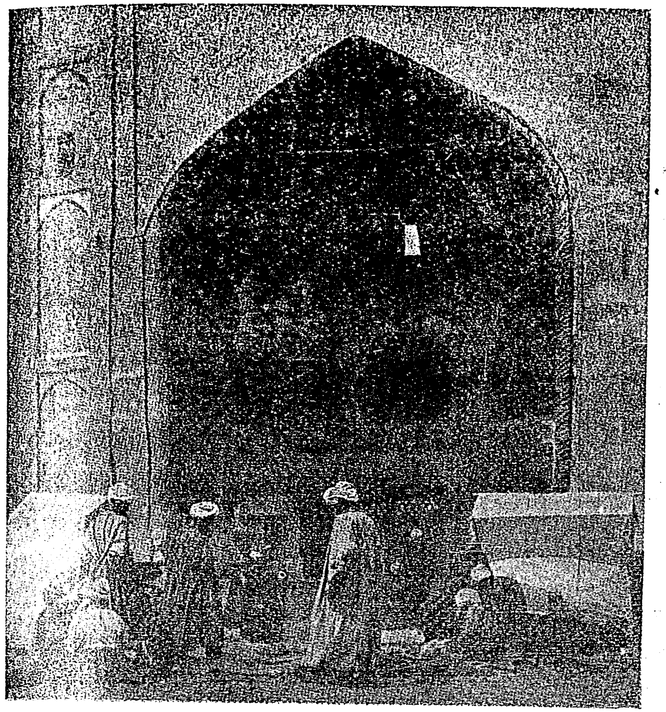

বোখারার বিদ্যাপীঠ (ছাত্র ও শিক্ষকেরা জলযোগ করিতেছে)

বাকুর জমী অত্যন্ত উর্ব্বরা। মৎস্য ব্যবসায়ের জন্যও বাকুর সম্পদ বড় অল্প নয়। নানাবিধ সুস্বাদু মৎস্যের জন্য বাকুর প্রসিদ্ধি আস্ত্রাখানের অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নয়। অরণ্য-সম্পদেও বাকু বড় কম যায় না। ওক প্রভৃতি মজবুত ও দামী কাষ্ঠও সেখানে প্রচুর পরি-মাণে উৎপন্ন হয়।

আজের্‌বায়জানের কোনও অভাব নেই, কেবল চাই সেখানে এখন অচলা শান্তি। দেশের অধিবাসীরা সবাই শান্তির প্রয়াসী বটে; কিন্তু তারা শান্তি স্থাপনের ঠিক উপায় নির্দ্ধারণ ক'রতে পারছে না। এটা যেন তাদের একটা সমস্যা হ'য়ে উঠেছে। প্রথমে তারা জর্জ্জিয়া ও আর্মেনিয়ার সঙ্গে মিলিত হয়ে একটা ককেশীয় স্বাধীন যুক্তরাজ্যে পরিণত হয়েছিল; কিন্তু সে ক্ষণস্থায়ী বসন্তকে গ্রাস করে সত্বর সেখানে নিদারুণ গ্রীষ্ম অবস্থায় বর্ষাধিক কালও তারা থাকতে পারলে না—শীঘ্রই এসে আত্মপ্রকাশ করে। নবমুঞ্জরিত কুসুমাকীর্ণ

বাকু-প্রবাসী একদল পারসিক। (প্রাচীন পারসিকরাই এদেশে এসে সর্ব্বপ্রথম বাকুর তৈল-খনির সন্ধান পায়। এরাই এ দেশের নাম রেখেছিল 'আজেরবায়জান'। আজেরবায়জান্' মানে "অনন্তশিখ তীর্থ" অর্থাৎ যে দেশে অগ্নিশিখা চির-অনির্ব্বাণ)

বলশেভিকদের আক্রমণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল! তার পর ১৯২২ সালে রুষিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তারা আবার সেই মিলিত গণতান্ত্রিক রাজ্যের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করেছে।

বোখারা একটি প্রাচীন দেশ। পৃথিবীর পুরাতন যুগে এক সময়ে এই বোখারা আপন গৌরবে গরবিনী এক রঙ্গিলা দেশ বলে বিখ্যাত ছিল। আজ তার সে গৌরব-চূড়া ধ্বংস হয়ে গেছে। অতীতের তুলনায় আজ সে বিগত-শোভা, বিচূর্ণ গর্ব্বের ভগ্ন স্তূপে পরিণত। বর্ত্তমান বোখারা অবস্থা-বিপর্য্যয়ের এক চরম নিদর্শন রূপে ভূপৃষ্ঠে এখনও বিরাজ করছে।

বোখারার পূর্ব্ব ও মধ্যভাগ পর্ব্বত সমাকুল এবং এর বিস্তৃত মরুপ্রান্তর হয় ত এত দিন মনুষ্য বাসের অযোগ্য হ'য়ে উঠ্‌তো, যদি না হেমন্তের তুষাররাশি বিগলিত হয়ে শীতান্তে প্রতি বৎসর একে সরস ক'রে তুলতো।

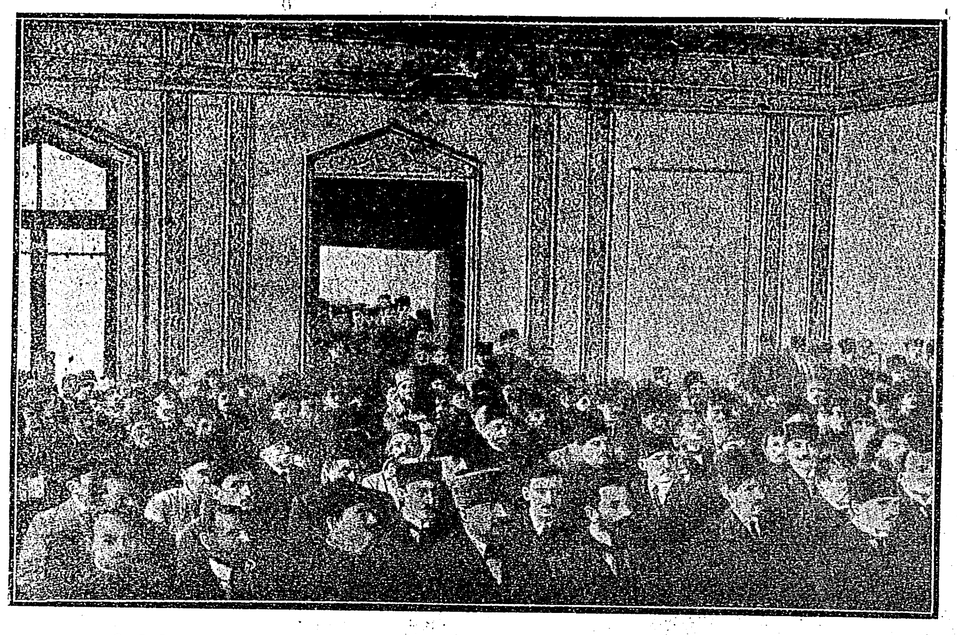

গণতন্ত্রবাদী শিক্ষিত তাতারী দল (এরা সকলেই শাসন পরিষদের সভ্য। নবযুগের তরুণ-পন্থী তাতারীরা সকলেই য়ুরোপীয় বেশভূষার অনুকরণ করেছে ; কেবল শিরঃ শোভাটা এখনও বদলায়নি।)

তরুতৃণরাজি দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভীষণ আতপতাপে দগ্ধ পাদপে পরিণত হয়ে যায়। সেখানকার আবহাওয়া কখন হিমাঙ্কের (Freezing point) মাত্রা ছাড়িয়ে একেবারে ৪৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত নীচেয় নেমে যায় —আবার গ্রীষ্মের দিন তাপাঙ্কের ১২২ ডিগ্রী উপরেও উঠে! এই সময় সেখানে লু' ছোটে, তপ্ত ধূলাবালির আঁধিয়া উড়ে সূর্য্যকে পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলে।

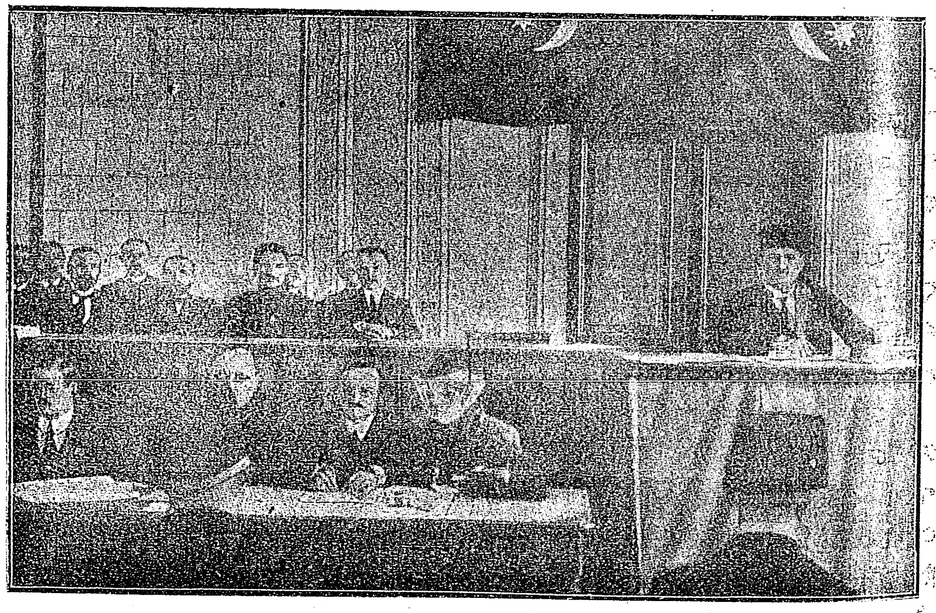

প্রজাতন্ত্রমূলক শাসন পরিষদের প্রথম অধিবেশন

বোখারার আমীরের অধিকার-সীমানা প্রধানতঃ পূর্ব্বদিকে ক্ষিভা থেকে আলাই পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। জারাফ্‌শান থেকে সেই সীমা-রেখা বেঁকে 'ন্যু রা তা ও'কে বেষ্টন করে প্রায় দক্ষিণে প্রসারিত হয়েছে, এখান থেকে উঠে আবার সেই দাগ উত্তরে সামারখান্দ্ গিরিশ্রেণীর পূর্ব্ব পার্শ্ব পর্য্যন্ত চলে গেছে। দক্ষিণে আমুদরিয়া বা অক্ষস্ নদী এবং পশ্চিমে বিশাল কারাকুম মরুভূমি।

বোখারা সহরের চারিদিকে ২৩ ফুট উঁচু দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সহরটা দেখলেই প্রথমটা কেমন যেন মনে একটা নির্জ্জনতার নিরুৎসাহ ভাব এসে পড়ে। ঢালা ছাদওয়ালা পাশাপাশি বাড়ীগুলোর ভিত্তি গাত্র সেখানকার

রাজপথ এমন কি গম্বুজ কটা পর্য্যন্ত যেন বর্ষাধারার মতো বাণবিদ্ধ বলে মনে হয়। সেখানে সূচ্যগ্র কোনও চূড়া নেই ; মীনারের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প, তবে মস্‌জেদ্ ও মাদ্রাসার বাহুল্য সে অভাব অনেকখানি মোচন ক'রে দিয়েছে। সহরের ঠিক মাঝখানে পাহাড়ের উপর আমীরের প্রকাণ্ড প্রাসাদ, তার নাম আরক্। প্রাসাদের চতুঃপার্শ্ব উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা। সহরের স্থানে স্থানে জর্দ্দালু বা খুবানী

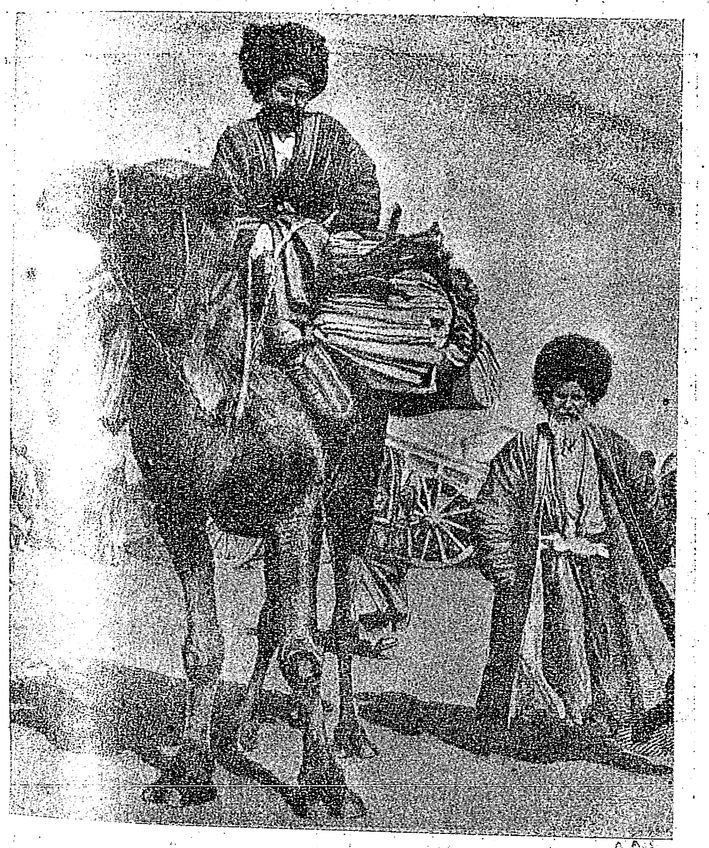

তাতার ব্যাপারী। (উটের পীঠে ভেড়ার চামড়া বোঝাই করে বাজারে চলেছে।)

গাছ, দেবদারু, মজ্‌নু বা উইলো গাছ এবং আখরোট্ গাছ আছে। এই সব গাছ বাড়ীর ছাদ ছাড়িয়ে উঠেছে দেখা যায়। মাঝে মাঝে হৌজ্, বা জলাশয়ের ধারে সবুজ কুঞ্জ দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।

গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে বড় একটা কাউকে বাইরে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না ; কিন্তু প্রভাতে ও অপরাহ্নে শ্বেত-উষ্ণীষধারীরা এমন দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে যে, রাস্তাঘাট দেখে মনে হয়, যেন শরতের শুভ্র কাশগুচ্ছ বাতাসে দোল খাচ্ছে! নিদাঘের স্তব্ধ মধ্যাহ্নে কাউকে দেখা না গেলেও অনেকেরই সাড়া পাওয়া যায় কিন্তু! কোথাও বা কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'রছে, গর্দ্দভের চীৎকার উঠছে, আবার ঘুঘু পাখীর কোমল সুর এবং সারসের কর্কশ সঙ্গীতও তার মাঝেমাঝে ভেসে আসছে। রাস্তা দিয়ে সারা দিন উটের গাড়ী ঘোড়সোয়ার ও ভারবাহী গর্দ্দভের মিছিল চলেছে দেখা যায়। বোখারার সামাজিক জীবনের কতকটা সজীব চিত্র দেখ্‌তে পাওয়া যায় সেখানকার হাটে, বাজারে, ঘাটে, ময়দানে বা কুয়োর পাড়ে। এই সব আড্ডায় প্রাচ্যের সুচারু রঙীণ বেশভূষায় সুসজ্জিত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতীয় লোককে দেখতে পাওয়া যায়।

বোখারার ধাতুদ্রব্য নির্ম্মাণকারকেরা বিশ্ববিখ্যাত। এদিও তারা এখনও সেই সাবেক মামুলি পদ্ধতিতে হাপোর, হাম্বোর, হাতুড়ী হাতেই পিটে, পুড়িয়ে, ঝেলে কিম্বা ছেনি দিয়ে কেটে কাজ ক'রছে, কলকব্জা বা মোটর ইলেকট্রিকের সাহায্য নেয়নি, তবু তাদের হাতের কাজ শিল্প-দক্ষতায় আজও পর্য্যন্ত যন্ত্ররাজ্‌কে ছাড়িয়ে চলেছে। চামড়ার কাজেও বোখারার মিস্ত্রীরা খুব সুদক্ষ। মীর-আরব মাদ্রাসা ও নাস্তি-কালান মস্‌জিদের মাঝখানে যে মাঠ পড়ে আছে, সেখানে তুলোর বাজার বসে। এই তুলোর বাজার একটা দেখ্‌বার জিনিস। এইখানে তুলো গাঁট বাঁধা হ'য়ে উটের পিঠে বোঝাই হ'য়ে দেশ বিদেশে চালান হয়। ফলের বাজারও বেশ সুদৃশ্য। উঁচু উঁচু কাঠের চৌকীর উপর পরিপাটী করে ফলগুলি সাজানো, এবং দড়ীর বা তারের আলনায় আঙুর আপেলের গুচ্ছগুলি ঝুলানো—দেখ্‌তে ভারি সুন্দর লাগে। এই ফলের বাজারে এলে বোখারার বোর্‌খা-পরা সুন্দরীদের দুর্লভ দর্শনলাভের সৌভাগ্য ঘটে বটে ; কিন্তু রূপ-পিপাসুর আঁখি তাতে তৃপ্তিলাভ করতে পারে না। বোর্‌খার সেই যুগল জালাবরণ ভেদ ক'রে সুন্দরীদের চপল আঁখি-পাখী

দু'টিকে দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ করতে না পেরে শিকারীরা ব্যর্থকাম হ'য়েই গৃহে ফিরে আসে।

কার্শী সহরটি বোখারার মধ্যে ফুলবাগানের জন্য বিখ্যাত। পূর্ব্বে এ সহরটী ছিল সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছোরা-ছুরীর জন্মস্থান বলে প্রসিদ্ধ। রাজা-রাজড়া নবাব বাদশাদের কোমরবন্ধে গুঁজে রাখবার মত সৌখীন ও মূল্যবান অথচ তীক্ষ্ণধার ছুরি আগে এই কার্শী ছাড়া আর কোথাও তেমন ভাল পাওয়া যেতো না। এই সহরের লোকসংখ্যা মাত্র পঁচিশ হাজারের বেশী হবে না। তারা অধিকাংশই উজবেগ্। কার্শীর পরই 'সহর-ই সাবাজ্' বা সবুজ শহরের নাম করা যেতে পারে। সবুজ সহরের লোকসংখ্যা প্রায় বিশ হাজার হবে। এ সহরটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। এই সহরের এলাকার মধ্যে নব্বুইটি মস্‌জিদ্ আছে। সবুজ সহরের পাশেই হচ্ছে 'কীতাব' নগর। এখানে আমীর সাহেব মাঝে মাঝে এসে বাস করেন। এই সহরে আমীরের বৃহৎ একটি সেনানিবাস আছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়েও এ সহরগুলির এবং আরও অন্যান্য কয়েকটি সহরের বিশেষ প্রাধান্য আছে। আমীর যদিও এখানকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তবু তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন না। রুষ গভর্মেণ্টের প্রতিনিধির সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁকে রাজদণ্ড পরিচালনা ক'রতে হোতো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রুষ গভর্মেণ্টই ছিল এখানকার প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ। কিন্তু রুষিয়ায় সোভিয়েট্ শক্তি প্রবল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলশেভিক আন্দোলনের সময় বোখারা রুষের কবল থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯১৯ সালের আগষ্ট মাসে তরুণ উজবেগের দল আমীর সৈয়দ্ মীর আলীকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে সেখানে গণতন্ত্রমূলক শাসন-প্রথার প্রবর্ত্তন ক'রেছে। বোখারার আমীর দেশত্যাগ ক'রে উপস্থিত আফ্‌গানীস্থানের আমীরের অতিথিরূপে বাস করছেন।

বোখারার সৈন্যদল য়ুরোপীয় প্রণালীতে যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত হয়েছে। রুষ থেকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা ক'রে এসে বোখারার সৈন্যাধ্যক্ষগণ দেশীয় সৈন্যদলকে রুষ রণনীতি মতে সুশিক্ষিত করে তুলেছে। সৈন্যদের পোষাক পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্রও সমস্ত রুষের অনুকরণে প্রস্তুত।

বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন অবস্থা ও প্রাকৃতিক আবহাওয়ার পার্থক্য অনুসারে সেখানকার লোকেদের জীবনযাত্রার রীতি ও পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন রকম। কোথাও বা তারা চাষ আবাদ ক'রে দিনাতিপাত ক'রছে। কোথাও বা তারা ছাগল-ভেড়া ইত্যাদি পালন করে জীবিকা নির্ব্বাহ ক'রছে, কোথাও বা কেবল ব্যবসাদারীটাই বেঁচে থাকবার একমাত্র উপায়। বোখারাবাসীদের মধ্যে পারস্য দেশীয়রাও তুর্কজাতি-উদ্ভূত উজবেগরা—এই দুই জাতের লোকের সংখ্যাই বেশী। আরববাসীও আছে; তবে তাদের সংখ্যা

পাঠশালা (মেষচর্ম্মের উষ্ণীষ পরা একজন তুর্কমান ও টুপী মাথায় শ্মশ্রুধারী জনৈক উজ্‌বেগ এই পাঠশালা পরিদর্শন করতে এসেছে।)

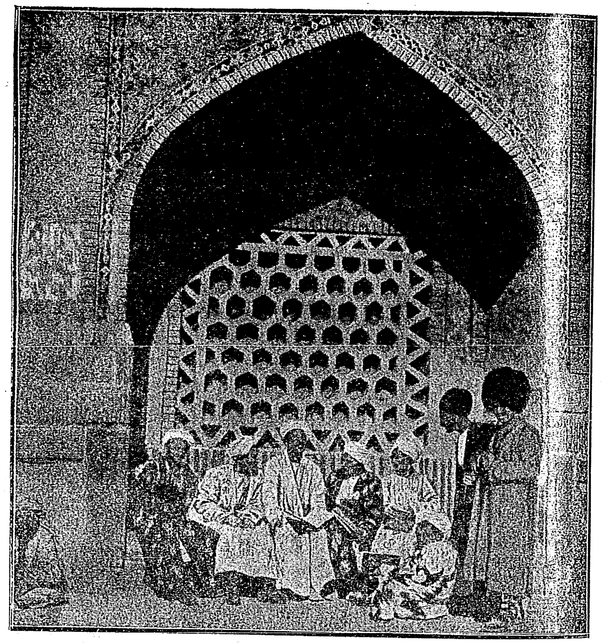

মসজেদের সম্মুখে। (উপরে নামাজকারিগণ, পথে উষ্ট্রসহ একজন মরু-পথিক)

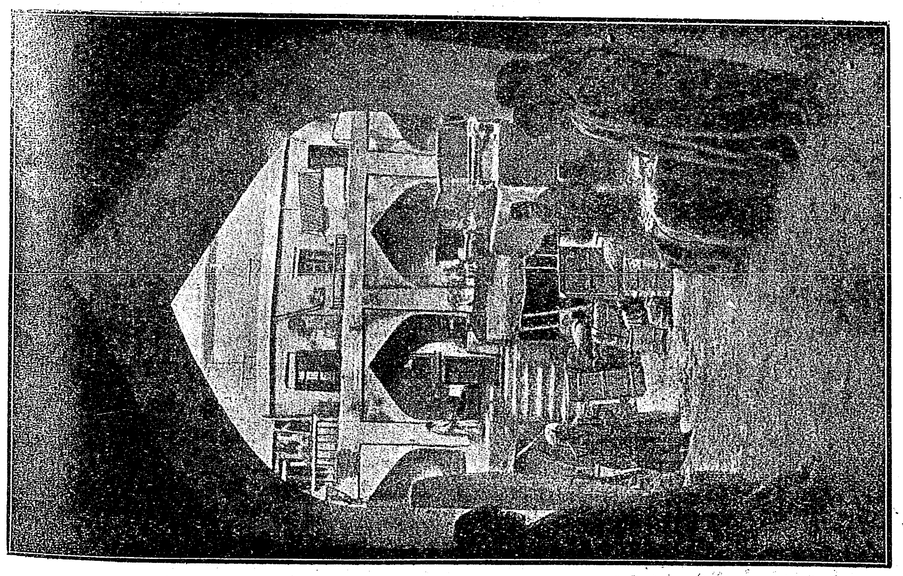

বোখারার একটি পুরাতন সরাইখানা

নিতান্তই কম। বোখারায় হিন্দুও আছে বিস্তর, কিন্তু তারা কেউ সেখানে ঘরবাড়ী তৈরী করে বাস করে না। তাদের অনেকেরই ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে অল্প দিনের জন্য সেখানে থাকা। তাছাড়া মহাজনী কারবারটাও সে অঞ্চলে হিন্দুদের যেন একেবারে একচেটিয়া। য়িহুদি, আর্ম্মেণীয়ান ও জীপ্‌সীদেরও সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। বোখারার পাহাড়ীরা, 'তাজিক্' নামেই পরিচিত। তাজিকরা পাহাড়ী বটে কিন্তু দুর্দ্দান্ত নয়। ঠাণ্ডা মেজাজের লোক, চাষবাস করবার প্রতি তাদের বিশেষ অনুরাগ আছে। কি পাহাড়ী, কি সহুরে—তাদের সবাংই চেহারাটা কিন্তু ভারি সুন্দর। তাজিক্ মেয়েরা সবাই অপূর্ব্ব রূপসী। যদিও দেখতে তারা ঈষৎ খর্ব্বকায়, কিন্তু মুখের গঠন তাদের ভারি সুন্দর। চোখদুটি যেন পটোলচেরা, বেশ দীর্ঘায়ত ভ্রমরকৃষ্ণ আঁখিতারা। মাথায় মেঘের মতো একরাশ কালোচুল। সর্ব্বদা—অবগুণ্ঠনাবৃত ও পর্দ্দা-নসীন থাকতে হয় বলেই তাদের গৌরবর্ণ তেমন উজ্জ্বল নয়, বরং একটু যেন পাণ্ডুর। পূর্ব্বেই বলেছি যে উজ্‌বেগদের মোঙ্গলীয়ানদের সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। তবে এদের চেহারা আরও ভাল এবং চোখদুটিও একটু বড় বড় আছে। কিন্তু তাজিক্‌দের চেহারার সঙ্গে উজ্‌বেগদের তুলনাই হয়না। তাজিকরা অবয়ব সৌষ্ঠবে উজবেগ্‌দের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। তুর্কমানরা এখন চাষবাস করে বটে, কিন্তু এক সময় তারা যাযাবর ছিল। এদের কোনও কোনও দল এখনও স্থায়ীভাবে এক জায়গায় বসবাস করে না। কীরগীজ্‌দের মতো কম্বলের তাঁবু খাটিয়ে আজ এখানে কাল ওখানে করে ঘুরে বেড়ায়। এরা কেউ লিখতে পড়তে জানে না। যাদের পয়সা আছে তারা একজন তাজিক্ মোল্লাকে মাইনে ক'রে রাখে তাদের লেখাপড়ার কাজ চালাবার জন্য। এই তাজিক্ মোল্লারা এক রকম জোর ক'রেই তাদের ছেলে মেয়েদের একটু আধটু লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করে। বোখারার অধিবাসীদের ভাষা হ'চ্ছে 'চাঘতাই'। 'চাঘতাই' তুর্কীভাষারই একটা গ্রাম্য রূপ। 'চাঘতাই' ভাষায় কথা বলতে পারলে যে কোন বিদেশী বোখারার সর্ব্বত্র বেশ স্বচ্ছন্দে ঘুর বেড়াতে পারেন।

একজন ভিখারিণী

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বোখারায় খৃষ্টধর্ম্মই প্রচলিত ছিল, কিন্তু সপ্তমশতাব্দীতে সেখানে ইস্‌লাম ধর্ম্ম ও পার্শী অগ্নিপূজকদের ধর্ম্মও প্রবেশ করেছে দেখা যায়। এই দুই শেষোক্ত ধর্ম্মের মধ্যে দিনকতক ঘোর প্রতিযোগিতা চলেছিল প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা নিয়ে! শেষকালে হ'ল ইস্‌লাম ধর্ম্মেরই জয়। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে সমস্ত বোখারায় ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিস্তৃত হ'য়ে প'ড়ল। ঘরে ঘরে কোরাণ পাঠও সুরু হয়ে গেল। কেবল বোখারার পূর্ব্বাঞ্চলবাসীদের মধ্যে ঋষি জরাথুস্ত্রের প্রবর্ত্তিত

প্রাচীন পারসীক ধর্ম্ম এমনই গভীর-ভাবে প্রবেশ করেছিল যে প্রবল ইস্‌লাম ধর্ম্মের বন্যা তাকে কিছুতেই স্থানচ্যুত করতে পারেনি। তাই সেখানে অগ্নি-পূজার মন্দির ও অগ্নিপূজক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব এখনও দেখতে পাওয়া যায়। সুফী সম্প্রদায়ের প্রাধান্যই ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী বোখারায় এখন সকলের চেয়ে বেশী।

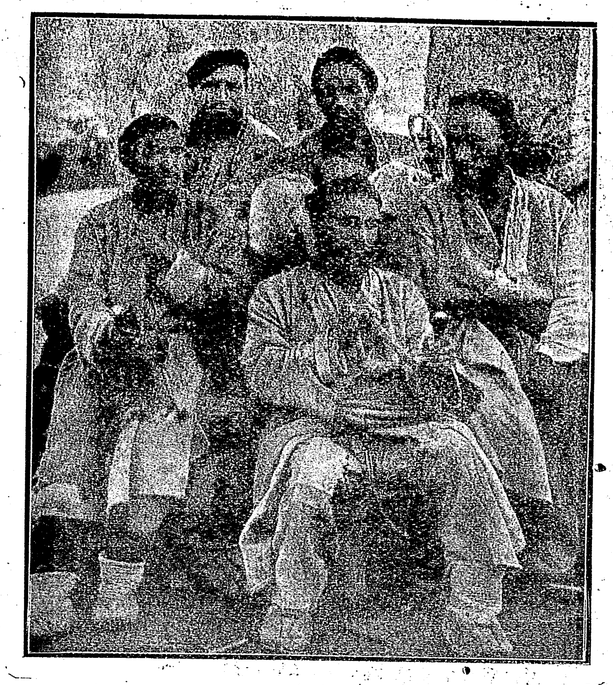

একদল উজ্‌বেগ।

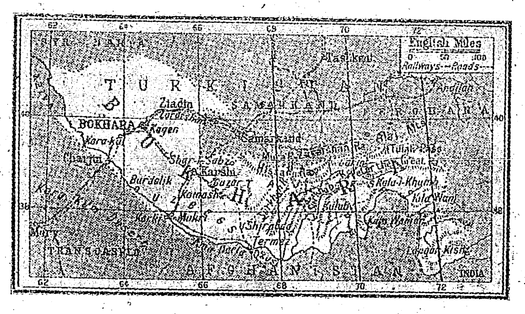

বোখারার মানচিত্র।

বোখারা-বাসীদের আমোদ-প্রমোদ অধিকাংশই ধর্ম্ম-সংক্রান্ত উৎসব ব্যাপারের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। শিকার করাও তাদের একটা প্রধান ব্যসন। মেড়ার লড়াই, মুর্গীর লড়াই প্রভৃতিও তাদের সৌখীন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিশেষ আমোদ রূপে গণ্য। নাচ্‌টাও তারা খুব ভালবাসে। তবে স্ত্রীলোকেরা পর্দ্দানসীন ব'লে সেখানে মেয়ে নর্ত্তকীর পরিবর্ত্তে কিশোর বালক নর্ত্তকের দলই নাচের মজ্‌লিশ রক্ষা করে।

পীড়াগ্রস্ত হ'লে তারা ডাক্তার বা হকিমের ধার ধারেনা। টোট্‌কা ওষুধ ও দৈবী দাওয়াই ব্যবহারেরই তারা বেশী পক্ষপাতী। তাবিজ, পদক, ধুকধুকী, মাদুলী, এসবের প্রচলন তাদের মধ্যে খুব বেশী। ঝাড়ফুক্ মন্ত্র-তন্ত্র প্রভৃতি বুজরুকীতেও তারা যথেষ্ট আস্থাবান।

খাদ্য তাদের প্রধানতঃ টাট্‌কা ফল মূল, রুটী, ভাত, আর চা। বাদাম পেস্তা কিস্‌মিস্ আখরোট খোবাণী খেজুর এসবেরও তারা খুব ভক্ত। তরমুজ তাদের একটা সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। মাংস তারা খায় বটে, কিন্তু খুব কম। প্রত্যহ কেউই মাংস খায়না। খাবার জন্য তারা তৈজস পত্রের তোয়াক্কা রাখে না। একখানা রুমাল বা তোয়ালে বিছিয়ে তার উপর খাদ্য সাজিয়ে নিয়ে খেতে বসে যায়।

নানা কথা

তুলসী

ভিষগ্‌রত্ন কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী,
কবিশেখর এল-এ-এম-এস, এচ-এম-বি

হিন্দুর নিকট তুলসী যতটা পবিত্র বস্তু এমন আর কিছু নহে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর পূজার প্রধান বৃক্ষই হইতেছে তুলসী। যিনি যাঁহারই উপাসক হউন না কেন, তুলসীর আদর সকল উপাসককেই সমান ভাবে করিতে হয়। বাস্তবিক বলিতে কি, হিন্দু আমরা, আমাদের নিকটে বিষ্ণু অপেক্ষাও তুলসী যেন বেশী প্রিয় ও প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। আমি এ কথা যে অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতেছি তাহা নহে। স্বয়ং ভগবানকেও এ কথা স্বীকার করিতে হইয়াছে। "হরিভক্তি-বিলাসে" আছে,—

"তুলসী দল মাত্রেন জলস্য চলুকেন বা
বিক্রীনীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥"

অর্থাৎ—ভক্তি পূর্ব্বক তুলসীদল বা জলাঞ্জলি দিবা মাত্রই ভক্তবৎসল শ্রীহরি ভক্তদিগের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলায় আমরা দেখিতে পাই,—

"কৃষ্ণকে তুলসীজল দেয় যেই জন,
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন
'জল তুলসীর সম কিছু নাহি অন্য ধন।
তারে আত্মা বেচি করে ঋণের শোধন।'
এত ভাবি আচার্য্য করেন আরাধন ;
গঙ্গাজল তুলসী মঞ্জুরী অনুক্ষণ
কৃষ্ণ পাদপদ্মে করেন সমর্পণ।"

'চণ্ডীদাস' কৃষ্ণ পাদপদ্মে যখন দেহ সমর্পণ করিতেছেন, তখন তিনি এই বলিয়া আত্মনিবেদন করিতেছেন,—

কানু অনুরাগে এ দেহ সঁপিনু, তিল তুলসী দিয়া।"

এত বড় কথা আর কেহ বলিতে পারিয়াছেন কি না জানি না। কারণ, তিল তুলসী দিয়া যে দান করা যায়, তাহা আর ফিরাইয়া লওয়া যায় না—ইহাই মানবের শেষ দান।

শ্রীশ্রীপাগল হরনাথ বলেন—"তুলসীর ছোট বড় নাই।' ইহা খাঁটী সত্য কথা।

তুলসী সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা লিখিয়াছেন। আমি আর সে কথা বলিতে চাহি না। তুলসী যে কেবলই আমাদের ধর্ম্মপথের সহায়—পূজার প্রধান বৃক্ষ—এ সব কথা বলিয়া তুলসী-মাহাত্ম্য বাড়াইতে চাহি না। তুলসী আমাদের কতটা প্রয়োজনীয় বৃক্ষ, সেই কথাই বলিব।

তুলসীর রোগনাশিনী শক্তি সম্বন্ধে 'আয়ুর্ব্বেদ' শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—

"তুলসী কটুক্য তিক্তা হৃদ্যোষ্ণা দাহপিত্তকৃৎ।
দীপনী কুষ্ঠকৃচ্ছ্রাস্র পার্শ্বরুক্কবাতজিৎ ॥
শুক্লা কৃষ্ণা চ তুলসী গুণৈস্তুল্যা প্রকীর্ত্তিতা।"

অর্থাৎ :—তুলসী—কটু, তিক্তরস, হৃদয়গ্রাহী, উষ্ণবীর্য্য, দাহজনক, পিত্তকারক, অগ্নিপ্রদীপক এবং কুষ্ঠ, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তদোষ, পার্শ্বশূল, কফ ও বায়ুনাশক। শুক্লতুলসী ও কৃষ্ণতুলসী উভয়ই তুল্য গুণবিশিষ্ট।

তুলসীর পর্য্যায় :—

"তুলসী সুরসা গ্রাম্যা সুলভা বহুমঞ্জরী।
অপেত রাক্ষসী গৌরী ভূতঘ্নী দেবদুন্দুভিঃ ॥"

অর্থাৎ—তুলসী, সুরসা, গ্রাম্যা, সুলভা, বহুমঞ্জরী, অপেত রাক্ষসী, গৌরী, ভূতঘ্নী ও দেবদুন্দুভি এই কয়টী তুলসীর পর্য্যায়।

এইবার আমি ভিন্ন ভিন্ন রোগে তুলসীর ব্যবহারের কথা বলিব। নবজ্বরে তুলসী—(১) প্রবল সর্দ্দীযুক্ত জ্বরে প্রত্যহ এক ঝিনুক করিয়া প্রাতে ও বৈকালে তুলসীপত্রের রস সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। (২) কৃষ্ণ তুলসী, সিউলী পাতা ও উচ্ছে পাতার মিলিত এক তোলা রস গরম করিয়া মধু ও পিপুল চূর্ণ সহ সেবন করিলে কফজ্বর (Catarrhal Fever) ভাল হয়। (৩) শিশু ও বালকবালিকাদের জ্বর হইলে প্রত্যহ দুই বেলা তুলসী পাতার রস এক ঝিনুক করিয়া সেবন করাইলে তিন চারি দিনের ভিতর জ্বর ভাল হয়।

বৃশ্চিক দংশনে তুলসী—তুলসীর মূল পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত পূর্ব্বক সেই গুড়িকা বৃশ্চিকদষ্ট স্থানে লাগাইলে জ্বালা নিবারিত হয়।

বোলতা ভীমরুলের বিষ প্রশমন করিতে তুলসী পত্রের রস বিশেষ কার্য্যকরী।

"সপত্র তুলসী শাখা হস্তে ধারণ করিয়া থাকিলে, তাহার গায়ে

মশক দংশন করিতে পারে না। মশকগণ তুলসী বৃক্ষের ত্রিসীমায় যাইতে পারে না। মশক ম্যালেরিয়া-বাহী বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা প্রত্যহ তুলসী ভক্ষণ ও তুলসীর রস অঙ্গে মর্দ্দন করুন, মশক নিকটে যাইবে না। তুলসীর রস ভক্ষণ ও গাত্রে মর্দ্দন করিলে চর্ম্ম রোগগ্রস্তের ও বিশেষ উপকার হয়।

বজ্রাঘাতে হতজ্ঞান রোগীকে সত্বর তুলসীর রস ভক্ষণ করাইলে, তৎক্ষণাৎ তাহার দেহে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া প্রবাহিত হইয়া তাহার জ্ঞান-সঞ্চার হয়। দুইবেলা তুলসী পত্র ভক্ষণ করিলে শরীর মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হয়। তুলসীর মূল বাহুতে বন্ধন করিয়া রাখিলে তাহার বজ্রাঘাতের ভয় থাকে না। অনেক গৃহস্থ নূতন গৃহ নির্ম্মাণ কালে মটকার কাঠ হরিদ্রা-রঞ্জিত বস্ত্রে তুলসীর মূল বাঁধিয়া দেন,—সে গৃহে কখন বজ্রাঘাতের ভয় থাকে না। শাস্ত্রকার বলেন—"যাহার গৃহে সতেজ তুলসী বৃক্ষ থাকে, তথায় বজ্রপাত হয় না।"

রক্তপিত্তে (Hæmorrhage) তুলসী—তুলসী ও কামিনী পাতার রস সেবনে রক্তপিত্ত ভাল হয়।

কুষ্ঠ (Leprosy) তুলসী—প্রত্যহ দুইবেলা তুলসীর রস এক তোলা করিয়া সেবন করিলে ও তুলসী পত্রের রস গাত্রে উত্তম রূপে মর্দ্দন করিলে এবং প্রফুল্ল অন্তঃকরণে গোমূত্র পান করিলে কুষ্ঠব্যাধি যাদা হইয়া থাকে।

শ্বাস (Asthma) রাজযক্ষ্মা (Phthisis) রোগীরা প্রত্যহ তুলসীর রস সেবন করিলে উপকার হয়।

তুলসীর মালা—তুলসী কাষ্ঠের মালা ধারণ করিলে বহু প্রকার অসাধ্য ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে। যাঁহারা বহুবিধ চিকিৎসা করাইয়া জীবনে হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারা তুলসী কাষ্ঠের মালা ধারণ করিবেন। দেখিবেন—মন্ত্র-শক্তির ন্যায় অচিরে রোগমুক্ত হইয়া নবজীবন প্রাপ্ত হইবেন। সর্ব্বদা মনে রাখিবেন—তুলসী বৃক্ষে বৈদ্যুতিক শক্তি বড়ই প্রবল ভাবে বহিয়া থাকে। তুলসী সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত—

শ্বেত তুলসী—উষ্ণ, ঘর্ম্মকারক ও পাচক। বালকের প্রতিশ্যায় ও কফরোগে (given to children in cold and catarrh) প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বাবুই তুলসী—ঘর্ম্মকারক, পিচ্ছিল, বায়ুনাশক ও উষ্ণ। ইহা আমাতীসার, কফরোগ, প্রসবের পরবর্ত্তী বেদনা, জীর্ণ জ্বরের মন্দাবস্থায় (cold stage of intermittent fever) এবং বমন প্রশমনার্থ (and to allay vomiting) ব্যবহৃত হয়। ইহা রক্তমূত্রন (urinary disorders) বৃক্কের পীড়া, আমবাত (Rheumatism) রক্তাতিসার ও কাস রোগে সেবিত হইয়া থাকে।

(শ্বেত তুলসী ও কৃষ্ণ তুলসী—শীত স্নিগ্ধ, কফনিঃসারক, জ্বরনাশক। মরিচের সহিত ফুসফুসের শ্লেষ্মা ও কফরোগে সেব্য। শুষ্ক পত্র চূর্ণের নস্য পীনস (Ozæna) ও কীট বিনাশার্থ (For destroying maggots) ব্যবহৃত হয়। শুণ্ঠী ও শ্বেত মরিচ-চূর্ণ সহ পিষ্ট তুলসী পত্র সবিরাম ও অবিরাম (Intermittent and remittent fevers) জ্বরে সেব্য। তুলসী কল্ক দ্বারা পক্ক তৈলের নস্য, কর্ণশূল ও পূতি নাসা স্রাবে হিতকর (The medicated oil is used as drop into the ears in ache and in purulent discharges and into the nose in ozena)। লেবুর রস সহ পিষ্ট তুলসীপত্র দদ্রুগ্রস্ত অঙ্গে মর্দ্দন করিবে। ইহার বীজ—পিচ্ছিল (mucilaginous) মূত্রকারক, অতএব মূত্রকৃচ্ছ্র এবং কাসে প্রযোজ্য।

রামতুলসী—শীতস্নিগ্ধ, বায়ুনাশক। ইহা অন্যান্য কফনিঃসারক বস্তুর সহিত কফরোগে ব্যবহৃত হয়।

রামতুলসী—সদাহ মূত্রকৃচ্ছ্রাদি মূত্র রোগের পক্ষে হিতকরী (strangury and kidney diseases)। হস্তপদ ক্ষীতিতে ইহার প্রলেপ হিতকর। তুলসীর ক্বাথে স্নান বা তুলসীর ধূম্র গ্রহণ আমবাতের পক্ষে হিতকর।" (মেটিরিয়া মেডিকা অফ ইণ্ডিয়া—আর, এন ক্ষোরীকৃত, ২য় খণ্ড ৪৯১, পৃঃ)

ম্যালেরিয়ায় তুলসী—আগে হিন্দু সংসারে তুলসী এবং কৃষ্ণচূড় ফুলের গাছ যত্নপূর্ব্বক পুঁতিয়া রাখা হইত। ইহারা রস টানিয়া সাঁৎসেঁতে জমি শুষ্ক করে বলিয়া ইহাদিগকে পুতিয়া রাখায় হিন্দু সন্তান ধর্ম্ম ভিন্ন স্বাস্থ্য রক্ষার সুখও অনুভব করিতে সমর্থ হইত। এখন এ প্রথাও দেশ হইতে বিলুপ্ত। কিন্তু ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে আবার সে প্রথার প্রচলন করিতে হইবে। আমার মনে হয়, প্রত্যেক হিন্দু-সন্তান যদি একটী করিয়া তুলসী বৃক্ষ যত্নপূর্ব্বক বাড়ীতে পুঁতিয়া রাখার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবার স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভে সমর্থ হইতে পারিব।

বাংলায় পাট

শ্রীহরিচরণ চট্টোপাধ্যায়

পাট চাষের আঁধার দিকটা দেখিয়ে এবং পাটের ব্যবসায় নখদন্তের উল্লেখ করে—অনেকে পাট চাষ সম্বন্ধে নানা অনুযোগ অভিযোগ করেন। কেহ বলেন, পাটের চাষের জন্য দেশে নিত্য দুর্ভিক্ষ। কেহ বা বলেন, এই যে দেশব্যাপী ভীষণ ম্যালেরিয়া, যার প্রকোপে সোণার বাংলা শ্মশান হতে বসেছে—পাটের চাষই তার মূল। আবার অনেকে পাটের উপর অন্য কারণে খড়্গহস্ত; কেন না, পাট বেচা টাকায় চাষারা বাবুয়ানী কর্চ্ছে—বিলাসী হয়ে পড়ছে।

প্রথম অভিযোগটা সম্বন্ধে এ কথা এক রকম নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে যে, পাটের চাষকে দেশের দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী করা চলে, যদি পাকা অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পাটের চাষের বাহুল্যে ধানের চাষের জমী কমে গেছে বা যাচ্ছে—পাটের চাষ ধানের চাষের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সে প্রমাণ কোথায়? যাঁরা বাংলায় চাষ

বাসের খবর রাখেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে ইংরাজী ১৮৯৫ সালেও যত বিঘা পাটের আবাদ হয়েছিল, ইং ১৯২৩ সালেও প্রায় তত বিঘাই পাটের আবাদ হয়েছে; সুতরাং এ কথা এক রকম ঠিক যে, পাটের চাষের জন্য ধানের চাষ হ্রাস পায় নাই। যে সমস্ত জেলায় পাটের চাষ হয়, সেখানকার মোট চষৎ জমীর হিসাবে পাটের জমী বোধ হয় বড় জোর দশ ভাগের এক ভাগ। অধিকন্তু দেখা যায় যে, অনেক জমীতে পাটের পরে আবার ধান রোওয়া হয়। এরূপ অবস্থায় ধান চাষ কমে যাচ্ছে বলে পাটের চাষের বিরুদ্ধে চীৎকার একান্তই অন্যায়—নিতান্তই অসঙ্গত। সত্যি কথা আমাদের কারো অজ্ঞাত নয় যে, আমাদের দেশে খাদ্য শস্যের অভাবে কখনও দুর্ভিক্ষ হয় না। এখানে দুর্ভিক্ষ হয় অন্নাভাবে নয়;—অর্থাভাবে। আমাদের দেশে আজও যে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা প্রয়োজনের চেয়ে ঢের বেশী। একটা কথা এখানে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, অনেক দেশ পৃথিবীতে আছে, যেখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় না, অথচ টাকার অভাব নাই বলে সে সব দেশের লোক দুর্ভিক্ষ কাকে বলে জানেই না।

অভিজ্ঞ ও সন্ধানী যাঁরা তাঁদিগকে বলা বাহুল্য যে, পাট চাষের দ্বারা বাংলার চির-আর্ত্ত কৃষকের আর্থিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। পাট চাষ না থাকিলে বাংলার কৃষকের দুর্ভিক্ষের দ্বারে বাস কায়েমী হয়ে যেতো এবং তার বুক-ফাটা হাহাকারে বাঙালীর কাণে তালা লেগে যেতো। যাঁদের জমী জায়গা আছে, তাঁদের কারো অবিদিত নেই যে, যে বছর চাষীর মরণহরণ পাট চাষ বিফল হয়—সে বছর চাষী প্রজার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। সে খাজনা দিতে পারে না—তার ঘরে ভীষণ দৈন্য বিরি কর্ত্তে থাকে। এক মুঠো ভাতের জন্য, লজ্জা নিবারণের একটুকরা কাপড়ের জন্য সে উপায়ান্তরের অভাবে মহাজনের দ্বারস্থ হয়।

চাষীর জীর্ণ জীবনের ও তাহার নিরানন্দ জীবন যাত্রার সব কথা খুঁটিয়ে বুঝে ও খতিয়ে দেখে একটা কথা বেশ জোর করে বলা যায় যে, বাংলার চাষীর জীবন-পথে পাথেয়ের চির-অভাবের মূল কারণ হচ্ছে তাহার সর্ব্বনেশে আলস্য। এই আলস্যের জন্যই তার জীবনে মরণবীণার কঠিন সুর কখনও একেবারে থামে না। সে বছরের মধ্যে ৩।৪ মাস খেটে পাটটী ও ধানটী তৈরী করে; প্রয়োজন সত্ত্বেও, শক্তি থাকিতেও, বাকী কয় মাস পায়ের উপর পা দিয়ে আরামে বসে খায়। হতে পারে যে, এই আলস্যেরও মূল অন্নাভাবজনিত শক্তির অভাব। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন মতভেদ থাকতে পারে না যে, বাংলার চাষী যদি ভাল করে বেশী করে টাকার মুখ দেখতে চায়, তাহলে তার কুড়েমী কল্লে চল্‌বে না। অসীম দারিদ্র্যের স্তব্ধ অন্ধকার ঘুচিয়ে উদার আলো যদি সে তার জীবনে দেখতে চায়, তাহলে তাকে নিরলস হয়ে বারো মাস সমানে খাটতে হবে। জমী বছরের মধ্যে ৬ মাস ফেলে না রেখে যথোপযুক্ত জমীর খোরাক যুগিয়ে—তাতে সোণা ফলিয়ে নিতে হবে। অন্যথায় শক্তির অব্যবহার, অপব্যবহার ও কর্ম্মপরতায় শৈথিল্যের ফলে দিনে দিনে তাহার মরণ-পরিণাম শ্রীহীনতা অবশ্যম্ভাবী।

দ্বিতীয় অভিযোগটা ষোল-আনাই অমূলক। বাংলার যে সব জায়গায় পাটের চাষ বেশী হয়—সে সব জায়গায় তেমন ম্যালেরিয়া নাই। তাছাড়া ডাক্তারদের কথাটা যদি সত্য হয় যে, ম্যালেরিয়া দরিদ্রের রোগ—অনশন অর্দ্ধাশনের অবশ্যম্ভাবী ফল—তাহলে প্রশ্রয় দিতে হবে পাটের চাষের, যাতে করে দেশে বেশী টাকা আসে। এই টাকা আসবার পথে আগোড় বেঁধে দিলে ফল যে ভাল হবে না, তা অস্বীকার করা শক্ত।

তৃতীয় অভিযোগটী সম্বন্ধে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, নিত্য দুর্ভিক্ষ-দ্বারবাসী চাষীরা নিজেদের আটপৌরে জীবনের অভাব অসচ্ছলতার কথা ভুলে গিয়ে পাট বেচা টাকা নানারকম সখের জিনিস কিনে নষ্ট করছে। কিন্তু তাই বলে পাটের চাষ বন্ধ করে দেবার পরামর্শ কি সৎপরামর্শ? পাট-বেচা টাকা বাসনার ঘোরে বিলাসিতায় ব্যয় করা যে খুব অবিবেচনার কাজ, সে সম্বন্ধে দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু পাট তার জন্য দায়ী বা দোষী নয়। টাকা উড়িয়ে পুড়িয়ে দেওয়া যার স্বভাব, সে যে রকম কোরেই টাকা রোজগার করুক না কেন, উড়িয়ে দেবেই; কিন্তু তাই বলে উপায়ের পন্থাটাকে দোষ দেওয়া যায় কি? চাষীর বিলাস-ব্যাধির মূল দূর কর্ত্তে গেলে, তাহার অর্থাগমের পথ অবাধ রাখিয়া তাকে সংযমী ও সঞ্চয়ী হতে শেখাতে হবে। তাহার ভিতর দিয়ে তাকে বোঝাতে হবে, শেখাতে হবে যে, অপ্রয়োজন বায় মাত্রেই অপব্যয়। সংযম না শিখিলে বিলাস হিসাবে চির-তৃষিত চির-উপোসিত কৃষক তাহার সহজ প্রকৃতির বশেই চলিবে। অন্ন-বস্ত্রের অভাব মিটিয়া টাকা হাতে থাকিলেই সে বিলাস বাসনে খরচ করিবেই; কারো মানা শুনিবে না। কিন্তু সেই অজুহাতে পাট চাষ বন্ধ করে দিলে চোরের উপর রাগ করে ভুঁয়ে ভাত খাওয়ার মতই বোকামো হবে।

এ কথায় বোধ হয় মতভেদ নাই, যে, পাটের দৌলতে বাংলার ঘরে কি বছর অল্প বিস্তর টাকা আসছে, এবং তার ফলে, যে চাষী ছেলে পুলে নিয়ে অনশনে অর্দ্ধাশনে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিন কাটাতো, সে পেটপুরে খেতে পাচ্ছে, সহজে জমীদারের খাজনা—গোমস্তার তহুরী-পার্ব্বণী ও মহাজনের পাওনা আদায় দিচ্ছে। তবে স্থায়ী-ভাবে যে চাষীর অবস্থা সচ্ছল ও উন্নত হচ্ছে না—সে যে আজও সবার নীচে—সবার পিছে পড়ে আছে, তার কারণ সে সংযমী নয়, সঞ্চয়ী নয়, হিসাবী নয়, দূরদর্শী নয়। দুর্দ্দিনের চির ক্রীড়নক সে—শাশ্বত অভাব তার চির-সহচর—কাজেই সামান্য আর্থিক সচ্ছলতা তাকে বাঁধন-হারা—আত্মহারা করে তোলে। সে আপাতমধুর বিলাসের খাতিরে নানা রকমে পয়সা নষ্ট করে। বিলাসের সেই আপাতমোহন দুঃখ-পরিণাম আহ্বানে কাণ দিতে বা সাড়া দিতে কেহ নিষেধ কল্লে, বলিয়া ওঠে, "আজ খেয়ে নেড়া নাচে, কাল গোবিন্দ আছে।" তবে চাষীর বিলাসিতা সম্বন্ধে যাঁরা বড্ড বেশী আক্ষেপ বা ক্রন্দন করেন তাঁদিগকে একটী কথা এখানে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যেতে পারে যে, বিলাসিতার পরিণাম নিধনের পক্ষে বিষময় হলেও, The enjoymen of luxuries affords an incentive to exterior and promotes progress in many ways."

পাট বাংলার একচেটে জিনিষ। উহার তুল্য জিনিস আজও কেহ অন্য কোথাও আবিষ্কার কর্ত্তে পারেনি। এরূপ অবস্থায় পাটের দাম বিদেশী বণিক বা দেশী ব্যাপারী কেহই কমাতে পাবেন না, যদি চাষী বেশ চেপে বসে থাকতে পারে। চাষী ইচ্ছা কল্লে শক্তি সঞ্চয় করে ক্রেতাকে উপেক্ষা কর্ত্তে পারে। কারণ, ক্রেতার পাট একান্তই দরকার নাহ'লে চলবে না। "ক্রেতার গরজে বিক্রেতার সুযোগ," অথচ পাটের চাষী এ সুযোগ পায় না; কেন না, সে মাল ধরে চেপে বসে থাকতে পারে না। যদি সে পারিত, তাহলে তার হাল আমরা আজ অন্য রূপ দেখতাম। কিন্তু কথা হচ্ছে, চাষী কি মাল ধরে রাখতে পারে? আমার মনে হয় পারে, যদি সে জমিদারের খাজনার ও নিজের সংসারের মেকদার—খাদ্যশস্য উৎপাদন করে—আর যদি চাষীরা সকলে একমত হয়ে পাটের পড়তা খতিয়ে বিক্রীর দর ঠিক করে মাল বিক্রী করে। এই দুইটা উপায়ের প্রথমটা কিছুই শক্ত নয়। দ্বিতীয়টি একটা সমবায়ের মধ্যে মিলিত হইয়া একযোগে কাজ করা—আমাদের এই অনৈক্যের দেশে একটু শক্ত বটে, কিন্তু খুব শক্ত বলে আমার মনে হয় না।

অর্থনীতি-শাস্ত্র আমি জানি না; কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, "বিদেশের টাকা দেশে এলেই এবং দেশে থাকিলেই দেশ ধনী হয়; আর দেশের টাকা বিদেশে গেলেই দেশ দরিদ্র হইয়া পড়ে।" তবে যদি কেহ বলেন যে, সোণা-রূপা হীরা-জহরৎ ধন নয়, জীবন ধারণের উপযোগী সামগ্রীই ধন; তাহলে সে আলাদা কথা। অর্থতত্ত্বের সে সব জটিলতা নিয়ে সুচারু রূপে নাড়াচাড়া করিবার ক্ষমতা আমার নাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে "ভারতবর্ষে" "ভাত-কাপড়" নামক প্রবন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয় চাষীর সুবিধার জন্য উৎপাদককে এবং ভোক্তাকে মুখোমুখী করে পাট কেনা-বেচার পরামর্শ দিয়েছেন। পরামর্শটা নিঃসন্দেহ খুবই ভাল এবং চাষীর পক্ষে পরমহিতকর; কিন্তু পরামর্শটা এ সংসারে কাজে লাগানো বোধ হয় অসম্ভব। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্র থেকে মাঝের তৃতীয় ব্যক্তিকে সরানো বড় কঠিন, বোধ হয় অসম্ভব। আমার মনে হয় যে ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাপারীরও একটা উপযোগিতা আছে।

চাষীর পক্ষে মহাজন ও ব্যাপারী হয়ত দুষ্টগ্রহের মত, কিন্তু ঐ দুটী না হলেও তার চলবার যো নাই। চাষীরা শিল্পীরা যে আজও বিপদ আপদ ঠেলে, দুর্দ্দিন দুর্যোগ কাটিয়ে কায়ে-প্রাণে সম্বন্ধ রেখে বেঁচে আছে ও দেশের লোকের রসদ যোগাচ্ছে, এবং অভাব মেটাচ্ছে, তা নিয়ত নিন্দিত এই দুই শ্রেণীর লোকের সাহায্যে ও অনুগ্রহে।

পূর্ব্বেই বলেছি, আমি অর্থনীতিজ্ঞ নই। হয়ত এই আলোচনায় আমি এমন সব মত প্রকাশ কর্লাম, যা পড়ে পাঠকের পক্ষে হাসি চেপে রাখা শক্ত হয়ে পড়বে। তথাপি ভুল শোধরাবার অবসর পাবো বলে ব্যাপারটা আমি যেমন বুঝেছি তেমনি জানালাম। আমার ধারণা—অর্থনীতি শাস্ত্রে যতই পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাক না কেন, লোকে উহার কথার মারপ্যাঁচে ভুলে গিয়ে উহাকে যতটা অভ্রান্ত বলে মনে করে, সত্যি সত্যি উহা ততটা অভ্রান্ত নয়। কারণ, উহার ভিত্তি কতকটা শোনার ভিতর দিয়া জানা, আর বাকী সবটাই নিছক অনুমান। এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, অনুমান চিন্তা ও গবেষণার ফল হলেও অনুমানই আর কিছু নয়।

ডাক্তার সুবোধ মিত্র এম-ডি (বার্লিন)

যে সকল ভারতবাসী বিদেশে গিয়া নানা দিক দিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, ডাক্তার সুবোধ মিত্র তাহাদের অন্যতম। এই মেধাবী কর্ম্মবীর নবীন বাঙ্গালী ডাক্তার দুই বৎসর পূর্ব্বে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া জার্ম্মাণী যাত্রা করেন, এবং সেখানে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ধাত্রীবিদ্যা

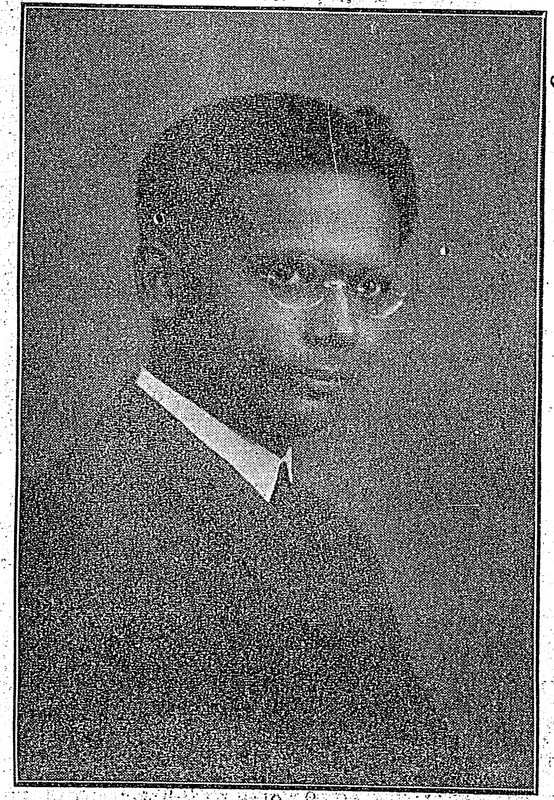

ডাক্তার সুবোধ মিত্র এম-ডি

বিষয়ক মৌলিক গবেষণায় তৎপর হন। দুই বৎসর অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁহার মৌলিক গবেষণা জার্ম্মাণ পণ্ডিতদের নিকট আজ সমাদর লাভ করিয়াছে। তাঁহার মৌলিক গবেষণার ফল

জার্ম্মাণীর অনেক মনীষি আপনাদিগের গ্রন্থে উদ্ধৃত করিতেছেন। একজন বাঙ্গালীর নাম ও তাঁহার গবেষণার ফল এইরূপ ভাবে জার্ম্মাণ ভাষায় গুণগ্রাহী জার্ম্মাণ পণ্ডিতদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইতেছে, ইহা ভারতের পক্ষে গৌরবের কথা। সম্প্রতি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে এম-ডি ডিগ্রি দিয়াছেন। ধাত্রীবিদ্যায় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-ডি ইনিই প্রথম বাঙ্গালী। বার্লিনের Charitie Female হাসপাতাল জার্ম্মাণী সাম্রাজ্যের ভিতর একটী বিরাট প্রতিষ্ঠান। এই ধাত্রী-মন্দিরে এ পর্য্যন্ত কোন বঙ্গবাসী, শুধু বঙ্গবাসী কেন, কোন ভারতবাসী

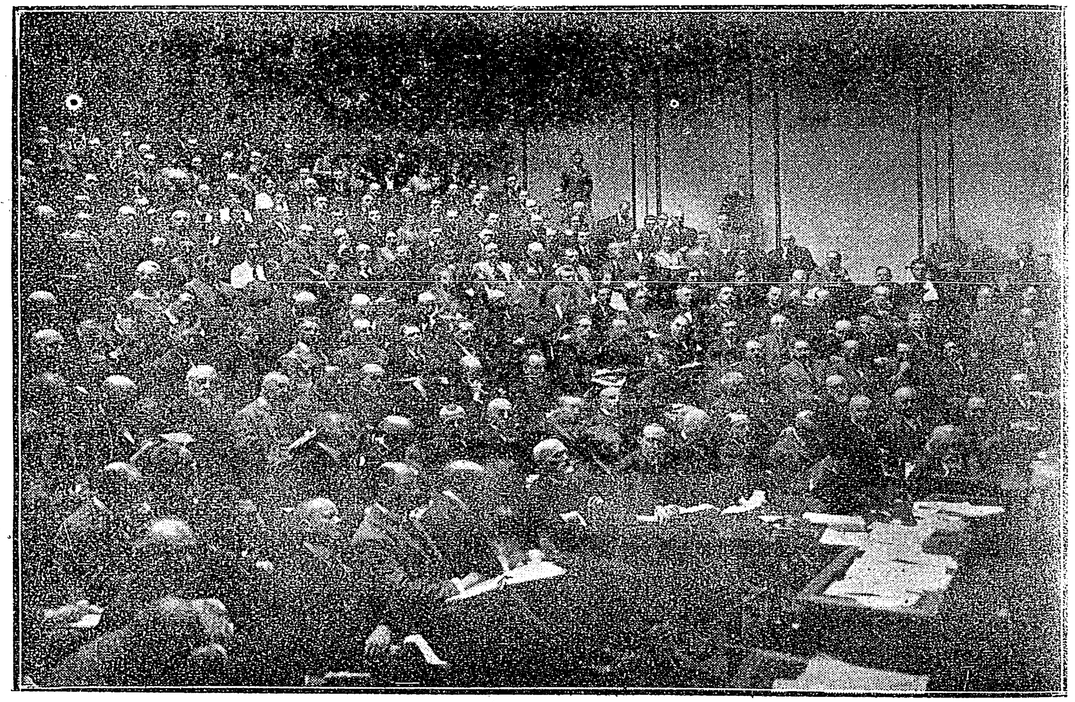

বার্লিনের রণ্‌জেন কন্‌গ্রেস

প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ডাক্তার মিত্রের অধ্যাপক Charitie Female হাসপাতালের ডিরেক্টার জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ মাননীয় Dr. Franz তাঁহার বাঙ্গালী শিষ্যের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে এই Charitie Female হাসপাতালে সহকারী করিয়া লইয়াছিলেন। শুধুই তাহাই নয়। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় ডাক্তার মিত্রকে তাঁহাদের Gynaecological Societyর অনারারী মেম্বর করিয়া লন, এ সংবাদ Berlin Medical Correspondence নামক সংবাদ-পত্রে বাহির হয়। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। দিনের পর দিন একজন বঙ্গবাসীর হস্তে জার্ম্মাণ রমণীদের অস্ত্রোপচার সহ্য করা এক দিকে যেমন জার্ম্মাণদিগের উদারতার পরিচায়ক, অন্য পক্ষে তাহা ডাক্তার মিত্রের প্রতিভার গৌরবকেও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। জার্ম্মাণীর অন্তর্গত Innsbruck বিজ্ঞান মহাসভা (যেখানে ইয়োরোপের বড় বড় পণ্ডিতগণই শুধু বক্তৃতা দিবার অধিকার পান) ডাক্তার মিত্রকে তাঁহাদিগের আগামী অধিবেশনে জার্ম্মাণ ভাষায় ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ক একটী হৃদয়গ্রাহী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে এপ্রিল মাসে X Ray বিষয় লইয়া বার্লিনে Rontzen Congress হয়। সেখানেও একমাত্র ভারতবাসী ডাক্তার মিত্র নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। ডাক্তার সুবোধ মিত্র Innsbruck বিজ্ঞান মহাসভায় যোগদান করিবার জন্য, ভিয়েনা, প্রাগ, ব্রাসেলস্ প্যারিশ, এডিনবরা, রতুণ্ডা, কুণ্ডা প্রভৃতি সমগ্র ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ক হাসপাতাল পরিদর্শন করিয়া লণ্ডনে ফিরিবেন। সুদূর বিদেশের সুধী-সমাজে একজন উদীয়মান বাঙ্গালী চিকিৎসক সম্মানিত হইতেছেন, ইহা ভারতবর্ষের পক্ষে শ্লাঘনীয় সন্দেহ নাই। ডাক্তার মিত্রের সঙ্কল্প ও চির-ঈপ্সিত সাধনা সার্থক হউক, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

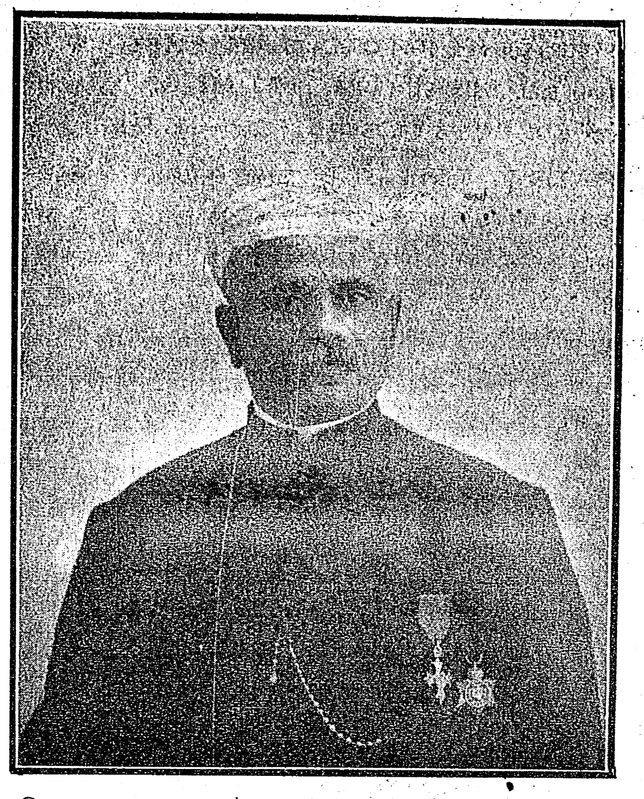

শ্রীযুক্ত সার ওঙ্কারমল জেঠিয়া কে-টি (কলিকাতার বর্দ্ধমান সেরিফ)

জ্যোৎস্নার পরিচয়

শ্রীরমলা বসু

সমস্ত পূব-আকাশখানা গোলাপী আভায় রাঙ্গা হয়ে উঠেছে, দু'একটা মেঘের টুকরো সে রঙ্গিণ আভায় ভাগ বসিয়ে, তাদের ধূসর গায়ে সে সোণালী রং মেখে নেবে বলে, প্রভাত বাতাসে ভর করে দুষ্টু ছেলের মত ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিয়েছে। পাহাড়ের পায়ের তলে এঁকেবেঁকে অনেক দূর পর্য্যন্ত লাল মেটে রাস্তা চলেছে। দুধারে সবুজ ধানের ক্ষেত দিগন্তে মিশিয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে বড় বড় বাঁশের ঝাড় বাতাসের মৃদু ঠেলায় দীর্ঘতনু সুন্দরীর সরল রেখাটুকুর মাধুর্য্য ধার করে নিয়ে দুলে দুলে উঠছে। তাদেরি মাঝে দুএকটা ঘুমন্ত গ্রাম তখনো অলস জড়তা ভরে নিঃশব্দে পড়ে আছে।

দূরে তারি একখানির ওপর তখনও নিশারাণীর ওড়নার ধূসর প্রান্তটুকু দেখা যাচ্ছে। যত কাছে আসা যায়, তত সেখানা কেঁপে কেঁপে দূরে সরে পালিয়ে যায়। মনে হচ্ছে, যেন একখানি সযত্ন আঁচলের আড়ে ঘুমন্ত গ্রামখানিকে কে না জানি ঢেকে রেখেছে,—যাতে হঠাৎ ভোরের আলো চোখে লেগে ঘুম না তার ভেঙ্গে যায়!

নীলাম্বরী সাড়িখানি পরে, কালো চুলের রাশ এলিয়ে দিয়ে, হাসনাহানার গন্ধ মেখে, হাতে তারার সহস্র প্রদীপের আরতির থালাখানি জ্বালিয়ে, বিফল সাজে, বিফল পূজার আয়োজনে সারারাত কার আশায় নিশারাণী বসে থাকে কে জানে! প্রতি রাতই এমনি ভাবেই কাটে তার।

তার পর প্রভাতের আগমনে যখন সমস্ত জগতে একটা আনন্দ ও জীবনের সাড়া পড়ে যায়, ঊষারাণী হেসে হেসে তার নূতন জীবনের নূতন আনন্দ ও শোভার ডালি নিয়ে অরুণদেবের অভিনন্দনের জন্যে এসে উপস্থিত হয়, তখন ক্লান্ত শ্রান্ত নিশার শোভা আরো ম্লান হয়ে আসে। ধীরে ধীরে পূর্ণ জাগ্রত জগতের এ হাসিখেলা ও জীবনের মেলা দেখতে দেখতে বুকভরা বিষাদ ও তাচ্ছিল্য নিয়ে সে বিদায় হয়। প্রতি দিনই এমনি হয়।

তবে মাঝে মাঝে আজকের দিনের মতই নিজেকে সে সামলে রাখতে পারে না আর,—অনেক দিনের সাবধানতার বাঁধ সব টুটে যায়। নিজেকে লুকিয়ে রেখে একটীবার দয়িতের চিরবাঞ্ছিত মুখখানি দেখে নেবার লোভ ছাড়তে পারে না আর; কিন্তু হাজার সতর্ক হলেও দুষ্টু অরুণ সব টের পায়, তাই সে শত রকম ফন্দিতে নিশারাণীর এই প্রচ্ছন্ন দেখবার চাতুরীটুকু ধরে ফেলবার চেষ্টা করে, তখন নিশা পালাবার পথ পায় না।

ক্রমে আকাশখানা গোলাপী থেকে সিন্দুর রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে উঠল—কিন্তু তখনো অরুণদেবের দেখা নাই। এমন সময় হঠাৎ একটুকরো মেঘের আড়াল থেকে একগাল দুষ্টু হাসি নিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন—আর নিশারাণীর আঁচলের প্রান্তটুকু দেখতে পেয়ে, দুষ্টুমি করে তার আগায় একটুখানি তাঁর কিরণের আভা ছড়িয়ে দিলেন। ধূসর রঙ্গের ওড়নার কোণাটুকু হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের জন্যে, আগুণের মত জ্বলে উঠল, আর তার পর মুহূর্ত্তেই ছুট ছুট—অমনি নিশারাণীর পলায়ন। এ লুকোচুরী ধরাধরির খেলা নিশা ও অরুণের যুগ-যুগান্তর ধরে চলেছে,—কবে শেষ হবে কে জানে?

রোজই অরুণ এমনি করে ধরতে যায়, রোজই নিশা পালিয়ে যায়। অরুণের এ নিত্য-নূতন ধরবার ফন্দিতে নানা আমোদ, নানা হাসি,—কিন্তু নিশার শুধু বুকভরা অভিমান। সে ভাবে অরুণের এতে কিসের লাভ? এমনি করে তার গোপন প্রয়াসটুকু ধরে ফেলে, এমনি করে সহস্র রকমে স্বীকার করিয়ে নিয়ে তার প্রাণের কথা, তার কি লাভ? যা অরুণের কাছে দুদণ্ডের হাসিখেলার ব্যাপার, তাই যে তার বুকের মধ্যে লুকানো,—ঐ পূব-গগনের মতই শোণিত রাঙ্গায় রঞ্জিত চিরদিনের সঞ্চিত ধন, —তা সে চিরদিনই লুকানো থাক্ না কেন? সে তো চির-রজনীর পুঞ্জীভূত অন্ধকার দিয়ে এত দিন ধরে কুতূহলী দৃষ্টির বাহির হতে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করে এসেছে।

অরুণের নিত্য-সঙ্গিনী ঊষা। তাদের হাসিখেলা, তাদের আলোখেলা নিয়ে তারা সুখী থাক না কেন? নিশা তো তাদের কিছু চায় না। তবে থাকতে চায় না কেন সে তার অন্ধকার বিষাদরাশির মধ্যে,—বুকভরা অন্ধকার নিয়ে? বড় অভিমানিনী, বড় অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে সে,—হয় সর্ব্বস্ব, নয় কিছু না, এই তার পণ। তাই যে উপরে তাচ্ছিল্য ও ঔদাসীন্যের ভাব দেখিয়ে, বুকজোড়া বেদনার স্মৃতি নিয়ে এতকাল কাটিয়ে এসেছে। সে দুঃখ, সে বেদনা যেন তার একটা অমূল্য সম্পত্তি হয়ে উঠেছে,—যা সে যক্ষের ধনের মত সর্ব্ব চক্ষুর অন্তরাল করে রাখতে চায়। তাই প্রতি রজনীতে এই নিবিড় অন্ধকারের জাল রচনা করে বসে থাকে।

অনেক দিন আগে সৃষ্টির প্রথমে, দুটীতে তারা দুজনার চিরসঙ্গী হয়ে জন্মেছিল,—এক মুহূর্ত্ত তাদের ছাড়াছাড়ি বিচ্ছেদ ছিল না। নিশার মনে সংসারের আর কেউ স্থান পেত না,- সে জেনেছিল অরুণও বুঝি সে ছাড়া আর কারুর পানে তাকাবে না। তারই রইবে একাধিপত্য। এমন সময় এক দিন অরুণ আর একটী খেলার সাথী জুটিয়ে আনলে—মাথায় তার মল্লিকা ফুলের মালা, পরণে আলোক-বরণ সাড়ী,—সারা দেহে একটা তরুণ চাঞ্চল্যের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। মুগ্ধ অরুণ কিছুক্ষণের জন্যে এই তরুণী সঙ্গিনীটিকে নিয়ে, তার চিরসাথীকে ভুলে গিয়ে, খেলায় মত্ত হল। যখন নিশারাণীকে মনে পড়ে গেল, —তাদের খেলায় যোগ দেবার জন্যে আহ্বান করতে মুখ তুলে চেয়ে শুধু দেখতে পেলে তার ধূসর ওড়নার একটুখানি প্রান্ত, ও শুধু মুহূর্ত্তের জন্যে দুইখানি অভিমান-আহত চক্ষের বাষ্পাকুল চাহনী। সে বাষ্প এখনও প্রতি রজনীতে শিশির-কণা রূপে গাছপালা কচি ঘাসের ওপর ঝরে পড়ে।

অরুণ দু হাত দিয়ে ধরতে গেল— কিন্তু ততক্ষণে নিশারাণী একেবারে অদৃশ্য। তার ব্যথিত, ক্ষুব্ধ অভিমান ক্ষত চিত্ত নিয়ে চির-অন্ধকারের পথ দিয়ে সে, সে ব্যথা সে বেদনা ঢেকে রাখবার জন্যে সরে গেল চিরদিনের জন্যে অরুণ-দেবের পথ ছেড়ে। তার অভিমানী হৃদয় তার পূর্ণ অধিকার না পেলে চাইল না আর কিছু। তার চেয়ে সে চিরদিনের জন্যে নূতন দুটী সাথীর পথ ছেড়ে চলে যাবে। তার বুক পূর্ণ করে চিরদিন দয়িত তার চির-রাজত্ব করবে, —কিন্তু মুখ ফুটে সে আর কোন দিন তা জানতে দেবে না, —প্রাণ গেলেও সে ধরাও দেবে না। তাতে বুক ফেটে যায় তাও ভালো, তবু অভিমান তার অটল থাকবে। এমনি অদ্ভুত অভিমানী মেয়ে সে। তাই নিশারাণীর বুক জুড়ে চিরঅন্ধকার।

তবে মাঝে মাঝে কার স্নিগ্ধ মধুর বিমল আভায় কিছু দিনের জন্যে নিশারাণীর অমন বুকভরা জমাট অন্ধকারকেও হাল্কা করে তোলে? কে সে? কে সে নিশাপতি, যে নিশারাণীর অরুণগত প্রাণে আপন প্রতিবিম্ব ফেলে কিছু দিনের জন্যেও এমন করে আশার আলো ফুটিয়ে তুলতে পারে? জানো না কি? কার আলোয় নিশাপতির আলো? কার কিরণে সে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে,—তার নিজস্ব কিছু আছে কি? নিশারাণীর বুকে যে নিশাপতি অরুণেরই স্নিগ্ধ মানসী মূর্ত্তি! নিশারাণীর যত লুকোচুরী, যত লজ্জা, যত অভিমান অরুণ-দেবের সাথে,—অরুণ-দেবের মানস-মূর্ত্তি নিশাপতির সাথে নয়।

নিশাপতিকে বুকে ধরে নিশারাণী তার সব বেদনা, সব অশ্রু, সব কথা অকপটে নিবেদন করতে পারে; আর তখন তাই তার, পুঞ্জীভূত জমাট অন্ধকার ভেদ করে আশার স্নিগ্ধ আলোয় মন তার ভরে ওঠে,—নিখিল জগতে তখন সে আলো জ্যোৎস্না-কিরণ রূপে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু হায়, চিরদিন এমনি যায় না। শুধু দয়িতের মানস-মূর্ত্তি গড়ে, চিরদিনের প্রাণের ক্ষুধা ও সাধ মেটে কই? তখন সব আশার আলো নিভে গিয়ে আবার বিষাদের অন্ধকারে বুক তার ভরে যায়,—জগতে অমানিশার প্রকাশ রূপে।

এমনি চলে আসছে যুগ যুগ ধরে; কত দিন চলে যাবে আরো এমনি করে কে জানে? ধরা দেবে কি অভি-মানিনী? না,—প্রতি সন্ধ্যায় বিষাদিনী বিফল পূজার আয়োজন নিয়ে এমনি করে আসবে যাবে?

প্রাচীন কলিকাতা

(১) চিৎপুরে চিত্রেশ্বরী মন্দিরে নরবলি

কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন, উদ্ভটসাগর, বি-এ

কলিকাতার উত্তর-সীমায় 'বাগবাজার-খাল' অবস্থিত। 'বাগবাজার-খালের' উত্তরে গঙ্গাতীরে 'চিৎপুর'-নামক স্থান। এই 'চিৎপুর' বহু দিন হইতেই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজ-উদ্দৌলা যখন কলিকাতা অবরোধ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সর্ব্ব-প্রধান সেনাপতি মীরজাফর এই চিৎপুরেই সেনা-নিবেশ করিয়া 'মারহাট্টা-ডিচের' দক্ষিণ-দিগ্বর্ত্তী বাগবাজারে স্থিত হলওয়েল সাহেবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধস্থানকে এখনও লোকে 'বারুদ-খানা' বলিয়া থাকে। এখনও বাগবাজার-খালের তীরভাগে মীর-জাফরের কয়েকটী কামান পোঁতা রহিয়াছে। একদিন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁকে এই চিৎপুরে আনিয়া অন্নক্লিষ্ট প্রজাগণের দুর্দ্দশা দেখাইয়া 'বিশ-লাখী' দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। এই চিৎপুর ও বাগবাজারের পশ্চিম-ভাগে গঙ্গাবক্ষে পেরিন সাহেবের ১৪খানি জাহাজ বাঁধা থাকিত। বর্ত্তমান হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট্ হইতে অন্নপূর্ণা ঘাট পর্য্যন্ত এই সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া একটী মনোহর উদ্যান ছিল। লোকে এই উদ্যানকে "পেরিনের বাগান" (Perrin's Garden) বলিত। সস্ত্রীক ওয়ারেন্ হেষ্টিংস, স্যার্ ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্ প্রভৃতি বড় বড় সাহেবরা এই উদ্যানে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে বায়ুসেবন করিতে আসিতেন। তৎকালে 'লালদীঘির বাগান' ও 'পেরিনের বাগান'ই সাহেবদিগের

অতি আদরের ধন ছিল। তখন বাগবাজার-খাল হয় নাই; কারণ, বহু দিন পরে (১৮২৪ খৃষ্টাব্দে) ইহা খাত হইয়াছিল। তৎকালে একমাত্র 'মারহাট্টা-ডিচ্' বিদ্যমান ছিল। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে এই 'মারহাট্টা-ডিচ' খনন করা হইয়াছিল। এই চিৎপুরেই মহম্মদ রেজাখাঁর একটী সুবৃহৎ মনোহর বাগানবাটী বিরাজ করিত। আমিও বাল্যকালে এই বাগানবাটীর ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছি। লোকে এই স্থানকে অদ্যাপি 'নবাবপটী' বলিয়া থাকে। এই চিৎপুরে নবাব মীরজাফরের স্থাপিত একটী মস্‌জিদ্ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই চিৎপুরে "চিত্রেশ্বরী" ও "সর্ব্বমঙ্গলা" নামা দুইটী ভগবতীর মূর্ত্তি অদ্যাপি বিরাজ করিতেছেন। কোন্ ব্যক্তি কোন্ সময়ে এই দুইটী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। এই চিত্রেশ্বরীদেবীর মন্দিরে বহু দিন হইতেই প্রচুর-পরিমাণে নরবলি দিবার প্রথা ছিল। ১৬০০ খৃষ্টাব্দেও যে এই মন্দিরে নরবলি দেওয়া হইত, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 'মনোহর ঘোষ' নামক এক জন কায়স্থ সুবর্ণরেখা-নদীর তীরে বাস করিতেন। তৎকালে মহারাজ মানসিংহ আফ্‌গানদিগের সহিত সুবর্ণরেখার তীরে যুদ্ধ করিতেছিলেন। মনোহর ঘোষ মানসিংহের অধীনতায় কর্ম্ম করিয়া কোটীশ্বর হইয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় তাঁহার প্রচুর ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠিত হওয়ায়, যৎসামান্য অর্থ লইয়া তিনি চিৎপুরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তিনিই "সর্ব্বমঙ্গলা" ও "চিত্রেশ্বরী" দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তৎকালে নরসিংহ নামক এক মোহান্ত এই দেবীদ্বয়ের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। মনোহর ঘোষ, দেবীদ্বয়ের সেবার নিমিত্ত যথেষ্ট ভূমি-সম্পত্তিও প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই।

১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মনোহর ঘোষের মৃত্যু হইয়াছিল। তৎকালে চিত্রেশ্বরী মন্দিরে এত নরবলি দেওয়া হইত যে, মনোহর ঘোষের পুত্র রামসন্তোষ ঘোষ, চিত্রেশ্বরী মাতাকে প্রত্যহ প্রাতঃকালে প্রণাম করিতে গিয়া বহুসংখ্যক নরমুণ্ড দেখিতে পাইতেন। এই ভীষণ ব্যাপার অসহ্য হওয়ায় তিনি চিৎপুর ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে গিয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরিশেষে কোন কারণ বশতঃ তাঁহার একমাত্র পুত্র বলরাম ঘোষ, বর্দ্ধমান ত্যাগ করিয়া চন্দননগরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইনি অতি বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তৎকালে ফরাসী গভর্ণর ডিউপ্লে সাহেব, চন্দননগরে বসিয়া সমগ্র বাঙ্গালা দেশে ফরাসী রাজ্য স্থাপনের কল্পনা করিতেছিলেন। বলরাম ঘোষ স্বীয় বুদ্ধিবলে ক্রমে ক্রমে ডিউপ্লে সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অবশেষে তাঁহার দেওয়ান হইয়া বসিলেন। তৎকালে দেওয়ান হইলেই মানুষ রাতারাতি ধনাঢ্য হইয়া পড়িত। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজ-উদ্দৌলা কলিকাতা অবরোধ করিয়াছিলেন। এই বৎসরেই বলরাম ঘোষের মৃত্যু হইয়াছিল। বলরাম ঘোষের প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র রামহরি ঘোষ এবং শ্রীহরি ঘোষ চন্দননগর ত্যাগ করিয়া বাগবাজারে কাঁটাপুকুর নামক স্থানে সুবৃহৎ ও মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। শ্যাম-বাজারে স্বর্গগত মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসুর বাটীর সম্মুখ দিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত যে একটী অতি পুরাতন রাস্তা আছে, তাহার নাম "বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট্"। বলরাম ঘোষের নামানুসারেই এই রাস্তার নাম এইরূপ হইয়াছে। হোগলকুঁড়িয়ায় যে "হরি ঘোষের ষ্ট্রীট্" নামক একটী রাস্তা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও বলরাম ঘোষের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীহরি ঘোষের নামানুসারেই চলিয়া আসিতেছে। কাঁটাপুকুরে হরি ঘোষের যে বৃহৎ বাটী ছিল, আমিও বাল্যকালে তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছি।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, মনোহর ঘোষ "চিত্রেশ্বরী-মন্দির" নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। কেহ কেহ কহেন যে, বেহালা-বড়িষার সাবর্ণ-চৌধুরী মহাশয়েরাই এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, চিৎপুরে "চিতে"—নামক একজন ডাকাত বাস করিত। সেই ব্যক্তিই একটী কালী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিল, এবং অনুচর-গণ লইয়া ডাকাতী করিতে যাইবার সময় কালী মাতার পূজা করিয়া ও সময়ে সময়ে নরবলি দিয়া যাইত। উত্তরে দক্ষিণেশ্বর হইতে দক্ষিণে বেহালা-বড়িষা পর্য্যন্ত সমগ্র স্থান সাবর্ণ-চৌধুরী বাবুদিগের জমীদারী ছিল। এরূপ হইতে পারে যে, সাবর্ণ বাবুদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে চিতে ডাকাত ৺কালী-মূর্ত্তির স্বত্বত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

চিতে ডাকাতের নামানুসারে "চিৎপুর" ও "চিৎপুর-রোড্" হইয়াছে। যাত্রিগণ চিৎপুরে "চিত্রেশ্বরী-দেবী" দর্শন করিয়া গভীর জঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তমান "চিৎপুর-রোড" দিয়া গঙ্গাপারে রামকৃষ্ণপুরের পশ্চিম-দিগ্‌বর্ত্তী বেতোড়ে "ব্যাতাই চণ্ডী" দর্শন করিতে যাইতেন। পরে সে স্থান হইতে জঙ্গলপূর্ণ গোবিন্দপুরের মধ্য দিয়া কালীঘাটে ৺কালীমাতার চরণ দর্শন করিতেন।

এইখানে একটী হাস্য-জনক গল্প না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বড়িষার সাবর্ণ-চৌধুরী বাবুরা তৎকালে অতি বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্ম-কার্য্যে মুক্তহস্ত এবং পরম নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারাই এক দিন সমগ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের নেতা হইয়াছিলেন। এই বংশের আদি-পুরুষ কামদেব ব্রহ্মচারী। তৎপুত্র লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার, তৎপুত্র গৌরহরি, তৎপুত্র শ্রীমন্ত ও তৎপুত্র কেশবরাম রায় চৌধুরী। এই কেশবরামই বড়িষার প্রকৃত জমীদার। ইহাঁর চতুর্থ পুত্রের নাম শিবদেব রায় চৌধুরী। সাধারণ লোকে তাঁহাকে 'সন্তোষ রায়' বলিয়া ডাকিত। সন্তোষ রায়, ভীমের ন্যায় বলবান্ ও ঔদরিক পুরুষ ছিলেন। তৎকালে তাঁহার মত দাতা, ভোক্তা ও ভোজয়িতা আর কেহই ছিলেন না। শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিনি লক্ষাধিক বিঘা ভূমি দেবত্র ও ব্রহ্মত্র স্বরূপ দান করিয়াছিলেন। তিনিই কালীঘাটে ৺কালীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

১৭৪১ খৃষ্টাব্দে "বর্গীর হাঙ্গামা" হইয়াছিল। ইহার ভীষণ প্রভাবে সমগ্র বাঙ্গালা-দেশের অধিবাসিগণ বিকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। বর্গীরা নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর নিকটে "চৌথ" চাহিয়া বসিল। নবাবও উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহা দিতে স্বীকার করায় বর্গীরা শান্ত ভাব ধারণ করিল। নবাব কিরূপে "চৌথ" দিবেন, ইহাই তাঁহার ভীষণ চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। তাঁহার ধনাগার শূন্য। তখন বিপদে পড়িয়া তিনি জমীদারদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। জমীদার-গণও অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় নিরন্ন প্রজা-গণের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও সন্তোষ রায় নিরূপিত রাজস্ব না দিতে পারায় আলিবর্দ্দীর কারাগারে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, আলিবর্দ্দীকে চিৎপুর ও বাগবাজারের প্রজাগণের দুর্দ্দশা দেখাইয়া "বিশ-লাখী দায়" (কুড়িলক্ষ টাকার দেনার দায়) হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। এখন সন্তোষ রায় মহাশয় কিরূপে আলিবর্দ্দীর কারাগার হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও পাঠকগণের অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। সন্তোষ রায় মহাশয় ভীমের ন্যায় বলবান্ ও ভোজন-পটু ছিলেন। তিনি বাটীতে যেরূপ মনের মত আহারীয় বস্তু দ্বারা উদর-পূর্ত্তি করিতেন, নবাবের কারাগারে তিনি সেরূপ আহারীয় সামগ্রী পাইতেন না। এই হেতু তাঁহার মহাকষ্ট হইতে লাগিল। নবাবের একটী বৃহৎকায় ও বলিষ্ঠ প্রিয় খাসি ছিল। এক দিন এই খাসি লইয়া নবাবের একজন খানসামা মুরশিদাবাদের কোন এক রাস্তায় বেড়াইতে গিয়াছিল। রায় মহাশয় লোভ-সংবরণ করিতে না পারিয়া সেই খানসামার নিকট হইতে খাঁসিটী ছিনাইয়া লইলেন এবং তাহাকে বধ করিয়া নিজ পাচক-ব্রাহ্মণ দ্বারা সেই সমগ্র খাসিটী রন্ধন করাইয়া একাকীই ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। খানসামা এই কথা নবাবের কর্ণ-গোচর করিল। নবাব সন্তোষ রায়কে ডাকাইয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন। কিন্তু সন্তোষ রায়ের কথায় নবাবের বিশ্বাস না হওয়ায় তিনি তৎপর দিন তাঁহাকে তাঁর একটী বৃহৎ খাসি খাইতে দিলেন। সন্তোষ রায়ও তাহা বধ ও রন্ধন করাইয়া অবলীলাক্রমে উদরস্থ করিয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া নবাব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমি তোমার অদ্ভুত আহার-দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। যে ব্যক্তি এত অধিক আহার করিতে পারে, সে যে আমার খাজনা বাকী রাখিবে, ইহা আর বিচিত্র কি! তোমার দেনার টাকা আমি তোমায় মকুব করিয়া দিলাম। যাহাতে আহারের জন্য আর আমার খাজনা বাকী না রাখ, তজ্জন্য তোমায় একখানি জমীদারী দান করিলাম।" এই সূত্রে সন্তোষ রায় মহাশয়, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর নিকট হইতে একখানি জমীদারী লাভ করিয়াছিলেন। ইহা ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্ত্তী। ইহার নাম "অবজাখালী-মহল" বা "খোরাকী মহল"।

চিৎপুরে "চিত্রেশ্বরী মন্দিরে" যে কত শত নরবলি হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে "কলিকাতার প্রাচীন ইতিহাস" সংগ্রহ করিতে আরম্ভ

করিয়াছিলাম। এইহেতু তৎকালে সুপ্রসিদ্ধ সুপণ্ডিত কে, এম্, বাঁড়ুয্যে (K. M. Banerji) মহাশয়ের নিকটে যাতায়াত করিতাম। তাঁহার মুখে যখন কলিকাতার প্রাচীন কথা শুনিতাম, তখন তাঁহার কন্যা স্বর্গতা মনোমোহিনীও আমার নিকটে আসিয়া বসিতেন। উভয়েই বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের মুখে কলিকাতার পুরাতন কথা শুনিয়া বিমুগ্ধ হইয়া পড়িতাম। তখন তিনি প্রসিদ্ধ "কলিকাতা-মিউজিয়ম্" বাটীর পূর্ব্বদিকে সদর ষ্ট্রীটে ৭নং বাটীতে বাস করিতেন। এক দিন কথায় কথায় বাগবাজার ও চিৎপুরের কথা উঠিল। তিনি বলিলেন, "মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা মহাশয়ের বাটীর পূর্ব্ব দিকের গলি মধ্যে একখানি বাটীতে আমার জন্ম হইয়াছিল। তৎকালে কলিকাতায় কোন ভদ্রলোক বালকদিগকে অপরাহ্ণ ৪টার পরে বাটী হইতে বাহিরে যাইতে দিতেন না। সেই সময় "ছেলেধরার" এত ভয় ছিল যে, তাহা বলা যায় না। আমরা যখন তখন শুনিতাম, অমুকের ছেলেকে পাওয়া যাইতেছে না। ছেলের মাতাপিতা বাগবাজার ও চিৎপুরে গিয়া ছেলের অনুসন্ধান করিত। যাহারই ছেলে হারাইত, অমনি তাহাকে বাগবাজার ও চিৎপুর অঞ্চলে যাইতে হইত। অতি নীচ জাতির ছেলেকেই সহজে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইত। চণ্ডাল-জাতীয় ছেলেই অধিক প্রার্থনীয় ছিল। বাগবাজার ও চিৎপুরের নাম কাণে শুনিতাম বটে, কিন্তু ২৪ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে এই দুইটী স্থান চক্ষে দেখি নাই। হরীতকী-বাগানে সহাধ্যায়ী দেবু মুখোপাধ্যায়ের বাটীতেই প্রাতঃকালে ও দুপুর বেলায় মধ্যে মধ্যে যাইতাম। ২৪ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বাগবাজার ও চিৎপুরে যাওয়া দূরে থাকুক, হেদুয়া-পুষ্করিণীর উত্তর-দিকে পদার্পণ করি নাই। এই পুষ্করিণীর পশ্চিম-দিকে যে গির্জ্জা-ঘর আছে, তাহা আমারই যত্নে স্থাপিত হইয়াছিল। যখন এই গির্জ্জা-ঘর নির্ম্মিত হইতেছিল, তখন একটী চণ্ডাল-জাতীয় মিস্ত্রীর ১২ বৎসর বয়সের পুত্র নিরুদ্দেশ হইয়াছিল। বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাহাকে পাওয়া যায় নাই। বোধ হয়, সেই ছেলেটী কোন "ছেলেধরা"র হাতে পড়িয়া থাকিবে।"

স্বর্গত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরও মুখে একটী গল্প শুনিয়াছিলাম। তিনি এক দিন রামগতি ন্যায়রত্ন ও আমার সম্মুখে গল্পচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "হরীতকী-বাগানে বাবার টোল ছিল। আমি ও আমার এক জন সমপাঠী এক দিন দুপুর বেলায় হেয়ার সাহেবের বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আমাদের সাহস আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য তিনি আমাদিগকে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত আট্‌কাইয়া রাখিলেন। অপরাহ্ণে বেলা ৪টার পূর্ব্বে বাটীতে ফিরিবার জন্য বাবা আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন। বাবার আজ্ঞা পালন করিতে না পারায় মনে মনে বিষম ক্ষুণ্ণ হইলাম। সন্ধ্যার সময় হেয়ার সাহেব বলিলেন, এখন তোমরা বাটীতে যাইতে পার। একে বৈশাখ মাস, তাহাতে আবার "কাল বৈশাখী"। বর্ত্তমান ছোট আদালতের দক্ষিণ-দিকে হেয়ার সাহেবের বাটী ছিল। লালবাজারে আসিয়াই ঝড়বৃষ্টি পাইতে আরম্ভ করিলাম। তৎকালে আমার ভূতের ভয় ছিল। আমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে। বাবার মুখে শুনিয়াছিলাম, "রাম-নাম" করিলে নিকটে ভূত আসিতে পারে না। কাজেই আমরা উভয়ে সমস্ত পথ 'রাম-নাম' করিতে করিতে হেদুয়া পুষ্করিণীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তৎকালে এই স্থান অতি ভয়ঙ্কর ছিল। সন্ধ্যার সময় কোন ভদ্রলোকই এই স্থানে আসিতে সাহস করিতেন না। সেই সময়ে কর্ণওয়ালিস্-ষ্ট্রীটে দুইটীমাত্র রেড়ির তেলের আলোক জ্বলিত। একটী অক্রুর দত্তের বাটীর সম্মুখস্থ গলির মোড়ে, এবং আর একটী হেদুয়া-পুষ্করিণীর উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত ছিল। এখন যেখানে ৺কাশীপ্রসাদ ঘোষের বাটী, ঠিক তাহারই সম্মুখে দেখিলাম, দুইটী দীর্ঘকায় বলবান্ পুরুষ দণ্ডায়মান। তখন হেদুয়া-পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে নিবিড় কেয়া-গাছের বন ছিল। এই বনের ভিতর হইতেই উক্ত দুই মহাত্মা লাঠী হাতে করিয়া বাহির হইল। আমরা তাহাদিগকে ভূত-প্রেত মনে করিয়া ক্রমাগত রাম নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। ঠিক সেই সময়ে পশ্চাদ্দিক্ হইতে "ভুডেব্, ভুডেব্" এই শব্দ শুনিতে পাইলাম। পিছন ফিরিয়া দেখি, হেয়ার সাহেব একখানি ছোট টম্‌টম্-গাড়ী হাঁকাইয়া আসিতেছেন। ঝড়-বৃষ্টিও তখন বিলক্ষণ চলিতেছিল। হেয়ার সাহেব তাঁহার গাড়ীতে উঠিবার জন্য আমাদিগকে বলিলেন।

আমি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে 'শ্যালক' বলিয়া সম্বোধন করিতেও কুণ্ঠিত হই নাই। হেয়ার সাহেবকে দেখিয়া সেই দুইটী ভীষণ মূর্ত্তি কেয়া-বনের ভিতরে প্রবেশ করিল। আমি ও আমার বন্ধু, সাহেবের গাড়ীতে না উঠিয়া পদব্রজে আমাদের হরীতকী-বাগানের বাটীর দিকে আসিতে লাগিলাম। পিছনে পিছনে সাহেব মহাশয়ও গাড়ীতে চড়িয়া আসিতে লাগিলেন।

"সন্ধ্যাকাল অতীত হইয়া গেল, তথাপি আমরা উভয়েই বাটীতে আসিলাম না। এই হেতু আমাদের বাটীতে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। দুর্ভাগ্য-বশতঃ সেই দিন বৈকালে দুইটী 'ছেলে-ধরা' আসিয়া আমাদের পাড়া হইতে একটী বাগ্দীর ছেলেকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। ছেলেটীর অনুসন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় আমার মাতাপিতার কিরূপ দুর্ভাবনা হইয়াছিল, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। আমরা দুই বন্ধু ও হেয়ার সাহেব তিনজনেই একসঙ্গে আমাদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদিগকে দেখিয়া তখন মাতাপিতার চিন্তা দূর হইল। হেয়ার সাহেব বাবাকে বলিলেন, আপনার পুত্র আমাকে 'শ্যালক' বলিয়াছে। ইহা শুনিবামাত্র বাবা আমাকে ক্রোধভরে বলিলেন, সাহেব তোর গুরু। গুরুকে এই দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিস্। এখনই ইহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা কর্। আমি সাহেবের পা ছুঁইলাম না, এজন্য বাবা ক্রোধভরে আমার ডান হাত লইয়া তাঁহার পাদস্পর্শ করাইয়া দিলেন।"

এখন পাঠক-গণ! বুঝিয়া দেখুন, এক শত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় মানুষের কিরূপ প্রাণের ভয় ছিল। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ২৪ এপ্রিল তারিখের (১১৯৫ বঙ্গাব্দে ১৫ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার দিবসের) "কলিকাতা-গেজেটে" সম্পাদকীয় স্তম্ভে চিৎপুরে চিত্রেশ্বরী মন্দিরে একটী নরবলির সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে বাঙ্গালা ভাষায় ইহার অনুবাদ দেওয়া গেল:—"আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইলাম যে, বিগত ৬ এপ্রিল (২৭ চৈত্র, রবিবার) অমাবস্যার রাত্রিতে চিৎপুরে চিত্রেশ্বরী মন্দিরে একটী ভীষণ নরবলি হইয়া গিয়াছে। ঘোর অন্ধকারের সুবিধা পাওয়ায় এই ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, কিন্তু কে যে এরূপ কার্য্য করিয়াছে, তাহা অদ্যাপি জানিতে পারা যায় নাই। পরদিন প্রাতঃকালে নিম্ন-লিখিত ব্যাপার সকল জানিতে পারা গিয়াছে। রাত্রিকালে কোন লোক দরজা ভাঙ্গিয়া মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। কালী মূর্ত্তির পদতলে নরমুণ্ড এবং মন্দিরের চৌকাটের উপরিভাগে দেহের অবশিষ্ট অংশ পড়িয়া ছিল। নরবলি দিবার সময় দেবীর অঙ্গ, নূতন বহুমূল্য বস্ত্র এবং সুবর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত কণ্ঠ-ভূষণ ও বাহু-ভূষণে মণ্ডিত করা হইয়াছিল। পূজার উপযোগী পাত্রাদিও সেই স্থানে পাওয়া গিয়াছে। যেরূপ শাস্ত্রীয় নিয়মে নরবলি দিবার বিধান আছে, পাত্রগুলিও ঠিক তদনুরূপ। নরবলি-যজ্ঞের কার্য্য-কলাপ দেখিয়া বোধ হয়, ইহা কোন ধনাঢ্য শাস্ত্রজ্ঞ লোকেরই দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। যাহাকে বলি দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে চণ্ডাল বলিয়াই বোধ হয়। চণ্ডাল-জাতীয় লোককে বলি দেওয়াই শাস্ত্র-সঙ্গত। কোন্ কোন্ ব্যক্তি এই কার্য্যে লিপ্ত ছিল, তাহা জানিবার নিমিত্ত কলিকাতার ফৌজদারি নিত্য-পূজক পুরোহিতকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনরূপ সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।"

ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য

ডাক্তার শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, ডি-এস্‌সি, এম-বি

দেশের স্বাস্থ্যের দিকে এখন অনেকেরই নজর পড়িয়াছে। পল্লী-গ্রামে নানাপ্রকার স্বাস্থ্যসমিতি, পল্লীমণ্ডলী প্রভৃতি গ্রামবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। বড়ই আশার কথা সন্দেহ নাই। অনেকে ভাবেন, পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করিলেই বুঝি কাজ শেষ হইল। সহরে মিউনিসিপ্যালিটী আছেন, গভর্মেণ্ট আছেন, সহরবাসীর শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা ইঁহাদেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু সাধারণের ব্যক্তিগত চেষ্টা ভিন্ন, গভর্মেণ্টের সহস্র চেষ্টাতেও সহরের স্বাস্থ্যের উন্নতির আশা নাই। সুখের বিষয়, কলিকাতায় মিউনিসিপ্যালিটির বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলিতে স্বাস্থ্য-সমিতি গঠিত হইতেছে। ইহারা পাড়ায় পাড়ায় সহরবাসীর স্বাস্থ্যের উপর লক্ষ্য রাখিবেন। কিন্তু ইহাও যথেষ্ট নহে। গভর্মেণ্ট সাধারণভাবে স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করিয়াও, বিশেষ বিশেষ স্থলে বিশেষ প্রকারের

বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। সৈন্যদের স্বাস্থ্য কিসে ভাল থাকে, গভর্মেণ্ট তাহা বিশেষ যত্নসহকারে দেখেন। অনেক সওদাগরী আপিসে কেরাণীদের স্বাস্থ্য-পরিদর্শনের জন্য ডাক্তার নিযুক্ত আছেন। বড় বড় কারখানায় ও চা-বাগানে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্যও ডাক্তার নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। দেশের ভবিষ্যতের আশা-ভরসা ছাত্রমণ্ডলীর স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে, সে বিষয়ের চেষ্টার আবশ্যকতা কাহাকেও বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না। ইয়োরোপের সর্ব্বত্র ও আমেরিকা জাপান প্রভৃতি দেশে ছাত্রদের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিবার সুবন্দোবস্ত আছে। ইংলণ্ডের সহিত আমাদের সম্পর্ক অধিক। ইংলণ্ডবাসী ও আমরা একই গভর্মেণ্ট দ্বারা শাসিত। এই ইংলণ্ডে স্কুলের বালক-বালিকাগণের স্বাস্থ্যের ভার "বোর্ড অব্ এডুকেশনে"র হস্তে ন্যস্ত। স্যার জর্জ্জ নিউমান্ এই বোর্ডের প্রধান ডাক্তার। বোর্ড প্রতি বৎসর বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যের একটি করিয়া রিপোর্ট প্রকাশ করেন। বোর্ডের কার্য্যে বিভিন্ন স্থানীয় সমিতিগুলি সাহায্য করিয়া থাকেন। সম্প্রতি ১৯২৩ সালের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। এই বৎসরে ১৭,৫৪,৯১৯টি ছাত্র পরীক্ষিত হইয়াছে। এই ছাত্রদের মধ্যে শতকরা প্রায় ১৯জন কোন না কোন গুরুতর ব্যাধিগ্রস্ত। ইহাদের চিকিৎসা আবশ্যক। সামান্য সামান্য অসুখের কথা ধরিলে দেখা যায়, প্রায় শতকরা ৫০জন অসুস্থ। এই সকল ছাত্রের চিকিৎসার ব্যবস্থা স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠিত প্রায় ১,০৭৭ School Clinic বা চিকিৎসালয়ের হস্তে ন্যস্ত। ইহা ছাড়া কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া প্রায় ৩৯০টি হাসপাতাল ছাত্রদিগকে নিখরচায় চিকিৎসা করিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে স্বাধীন চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরাও স্বেচ্ছায় ছাত্রদিগকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত বিশেষ বিশেষ শারীরিক ও মানসিক দোষ বা ত্রুটিযুক্ত ছাত্রদিগের জন্য ৫৩০টি স্বতন্ত্র স্কুলের ব্যবস্থা আছে। একবেলা হিসাবে ধরিলে, কর্ত্তৃপক্ষেরা প্রায় এককোটি দশ লক্ষ বেলার আহার যোগাইয়াছেন। বোর্ডের মতে, তাঁহাদের চেষ্টার ফলে ছাত্রদের মাতা-পিতারা তাঁহাদের বালক-বালিকাদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অধিক যত্নবান্ হইয়াছেন। এত করিয়াও বোর্ড নিজেদের কাজে সন্তুষ্ট নন। তাঁহারা বন্দোবস্ত আরও সুচারু করিবার চেষ্টায় আছেন। এই সকল অনুষ্ঠানে যে কিরূপ ব্যয় হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। একমাত্র খাওয়াইবার খরচই প্রায় দেড় কোটি টাকা।

এখন আমাদের দেশের অবস্থা কি দেখা যাউক। দু'এক স্থলে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু সে চেষ্টা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। চিকিৎসার ব্যবস্থা ত কিছুই নাই। সম্প্রতি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবেন মনস্থ করিয়াছেন, কিন্তু কাজে এখনও বিশেষ কিছু ঘটিয়া উঠে নাই। কলিকাতায় বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৩০ হাজারের কাছাকাছি এবং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, পরীক্ষা করিলে শতকরা ৫০টিরও অধিক ছাত্রের চিকিৎসার প্রয়োজন। জাতির ভাবী আশা ভরসা কি এইরূপেই নষ্ট হইবে? আমরা কি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এখনও উদাসীন থাকিব? হয় ত চোখের দোষে, কাণের দোষে বা অন্য ব্যাধির ফলে ছাত্র পাঠে মন দিতে পারে না,—শিক্ষক স্কুলে তাহাকে শাসন করেন, বাড়ীতে পিতামাতা তাড়না করেন। ইহাই ত এখানকার অবস্থা। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, আমাদের গরীব দেশে আর উপায় কি? কষ্ট সহ্য করিতেই হইবে। কিন্তু সকলে যদি উঠিয়া পড়িয়া চেষ্টা করেন, তবে ইহার একটা প্রতীকার হইতে পারে। আপাততঃ ৫০ হাজার টাকা হইলে কাজ ভাল করিয়াই আরম্ভ হইতে পারে। এই টাকা তোলা কি এতই কঠিন?

স্কুলে ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলেও, বিশ্ববিদ্যালয় স্বীয় অধীনস্থ কলেজগুলির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন নহেন। প্রায় ৪।। বৎসর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের Student Welfare Committee কলেজের ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতেছেন। এ যাবৎ প্রায় ১০ হাজার ছাত্রের পরীক্ষা হইয়াছে। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে, যে, তিনজন ছাত্রের মধ্যে দুইজনের কোন না কোন অসুখ আছে এবং তাহার চিকিৎসা আবশ্যক। ছাত্রদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ১৬ বৎসরের পর হইতেই ক্রমে ক্রমে কমিতে থাকে। এই সকল ছাত্রের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিতে হইলে যে পরিমাণ টাকার আবশ্যক, কমিটির হাতে তাহা নাই। কমিটি বাৎসরিক প্রায় ১০ হাজার টাকা ব্যয় করেন। বিলাতের হিসাব দেখিলে বুঝা যাইবে যে, কার্য্যের অনুপাতে এ টাকা কিছুই নহে। সহৃদয় দেশবাসীর দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

এতদিন কোন বাঙ্গালীর ছেলে বয়সের হিসাবে মোটা কি রোগা, তাহার দেহের ওজন কম কি বেশী—ইত্যাদি বিষয় জানিবার কোন উপায় ছিল না। Student Welfare Committeeর পরীক্ষায় এ বিষয়গুলি এখন অনেকটা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কমিটির রিপোর্ট হইতে পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় একটি তালিকা তুলিয়া দিলাম। ইহা দেখিলে কত বয়সের ছেলের কতটা খাড়াই হইলে কতটা ওজন হওয়া উচিত, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। এরূপ তালিকা এদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। যাঁহারা ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আরও বিশদরূপে জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই ঠিকানায় পত্র লিখিলেই, বিনামূল্যে রিপোর্ট পাইবেন:—

The Hony. Secretary Student Welfare Committee
Durbhangâ Buildings Senate House Calcutta.

আমার অনুরোধ, দেশের এই নবজাগরণের দিনে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য বিষয়ে দেশ-হিতৈষীরা আর যেন নিশ্চেষ্ট না থাকেন।

তালিকা *

খাড়াই ও বয়স হিসাবে ছাত্রদিগের (১৬ হইতে ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত) ওজনের তালিকা ওজন—পাউণ্ডে দেওয়া আছে—(প্রায় ২ পাউণ্ডে ১ সের) খাড়াই—ফুট ও ইঞ্চিতে

খাড়াই ফিট—ইঞ্চি	মোট		বয়স—১৬		বয়স—১৭		বয়স—১৮		বয়স—১৯		বয়স—২০		বয়স—২১		বয়স—২২		বয়স—২৩		বয়স—২৪	
	ওজন	কমবেশী	ওজন	কমবেশী	ওজন	কমবেশী	ওজন	কমবেশী	ওজন	কমবেশী	ওজন	কমবেশী	ওজন	কমবেশী	ওজন	কমবেশী	ওজন	কমবেশী	ওজন	কমবেশী
৪—৭½	৮২·৫	৭·৩১			৭৭	২·৯২			৯ ৯১											
৪—৮½	৭৯·২	৬·৬			৭৯·২	৬·৬														
৪—৯½	৮১	৭·৭	৭৩	৪·৪	৮৬	—	৭৭	২৯·২					৯৯	—	৯২·৪	—				
৪—১০½	৮৯	৮·০৭	৭৯·২	—	৮৮	১১	৮১·৯৫	৫·৮৫	৯০	৭·৪৮	৯২·৯	১০·৫৬	৮৭·৯	২৪·৭	৯০·২	৫·৭	৯৯	—		
৪—১১½	৯২·৬	৯৬	৮৪	৬·৭	৮৯	৭·৩৫	৯৬	৯·৪১	৯০·১	৭·৯৬	১০৯·১	১৩·২	৯৮	৭·৭	৮৬	৪·৪	...	...	১২৫·৪	—
৫—০½	৯৬·৫	৮·৬	৯২·৪	১১·৯	৯৫·২	৮·৭১	৯৬·৫	৯·৫৭	৯৮	৯·৩২	৯৮·৩৪	৪·৯	৯৩·১	৪·৮৪	১০১·২	৭·২৬	৯১	৪·৪	১০৬	—
৫—১½	৯৯·৬	৯·২৪	৯৬	৯·৯	৯৭	৮·৩৬	১০০·৩	৪·৪	৯৯	৮·২	১০৩·৪	১২·৫	৯৯·২	৯·৩	১০২·১৬	৭·৯৪	১০৩·৮	১১·২২	১০০·৩২	৪·৬২
৫—২½	১০২	৯·৮৫	৯৫·৫	৮·৫৮	৯৯	১০·৯৩	১০১·৭	৯·৭৯	১০৩·৪৫	৯·২৬	১০৩·৪	৯	১০২·৫	৭৯·২	১০৭·৩৬	১০·৯৩	১০৪·১	৬·৫৩	১০৮·৫	১৪·২
৫—৩½	১০৬·১	১০·৪৯	১০০·৫	৮·১৪	১০২	৯·০২	১০৬·৪	১০·৫	১০৬·৩	১০·৩২	১০৯·১	৯·৬	১০৭·৩৬	৯·২৪	১১৪·১৮	১২·০৫	১০৪·১৯	৮·৯৫	১১৩	১২·৬৫
৫—৪½	১০৯·৫	১১·৩	১০২	৮·৫৮	১০৮·৫	১১·১৫	১০৭	৯·৫৭	১০৩	১১·১৩	১১০	১০·৫	১১৩·১	১১·৫৫	১১৭·৫	১৩·৯	১১৮	১৩·৭৫	১০৯·৪৫	১২·১
৫—৫½	১১৩·৩	১১·৬	১০৭	১১·৪	১১০	১১·১৭	১১৩	১০·১	১১২	১০·৭	১১৫	১১·৯৬	১১৭·৫	১৪·০৩	১১১·৭৬	১০·৪৫	১২০·১	১২·৫৮	১২৩·৩৩	১২·২
৫—৬½	১১৬·২	১১·৪	১১৩·৯	১২·৭৬	১১৪·৫	১১·৪৮	১১৪	১১·৯	১১৬·৯	১১·৭	১১৮	১০·৬	১১৭·৩	১০·৩৬	১১৫·২	১০·৭৮	১১৭·৩২	১২·৮	১১৮	৮·২১
৫—৭½	১২০·২	১১·৪	১১৯·৬	১২·৫	১১৯·৫	১৫·৭৩	১২৩	১৬·৯	১১৭·৪	১১·১৭	১২৩·২১	১৩·৩	১১৯·২	১১·৯৬	১২৫	১২·৩৮	১২১	১৪·৪৫	১২৩·৮	১০·৩৫
৫—৮½	১২৩·৯	১২·৭৬	১২৮	২২·৯	১১৮·৯	১০·৩৮	১২০·১	১১·৮	১২২·৩	১০·৯	১২৮	১৪·৬	১২৭·১৬	১৪·৭৪	১২২	১২·৮৭	১৩৪·৯২	৯·১৫	১৩৩	১০·৪৫
৫—৯½	১২৭	১৪·৩	১১৪·৩	৭·২২	১১৮	১০·৯৩	১২৭	১২·১	১৩০·১	১·৮৩	১২৮·৪৩	১৫·৮	১২৬·৮	১৩·৯৪	১২৮	১৩·৩১	১১৫·২	৯·৫৪	—	—
৫—১০½	১৩০	১৫·৬	১৩২	১৩·২	১১৭·৯০	১৩·১১	১২৭·২	১২·৮	১৩২	১৬·৫	১২৮·১৫	১২·৪	১৩৪·২	১০·৫৬	১৩৩	২২·৮৮	১২৯·৮	১০·২৫	১২৫·৪	৬·৬
৫—১১½	১২৮·৫	৮·৯	১২৫·৪	—	১২৬	৮·৮	১২৭·৯৫	৭·৩২	১৩৪·২	১১·৭	১২৪·৯	৪·৮৬	১২৫·৪	—	১৩৯	১৯·৮	১১২·২	—	১৩৯	—
৬—০½	১৩০·২	১৬·০১	—	—	১১৭	৫·৮৫	৯৯·১	nil	১২৯	৯·৯	১২৯	১৬·৫	১৫২·২	১৬·৫	১২১·৪	৬·৬				
৬—১½	১৩৫·৬	১১·২	১৫১·৮	—	—	...	১৩৫·৩	৯·৯	১৪৯	৩·৩	১২২·১	৯·৯	১১৯	—	১৩৯	—	...			

* এই তালিকা হইতে কোন ছেলের ওজন স্বাভাবিক বা অতিরিক্ত কিংবা কম তাহা বুঝা যাইবে। মনে করুন, কোন ছেলের বয়স ১৬, খাড়াই ৫ ফুট ও ওজন ১ মন ১০ সের। এই ছেলের ওজন ঠিক আছে কিনা তাহা দেখিতে হইলে তালিকায় ৫ ফুট খাড়াই ও ১৬ বছরের ঘরে কত ওজন আছে দেখা দরকার। ৫ ফুট খাড়াইএর কোন ঘর নাই, কিন্তু ৫ ½ খাড়াইএর ঘর আছে, সে জন্য এই ঘরই দেখিতে হইবে। ½ ইঞ্চি তফাতের জন্য বিশেষ কিছু যায় আসে না। এই ঘরের ১৬ বছরে নীচে ওজন লেখা আছে ৯২·৪ কম বেশী ১১·৯ অর্থাৎ এইরূপ খাড়াইএর ১৬ বছরের ছেলের ওজন ৯২·৪+১১·৯ বা ১০৪·৩ পাউণ্ড হইতে ৯২·৪—১১·৯ বা ৮০·৫ এর ভিতর হইলে স্বাভাবিক জানিতে হইবে। উদাহরণের ছেলের ওজন ১ মন ১০ সের অর্থাৎ—১০২ পাউণ্ডের কিছু বেশী—অতএব ইহার ওজন স্বাভাবিক। বয়সের হিসাব না করিয়া বিভিন্ন বয়স্ক ছেলেদের একত্র ধরিলে, কেবল খাড়াই অনুসারে যে ওজন স্বাভাবিক, তাহা এই তালিকার "মোট" ঘরে পাওয়া যাইবে।

জ্যান্ত জগন্নাথ

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীদেহখানি রীতিমত সেবার অভাবে দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে। প্রসাদের অনাটনে পাণ্ডা ঠাকুরটির ভুঁড়িতে ভাঁটা পড়িতেছে।—প্রভুজীর নবকলেবর ধারণের পূর্ব্বেই যেন দেশবাসিগণ এদিকে একটু নজর দেন।

প্রসাদ-প্রত্যাশী

শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামী

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব বি-এস্‌সি

নব জ্যোতিষ্কমণ্ডল

সম্প্রতি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রাকৃতিক আবহাওয়ার বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হ'চ্ছে দেখে বৈজ্ঞানিকরা এর তথ্য অনুসন্ধান ক'রে জান্‌তে পেরেছেন যে, সূর্য্যের চারিদিক হ'তে ঘিরে এককোটি ক্রোশব্যাপী একটি বিরাট নব জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছে। চন্দ্র, শুক্র, পৃথিবী প্রভৃতি অনেক গ্রহ উপগ্রহ এই মণ্ডলের মধ্যে থেকে সূর্য্যকে কেন্দ্র ক'রে তার চারিদিকে চক্রাকারে ঘুরছে। সেই বিরাট জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের মধ্যে সকল দিকের তাপ সমান নয়; এবং যখনই পৃথিবী বা অন্য কোনও গ্রহ বা উপগ্রহ জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের অধিকতর তাপবিশিষ্ট অংশের মধ্যে এসে পড়ে, তখন সেই গ্রহের তাপ বৃদ্ধি পায়; আবার সেই স্থান হ'তে দূরে চলে গেলে গ্রহের

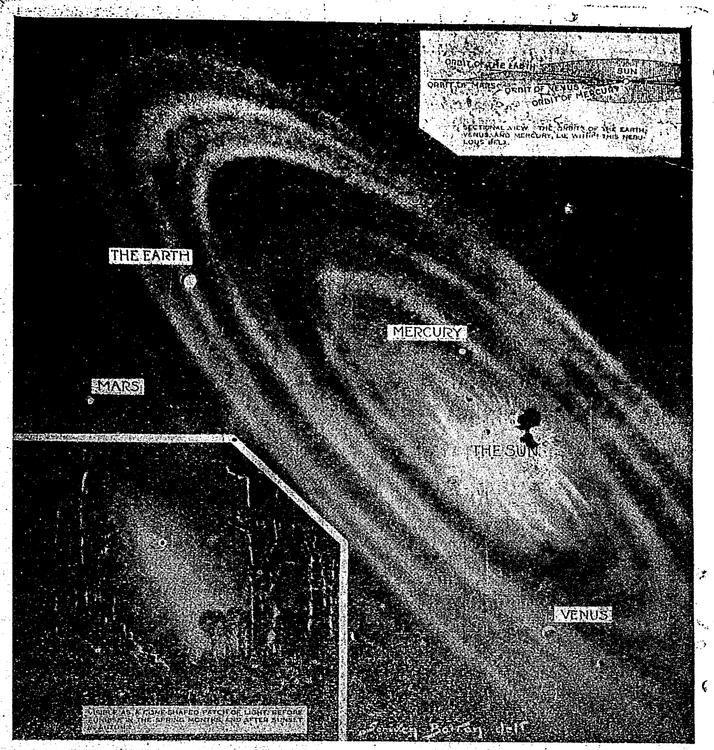

নব জ্যোতিষ্কমণ্ডল। (বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত নব জ্যোতিষ্কমণ্ডলের একখানি ছবি। সূর্য্যকে কেন্দ্র ক'রে, চন্দ্র শুক্র, পৃথিবী ইত্যাদি সব গ্রহ উপগ্রহ চক্রাকারে নব জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের মধ্য দিয়ে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে)

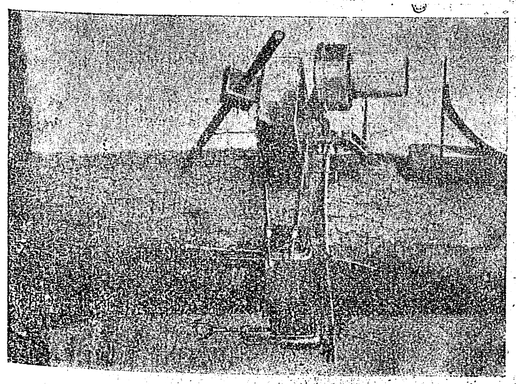

বৃক্ষের হ্রাসবৃদ্ধি। (বৃক্ষের হ্রাসবৃদ্ধি নিরূপণ ক'রবার যন্ত্র বৃক্ষে সংলগ্ন ক'রে তার পরীক্ষা হচ্ছে)

আভ্যন্তরিক তাপ অনেক কমে যায়। এই জন্যই একই দিনের মধ্যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে গ্রীষ্ম ও শৈত্যের বিপরীত অনুভূতি হয়।

বৃক্ষের হ্রাসবৃদ্ধি

বৃক্ষের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ণয় করবার জন্য একজন বৈজ্ঞানিক "ডেন্‌ড্রোগ্রাফ্" (Dendrograph) নামে একটি সুন্দর যন্ত্র উদ্ভাবন ক'রেছেন। এই যন্ত্রটি নিরূপিত সময়ে বৃক্ষকাণ্ডের চারিদিকে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন ক'রে দিলে বৃক্ষটি দৈর্ঘ্য বা প্রস্থে সমস্ত দিনের মধ্যে কতটা হ্রাস বা বৃদ্ধি লাভ ক'রে

তা' যন্ত্রে সংবদ্ধ একখানি কাগজের উপর আপনিই লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বৎসরের মধ্যে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছের সব চেয়ে বৃদ্ধি ও পৌষ মাঘ মাসে হ্রাস হয়ে থাকে।

নৈসর্গ-নিকেতন

মার্কিন দেশের ওয়াসিংটন সহরে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মিলিত হয়ে সম্প্রতি একটি বিজ্ঞানাগারের উদ্বোধন করেছেন। মার্কিন দেশের লোকেরা তা'র নাম দিয়েছে নৈসর্গ-নিকেতন। যত বৈজ্ঞানিক অদ্ভুত ব্যাপার যা' সাধারণ মানুষের কল্পনায়ও আসে না, তা' এই নূতন বিজ্ঞানাগারে সকলকে দেখান হয়। সূর্য্যের কিরণ কাঁচে প্রতিফলিত করে সূর্য্যের মধ্যকার কৃষ্ণরেখা বা অগ্নিবর্ণ দাগ পরিস্ফুট ক'রে তা'র আকার, অবস্থা ও অবস্থিতি পরিষ্কার ভাবে সাধারণ লোককে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

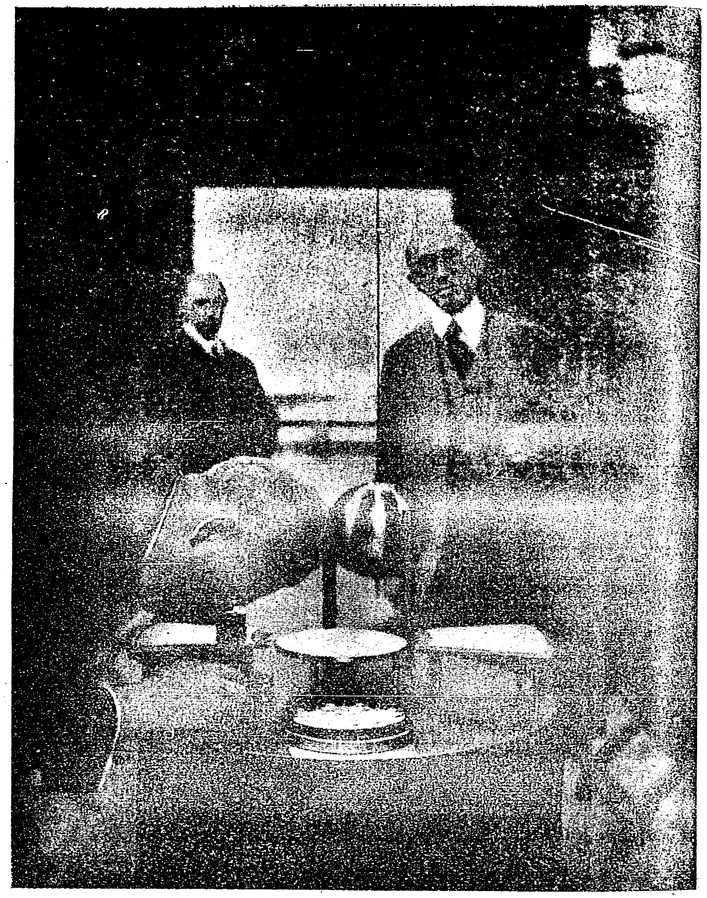

নৈসর্গ-নিকেতন (নৈসর্গ-নিকেতনের একটি ঘরে সাধারণ লোকেরা এসে সূর্য্যের মধ্যকার কৃষ্ণবর্ণ রেখা বা অগ্নিবর্ণ দাগের আকার, অবস্থা ও অবস্থিতি প্রত্যক্ষ ক'রছে)

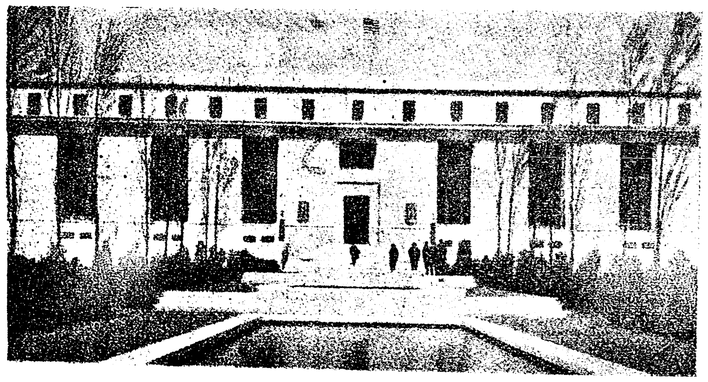

(নৈসর্গ নিকেতনের এই ঘরে সূর্য্য-কিরণের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ক'রে সাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়)

আবার সূর্য্য-কিরণের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ক'রে তার গুণাগুণ লোকের সামনে প্রত্যক্ষ করান হচ্ছে। বৃক্ষ-জীবনে সূর্য্য-কিরণ কি বিদ্যুৎ প্রবাহ—কে বেশী উপকারী, তাও প্রমাণ ক'রে সাধারণ লোককে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

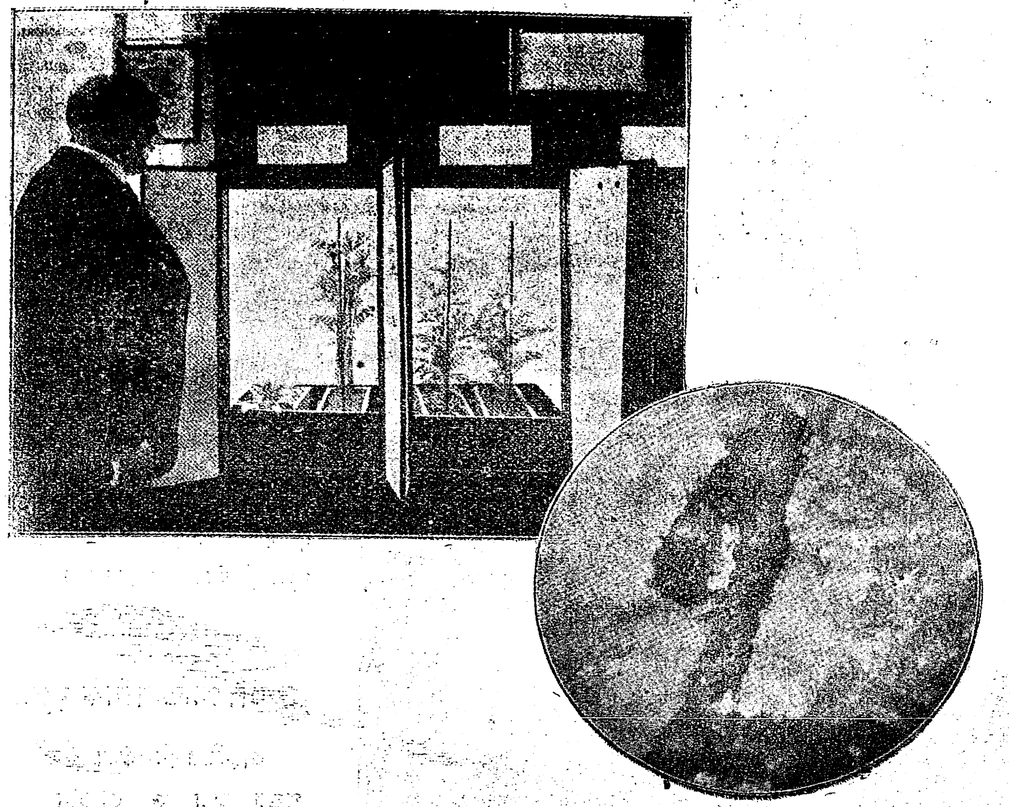

(নৈসর্গ-নিকেতনের কাচের ঘরে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ও সূর্য্য-কিরণে সঞ্জীবিত বৃক্ষের হ্রাসবৃদ্ধি নিরূপিত হচ্ছে)

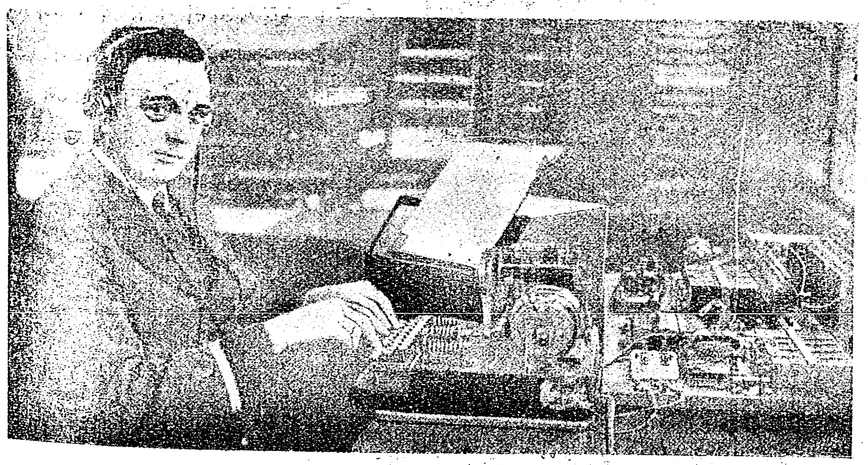

বেতারের লিপিযন্ত্র (বৈজ্ঞানিক বেতারে লেখার হরফে অন্যস্থলে সংবাদ পাঠাচ্ছেন)

বেতারের লিপিযন্ত্র

সম্প্রতি আমেরিকার নৌ-বিভাগের একজন অধ্যক্ষ একটি নূতন রকমের লিপিযন্ত্রের উদ্ভাবন ক'রেছেন, যদ্দ্বারা বেতারের সংবাদ যেখানে খুসি লেখার হরফে পাঠান যায়। লিপিযন্ত্রে (Typewriter) যেরূপ কথা লেখবার প্রয়োজন হ'লে বিভিন্ন চাবি টিপে কথাটি লিখ্‌তে হয়, সেরূপ বেতার লিপিযন্ত্রে চাবি টিপলে কথার প্রতিধ্বনি, যেখানে সংবাদ পাঠানোর প্রয়োজন, সেখানে যায়, এবং সংবাদ-গ্রাহকের লিপিযন্ত্রে সেটি লেখার হরফে ফুটে উঠে।

সিনোপাস (এই পশু বর্ত্তমান গণ্ডারের পূর্ব্বপুরুষ। এই সকল পশু কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে বিচরণ করত)

অতীত যুগের শ্লথ (sloth)

প্রাগৈতিহাসিক যুগের পশু

প্রকৃতির বিপর্য্যয়ে কত নূতন রকমের পশুর জন্ম ও প্রাচীন জাতীয় পশুর বংশলোপ পা'চ্ছে, তার কোনও হিসাব নেই। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যে সকল পশু পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিদ্যমান ছিল, এখন কালের বিবর্ত্তনে ২।১টি খুব পুরাতন জঙ্গল ভিন্ন তা'দের আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আবার হয় ত যে সকল পশুর নাম প্রাণীতত্ত্বের ইতিহাসে কখনও পাওয়া যায়নি, এখন কালের বিবর্ত্তনে দেশে দেশে তা'দের প্রচুর পরিমাণে দেখা যাচ্ছে। মানুষের ইতিহাস তা'র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চল্‌তে পারে না। আমরা এখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কয়েকটি প্রাণীর চিত্র দিলাম।

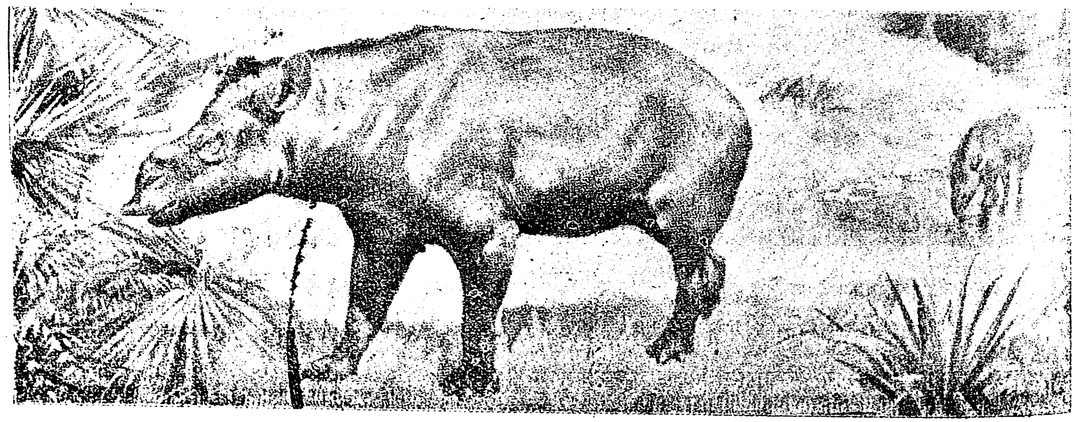

অতীত যুগের শূকর

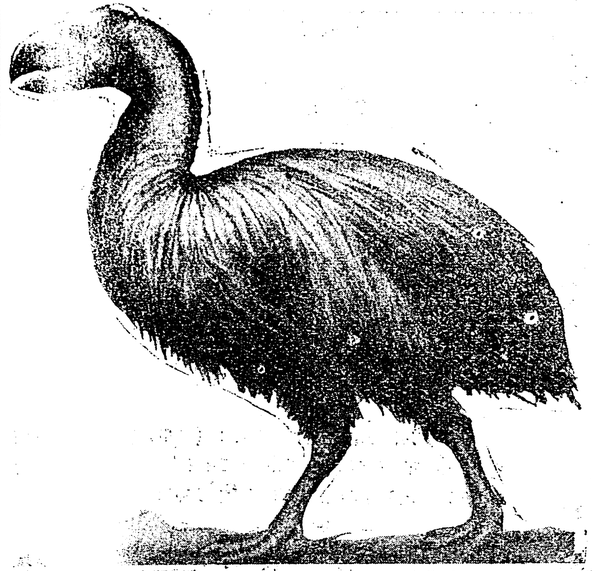

পেলিওসিওপস্ (Paleosyops)
(...ায় দু' কোটি বৎসর পূর্ব্বে নদীর ধারে ধারে বিচরণ কর... ...omingএ এদের অস্থি-পঞ্জর সব পাওয়া গেছে)

খড়্গাধারী ব্যাঘ্র
(এই জাতীয় ব্যাঘ্রও তুষারযুগের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে কোথাও কোথাও বিদ্যমান ছিল। ব্যাঘ্রের মাথার উপরে তারই সমযুগের শকুনি বসে রয়েছে)

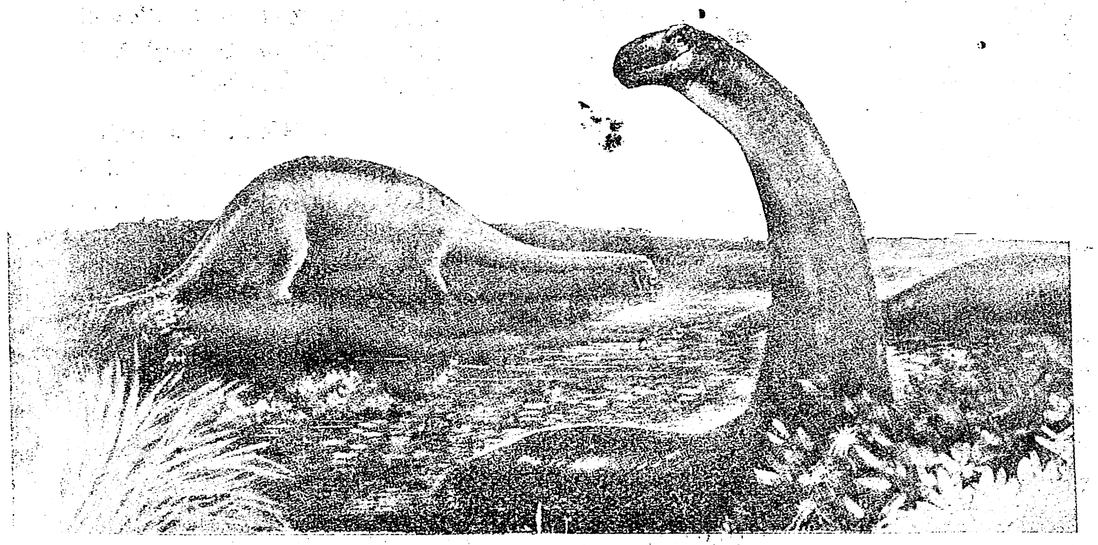

বিরাট টিক্‌টিকি। (Thunder Lizards) (বর্ত্তমান কুম্ভীর ও অষ্ট্রীচ পক্ষীর পূর্ব্বপুরুষ। এরা প্রায় কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে থাকত)

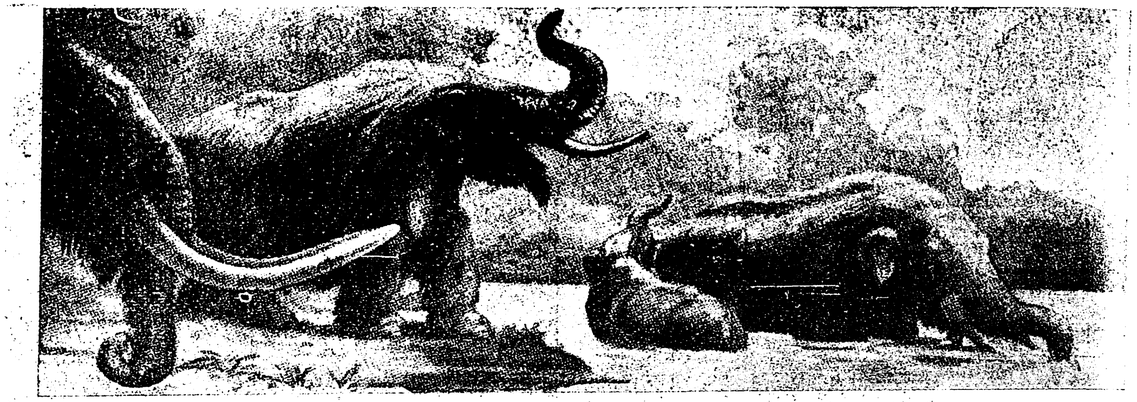

প্রাগৈতিহাসিক যুগের পশু। (তুষার যুগের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এই সকল লোমশ মাসটোডন (hairy Mastodon) মার্কিন দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতি ক'রত)

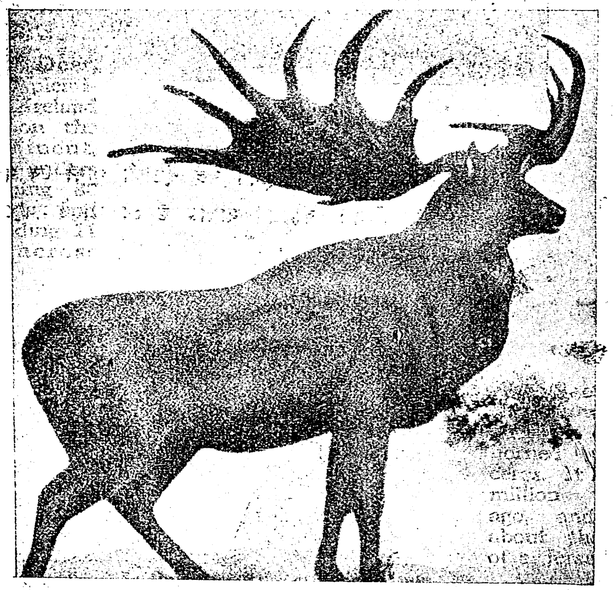

আইরিশ হরিণ (এই সকল হরিণ পূর্ব্বে আয়ার্ল্যাণ্ডে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত; এখন তাদের পৃথিবীর কুত্রাপি পাওয়া যায় না)

টর্পিডো গাড়ী

হগ্ ডাল (Haug Dahl) নামক একজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক এক রকম নূতন ধরণের মোটর গাড়ী তৈরী ক'রেছেন, যদ্দ্বারা তিনি প্রতি মিনিটে তিন ক্রোশ ক'রে পথ অতিক্রম ক'রতে পারেন। এই গাড়ীটির আকার অনেকটা টর্পিডোর মতো। কেবল হাওয়া যাতায়াতের জন্য সম্মুখভাগে কয়েকটি ছিদ্র আছে। সংঘর্ষণের ফলে যা'তে গাড়ীটি চূর্ণ হ'য়ে ভেঙে না যায়, এজন্য গাড়ীটির সমস্তই মজবুত ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরী।

একচাকার গাড়ী

রোম সহরের ডেভিড্ গিস্লাঘি (Davide Gislaghi) নামক একজন মোটরবিদ্ একটি সুন্দর একচক্র যান নির্ম্মাণ ক'রেছেন, যদ্দ্বারা তিনি অনায়াসে বহুচক্রবিশিষ্ট যানের গর্ব্বও খর্ব্ব ক'রতে পারেন। এই গাড়ীটির বাইরের দিকটিতে

টর্পিডো গাড়ীর পার্শ্বদৃশ্য (গাড়ীখানি মিনিটে তিন ক্রোশ পথ যখন অতিক্রম করছে তখনকার একখানি ছবি)

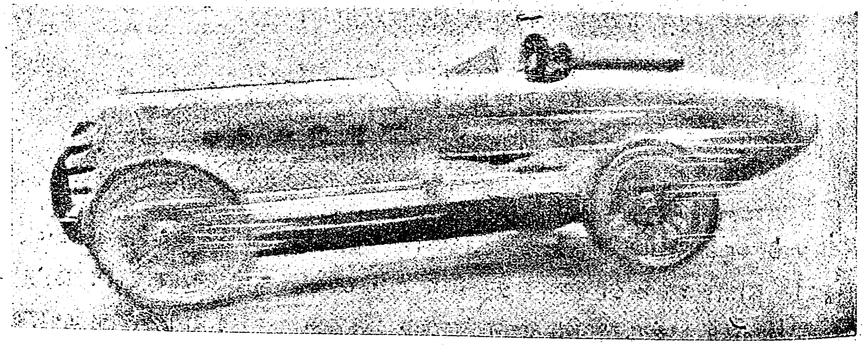

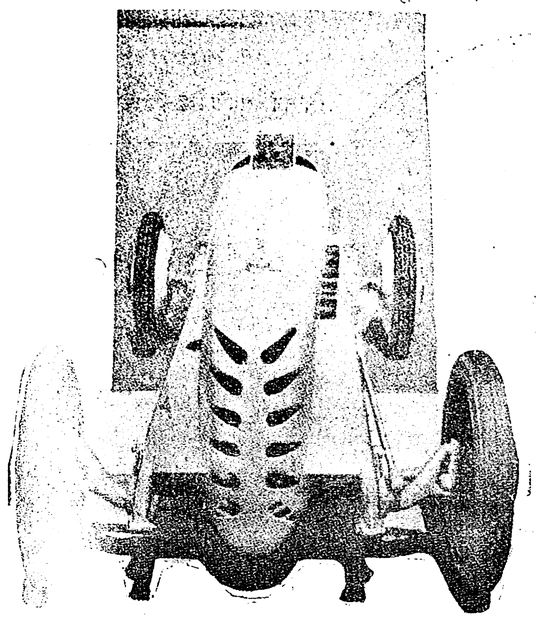

টর্পিডো গাড়ীর সম্মুখ দৃশ্য

টর্পিডো গাড়ী (হগ্ ডাল গাড়ী চড়বার পোষাক পরে দাঁড়িয়ে আছেন)

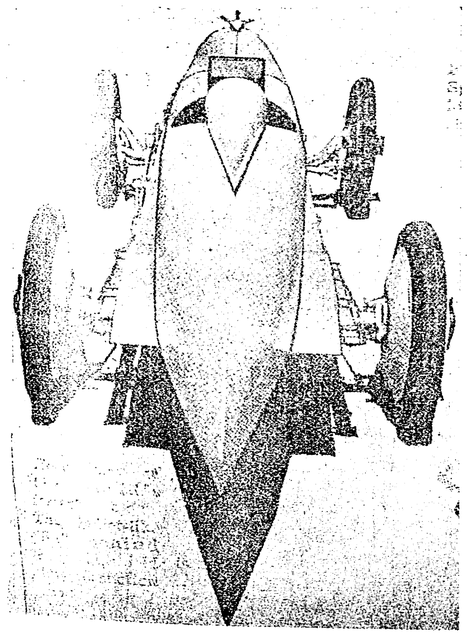

টর্পিডো গাড়ীর পিছনকার দিকের একটি দৃশ্য

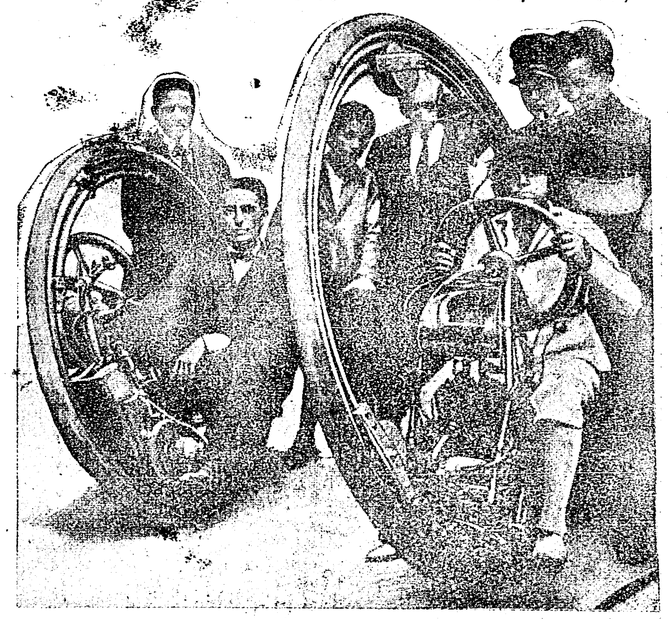

এক চাকার গাড়ী। (ডেভিড্ গিস্লাঘি ও তাঁর মেমসাহেব দুজনে দু'খানি একচাকার গাড়ী চড়ে পথ দিয়ে যাচ্ছেন)

লৌহবেষ্টনীর উপর আঁটা একটি রবারের চাকা আছে। ভিতর দিকে ঠেসান দিয়ে বসবার যায়গা ও মোটর-এঞ্জিনের যন্ত্রপাতি আর একখানি বিভিন্ন লৌহবেষ্টনীর উপর আঁটা থাকে। সেটি বাইরের চাকা ঘুরলেও তা'র সঙ্গে না ঘুরে ঠিক সমানভাবে থাকে। গাড়ীতে ঠেসান দিয়ে ব'সে গাড়ী চালালে প'ড়ে যাবার কোনও সম্ভাবনা নেই, অনায়াসে যত খুসি তত জোরে চালান যেতে পারে।

শিশির-শোভিত ঊর্ণনাভের দ্বিতীয় দৃশ্য

শিশির-শোভিত ঊর্ণনাভের একটি দৃশ্য

শিশির শোভিত ঊর্ণনাভের তৃতীয় দৃশ্য

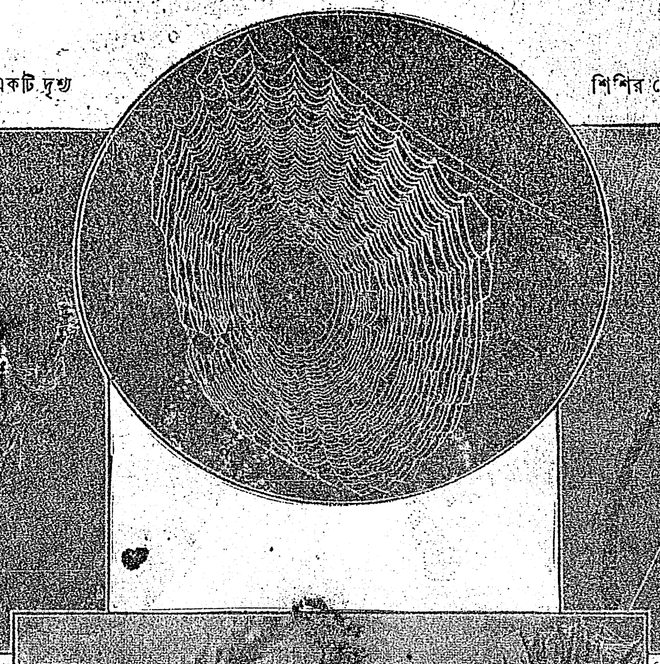

শিশির-শোভিত ঊর্ণনাভের চতুর্থ দৃশ্য

শিশির-শোভিত ঊর্ণনাভের পঞ্চম দৃশ্য

শিশির শোভিত ঊর্ণনাভের ষষ্ঠ দৃশ্য

প্রকৃতির খেলা

মাকড়সার জালকে আমরা আবর্জ্জনা বলেই মনে করি; কিন্তু অনেক সময় অনন্ত লীলাময়ী প্রকৃতি খেলার ছলে তা'দের এমন ক'রে সাজিয়ে রাখেন যে, দেখ্‌লে চোখ জুড়িয়ে যায়। অনেক সময় প্রাতঃকালে কোনও উদ্যানের ঝোপের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে মুক্তার মতো শিশির বিন্দু থরে-বিথরে মাকড়সার জালের ওপর প'ড়ে, সেই কদর্য্য জিনিসকে কেমন নয়নাভিরাম ক'রে সাজিয়ে দিয়েছেন।

সাময়িকী

এ মাসের 'ভারতবর্ষের' প্রচ্ছদ-পটে যে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল, তিনি সর্ব্বজনপরিচিত, সর্ব্বজনপূজনীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। তাঁহার বিশেষ পরিচয় আর কাহাকেও দিতে হইবে না।

যে তিন নম্বর রেগুলেসন ও অর্ডিনান্সের বলে বাঙ্গালা দেশের কয়েক জনকে অন্তরীণে আবদ্ধ করা হইয়াছে, আইন অনুসারে তাহার মেয়াদ মাত্র ছয় মাস। ছয় মাস পরে, হয় পুনরায় মেয়াদ বাড়াইয়া দিতে হইত, আর না হয় রদ করিতে হইত। এই কারণে উক্ত অর্ডিনান্সের বিধানগুলি আইনে পরিণত করিবার জন্য বিগত ৭ই জানুয়ারী মঙ্গলবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এক অধিবেশন হয়। এই আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য সরকার পক্ষের আয়োজনের ত্রুটী ছিল না; উভয় পক্ষেই ভোট সংগ্রহের জন্য যথোচিত চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু সরকার পক্ষের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; স্বয়ং লাট বাহাদুর কাউন্সিলে উপস্থিত হইয়া এই আইনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন; তাহাতেও কোন ফল হয় নাই; আইনের সপক্ষে ৫৭ ভোট এবং বিপক্ষে ৬৬ ভোট হওয়ায় আইন নামঞ্জুর হইয়াছে। এখন লাট বাহাদুর তাঁহার বিশেষ ক্ষমতাবলে যাহা হয় করিবেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যে কয়জন হিন্দু ও মুসলমান ভোট দিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল—বাবু অমূল্যধন আঢ্য, রায় বাহাদুর প্যারীলাল দাস, শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ গুহ, শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মাননীয় নদীয়ার মহারাজা, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়, রাজা মণিলাল সিং রায়, মিঃ আলৃতাফ আলি, খাঁ বাহাদুর সুজাত আলি বেগ, নবাব বাহাদুর নবাব আলি চৌধুরী, খাঁ বাহাদুর মৌলবী মহম্মদ মৈনুদ্দীন, মিঃ এ, কে, গজনবী, খাঁ বাহাদুর কাজি জহরুল হল, খাঁ বাহাদুর মৌলবী মোসারফ্ হোসেন, মৌলবী ফজ্‌লল হক, খাজে নাজিমুদ্দীন, মৌলবী আবদুল জব্বর পালোয়ান, মাননীয় সার আব্‌দর রহিম, মৌলবী আব্‌দাস্ সালাম ও মৌলবী আলাবক্স সরকার।

বড়দিনের সময় সারা ভারতবর্ষে সভা-সমিতির একেবারে ধুম লাগিয়া যায়; সর্ব্বত্র শুধু সভা আর সমিতি। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন কন্‌গ্রেস ও খিলাফত সম্মিলন; তাহার পর ছোট বড় অনেক আছে; তাহাদের কতক রাষ্ট্রীয়, কতক সামাজিক, দুই একটা শিক্ষা বিষয়কও আছে। এবার কন্‌গ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল বেলগাঁয়ে, সমারোহও খুব হইয়াছিল, কারণ এবার সভাপতি ছিলেন মহাত্মা গাঁধি মহোদয়। বহু দূর হইলেও বাঙ্গালা দেশ হইতে কয়েক জন নেতা কন্‌গ্রেসে গিয়াছিলেন; কন্‌গ্রেসের কার্য্যও সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়াছিল।

এবারকার কন্‌গ্রেসে একটী কথার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। এতদিন দেশের লোক 'স্বরাজ' কথাটাই শুনিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু স্বরাজের স্বরূপ কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে নানা জন নানা ব্যাখ্যা দিয়াছেন; কেহ কেহ বা একেবারে শেষ উত্তর দিয়াছেন—"স্বরাজ কি না স্বরাজ; ইহার ব্যাখ্যা নাই।" এবার কিন্তু সভাপতি মহাত্মা গাঁধি মহোদয়; স্বরাজের অর্থ কি, তাহা সরল ভাবে সহজ কথায় বলিয়া দিয়াছেন। অবশ্য, এ ব্যাখ্যা তাঁহার নিজের; কিন্তু ইহারই উপর নির্ভর করিয়াই স্বরাজের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ হইবে। আমরা নিম্নে মহাত্মা কর্ত্তৃক বিবৃত স্বরাজের খসড়া দিতেছি।

মহাত্মা গাঁধি স্বরাজ-সম্বন্ধে যে বারটী দফা দিয়াছেন, তাহা এই—

১। ভোটাধিকারের যোগ্যতা সম্পত্তি অথবা পদমর্য্যাদার উপর নির্ভর করিবে না। কায়িক শ্রমের উপরই উহা নির্ভর করিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কংগ্রেসের প্রস্তাবিত ভোটাধিকার বিধির কথা উল্লেখ করা যায়। পাণ্ডিত্য এবং ঐশ্বর্য্যের যোগ্যতা অভিজ্ঞতা হইতে একটা মোহ মাত্র বলিয়াই বুঝা গিয়াছে। যাঁহারা শাসন পরিচালনে অথবা রাষ্ট্রের হিতসাধনে আত্মনিয়োগ করিতে চাহেন, কায়িক শ্রমই তাহাদিগকে সে সুবিধা দান করিবে।

২। সর্ব্বনাশী সামরিক ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হইবে। কেবল সাধারণ অবস্থায় ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাহাই রাখিতে হইবে।

৩। সুবিচার লাভের উপায় সুলভ ও সহজ প্রাপ্য করিতে হইবে এতদুদ্দেশ্যে চূড়ান্ত বিচার লাভের আদালত লণ্ডনে না করিয়া দিল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়া আবশ্যক। অধিকাংশ দেওয়ানী মামলার পক্ষগণকে সালিশী দরবারে মামলা মিটাইবার জন্য উপস্থিত করিতে বাধ্য করিতে হইবে। এবং যদি কোন দুর্নীতি বা আইনের অপব্যবহার হইয়াছে এরূপ কোন প্রমাণ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পঞ্চায়েতের বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। উচ্চ নীচ ক্রমে স্তরে স্তরে আদালতের শ্রেণী কমাইয়া দিতে হইবে। বিচার প্রণালীর আমূল সংস্কার করিতে হইবে। আমরা এতকাল ক্রীতদাসের মত বহুল আড়ম্বর পূর্ণ ইংলণ্ডীয় বিচার প্রথার অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি। উপনিবেশগুলিতে বিচার প্রথা সহজ বোধ্য করিবার আকাঙ্ক্ষা দেখা যাইতেছে, যাহাতে প্রত্যেক মামলাকারী সহজে নিজের দিকটা উপস্থিত করিবার সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৪। সর্ব্বপ্রকার মাদকদ্রব্যের উপর আয়কর অর্থাৎ আবগারী বিভাগ উঠাইয়া দিতে হইবে।

৫। সমর বিভাগ ও শাসন বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের বেতন দেশের সাধারণ অবস্থার অনুপাতে কম করিয়া ধার্য্য করিতে হইবে।

৬। ভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রদেশগুলি পুনর্ব্বার নূতন করিয়া ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে। এবং প্রত্যেক প্রদেশকে সম্ভবমত স্বাতন্ত্র্য (অটোনমি) প্রদান করিতে হইবে ও আভ্যন্তরিক শাসন ও রাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবার যথাযোগ্য অধিকার দিতে হইবে।

৭। বৈদেশিকগণের যে সমস্ত একচেটিয়া অধিকার আছে, তাহার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য এক কমিশন বসাইতে হইবে। এবং যে সমস্ত সুবিধা বৈদেশিকগণ ন্যায়সঙ্গত উপায়ে অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা, কমিশনের নির্দ্দেশানুসারে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৮। ভারতীয় সামন্ত-নৃপতিগণের অধিকার ও কর্ত্তব্যপালনে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কোন বাধা প্রদান করিবেন না। তবে দেশীয় রাজ্যের কোন প্রজা ফৌজদারী আইন মোতাবেক অপরাধী না হইয়া যদি অন্য কোন কারণে দেশীয় রাজ্য ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাকে স্বায়ত্ত শাসিত ভারতে আশ্রয় দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯। সমস্ত স্বেচ্ছাচারিমূলক ক্ষমতা বিলোপ করিতে হইবে।

১০। উচ্চপদগুলি, যোগ্যতা হিসাবে সকলের জন্যই উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। সামরিক ও শাসন বিভাগের পদগুলির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১১। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির ভাব রক্ষা করিয়া এবং কাহাকেও বাধা প্রদান না করিয়া সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই ধর্ম্ম সম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিবে।

১২। প্রাদেশিক শাসন বিভাগে, ব্যবস্থাপরিষদে এবং আদালতে কিছুকালের জন্য প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহৃত হইবে এবং প্রতি কাউন্সিল বা সর্ব্বোচ্চ আদালতে হিন্দী ভাষা ব্যবহৃত হইবে—উহা দেবনাগরী কিম্বা পার্শী অক্ষরে লেখা চলিবে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ও ব্যবস্থা-পরিষদের ভাষা হিন্দী হইবে। পররাষ্ট্র বিভাগে ইংরাজী ভাষা ব্যবহৃত হইবে।

এই বড়দিনে সব রকম সভারই অধিবেশন হইয়াছিল, শুধু বাঙ্গলা-সাহিত্য সম্বন্ধে কোন সভাসমিতির উদ্যোগ না দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছিলাম; কিন্তু বাঙ্গালা দেশে না হইলেও বিহারের অন্তর্গত জামসেদপুর-প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণ সে ত্রুটী সংশোধন করিয়াছেন। তাঁহারা এই বড়দিনে জামসেদপুর সাহিত্য-সভার বার্ষিক উৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন করিয়াছেন। 'আমাদের ভারতবর্ষে'র সম্পাদক মহাশয়কেই এই উৎসবের নেতৃত্ব করিতে হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত সার ডোরাব টাটা মহোদয় এই সাহিত্য-উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া সাহিত্যিকগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত এম-এ মহাশয় সমাগত সাহিত্যিকগণকে অভ্যর্থনা করিয়া যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণও সাহিত্যিকগণ সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুইদিনের অধিবেশনে যে সমস্ত প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত আশুতোষ সান্যাল মহাশয়ের 'নাট্যশাস্ত্রের ইতিহাস', শ্রীযুক্ত গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লৌহের জন্মকথা', শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের 'কয়লার bye-product', সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা 'ভারতের নারী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় প্রবাসীবাঙ্গালীদিগের বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সত্যসত্যই প্রশংসনীয়।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "জাল-মোহান্ত" প্রকাশিত হইল। মূল্য—২৷৷০ টাকা ও ৮৬।৮৭ সং রহস্য-লহরী সিরিজের নূতন পুস্তক "পঞ্চরত্ন" প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৷৷০।

শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নূতন কবিতা পুস্তক "মধুমালতী" ও "পল্লীব্যথা" প্রকাশিত হইয়াছে—মূল্য প্রত্যেক খানি ১৲।

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত নূতন নাটক "বন্দিনী" প্রকাশিত হইল, মূল্য—১৲।

পালি হইতে অনুবাদিত বৌদ্ধগল্প "রাজগৃহের ইন্দ্রগুপ্ত" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য—৷৷০।

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "কৃতান্তের বঙ্গদর্শন", ও "জোর বরাত" প্রকাশিত হইল, মূল্য প্রত্যেক খানি ৷৷০ আনা।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea.
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA.

ভারতবর্ষ

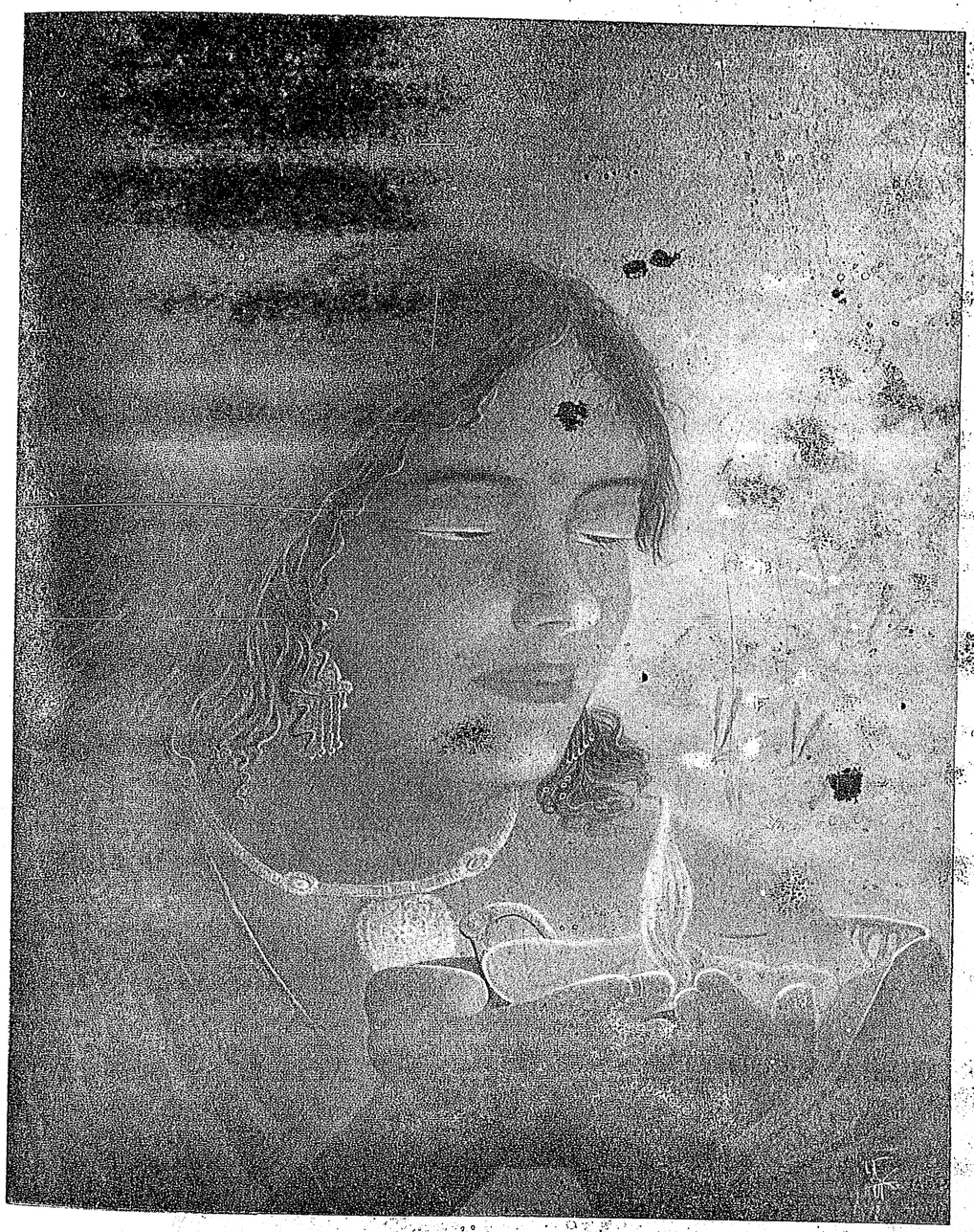

সন্ধ্যা-প্রদীপ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

COLOURED ILLUSTRATION